বাংলা লোকগীতিকায় নারী

কামরুন নাহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর, ২০০৮ইং

"বাংলা লোকগীতিকায় নারী"

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ওয়াকিল আহমদ
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

448743

উপস্থাপক

কামরুন নাহার
রেজিঃ নং- ৫৫৫/৯৫-৯৬
এম, ফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল bangla@du.bangla.net

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka—1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/6000; Fax : 880-2-8615583
E-mail : bangla@du.bangla.net

Date :

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম. ফিল গবেষক কামরুন নাহার আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলা লোকগীতিকায় নারী' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি রচনা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর রেজিস্ট্রেশনের নম্বর ৫৫৫/১৯৯৫-৯৬ এবং যোগদানের তারিখ ১৩-৭-১৯৯৬।

আমি যতদূর জানি, গবেষণাপত্রটি গবেষকের জ্ঞানবুদ্ধিপ্রসূত রচনা এবং এটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়নি অথবা এর কোন অংশ মুদ্রিত আকারে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এখন এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রির জন্য বিধি অনুযায়ী মূল্যায়নের জন্য জমা দেওয়া হলো।

ওয়াকিল আহমদ ১৭-১২-০৮
(অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদ)
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক,
ও
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমদের তত্ত্বাবধানে এম.ফিল, কোর্সে ভর্ত্তি হই। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম- 'বাংলা লোকগীতিকায় নারী'। প্রথম পর্বের অধ্যয়ণ যথাসময়ে শেষ করলেও কর্মজীবনের ব্যস্ততার কারণে অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত করতে পারিনি। এই অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ণে ও রূপরেখা নির্ম্মাণে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. ওয়াকিল আহমদ এর পরামর্শ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত ও অর্থবহ নির্দেশনা আমার কার্যক্রমকে গতিশীল ও সফল করে তুলতে সাহায্য করেছে। গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সাইদুর রহমান, রফিকউল্লাহ খান, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, এছাড়াও শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজের অধ্যাপিকা ড. আরজুমান্দ বানু এবং বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মমতা আরজু আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণার কাজে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক খন্দকার ফজলুর রহমান, উপগ্রন্থাগারিক জনাব আব্দুল লতিফ, গ্রন্থাগারিক আমিরুল মোমেনীন ও কর্মী মোঃ সাইফুল ইসলামের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণাকালে আমার সতীর্থ বন্ধু সরকার আমীন ও শাহ্নাজ মুন্নী নানাভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণাকর্ম কম্পিউটারে কম্পোজ করার কষ্টকর কাজটি সম্পন্ন করেছে আল আমীন। এতদ্সঙ্গে ক্যাটালগার মীর ইউসুফ আলীর সহায়তার কথাও ভুলে যাবার নয়। এঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সর্বশেষে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই একান্ত বন্ধু-বর শরীফ মোহাম্মদ খান ও একমাত্র ছেলে রাফি মোহাম্মদ খানকে। তাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমাকে সর্বদা প্রাণবন্ত রেখেছে ও কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে।

উপস্থাপক

448743

কামরুন নাহার
এম.ফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ লোকসাহিত্যে সমৃদ্ধ। লোকসাহিত্যের সকল শাখার উপাদান দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এ শতাব্দীর শুরু থেকেই লোকসাহিত্যের এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হয়ে আসছে। বাংলা লোকগীতিকা লোকসাহিত্য ধারার সবচেয়ে উন্নত ও শিল্প গুণসম্পন্ন শাখা। বিভিন্ন গবেষকের সহযোগিতায় এ যাবৎ শ'খানেক লোকগীতিকা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। লোকগীতিকা সম্পর্কেও কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। আমার প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কোন গবেষণা হয়নি। বাংলা লোকগীতিকায় সাধারণ নর-নারীর বাস্তব জীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষত নারীর কথা অতি উজ্জ্বলভাবে এখানে চিত্রিত হয়েছে। আমি বাংলা লোকগীতিকায় বর্ণিত সমগ্র নারী সমাজকে একত্রে বিন্যস্ত করে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আমি প্রস্তাবিত বিষয়টি আলোচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে 'বাংলার লোকজীবন ও সমাজ' সম্পর্কে একটা আনুপূর্বিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'লোকগীতিকার উদ্ভবকাল ও অঞ্চল' নিয়ে আলোচনা করেছি ও এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে 'বাংলা লোকগীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়' দেয়া হয়েছে যা আমার অভিসন্দর্ভটির ধারণাকে আরও স্পষ্টতর করে তুলেছে। 'বাংলা লোকগীতিকায় নারীচরিত্র' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে নারী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। এ পর্যায়ে সমস্ত নারী চরিত্রকে চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি। প্রথমভাগে আছে নায়িকা, দ্বিতীয়ভাগে প্রতিনায়িকা, তৃতীয়ভাগে পারিবারিক এবং চতুর্থভাগে সামাজিক নারী চরিত্রসমূহ। 'উপসংহার' অংশে বর্তমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বিষয়-ভাবনা ও অভিজ্ঞানের প্রধান সূত্রসমূহকে উপস্থাপন করেছি। পরিশেষে আছে সমন্বিত 'গ্রন্থপঞ্জি'।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**ঃ বাংলার লোকজীবন ও সমাজ**	০১-১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ঃ লোকগীতিকার উদ্ভবকাল ও অঞ্চল**	১১-২৪
	লোকগীতিকার উদ্ভবকাল	১১
	লোকগীতিকাঞ্চল	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	**ঃ বাংলা লোকগীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়**	২৫-৫৪
	গীতিকার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	২৫
	গীতিকার শ্রেণীবিভাগ	২৮
	গীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৩৪
চতুর্থ অধ্যায়	**ঃ বাংলা লোকগীতিকায় নারীচরিত্র**	৫৫-১১০
	ভূমিকা	৫৫
	নায়িকা চরিত্র	৬০
	প্রতিনায়িকা চরিত্র	৮৯
	পারিবারিক চরিত্র	৯২
	সামাজিক চরিত্র	১০২
উপসংহার		১১১-১১৩
গ্রন্থপঞ্জি		১১৪-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলার লোকজীবন ও সমাজ

বাংলা লোকসমাজ ও লোকজীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে অঙ্গীভূত হয়েছে লোকসাহিত্য। বৈচিত্র্যে, ব্যাপকতায়, বিষয় ভাবনায়, জীবনের সঙ্গে একাত্মতায় তা যুগে যুগে সমাদৃত। প্রাচীনকাল থেকেই লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। সাধারণত লোকসাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথা বা গীতিকা, কাহিনী, ছড়া, গান, প্রবাদ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। কোন জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় তার লোক সাহিত্যে পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য যা অতীত ঐতিহ্য ও সমকালের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়।

লোকসাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন, আদিম সভ্যতা থেকে এর উৎপত্তি। তাই বলা যায় "Folklore perpetuates the pattern of culture, and through its study we can often explain the motifs and the meaning of culture. The science of Folklore, therefore, contributes in a great measure to the history and interpretation of human life." [১] অর্থাৎ প্রাচীন যুগ এবং সমাজ-সভ্যতার অনেক কিছুর পরিচয় থাকে লোক-সংস্কৃতির মধ্যে। তাই আমেরিকার খ্যাতনামা লোকবিজ্ঞানী যথার্থই বলেছেন- "It is precipitate of the scientitic and cutural lag of centuries and millennia fo human experience."[২] অর্থাৎ শত-শতাব্দিরব্যাপী সভ্যতার ঘূর্ণীবিন্দু এই লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্য সাধারণত কোন ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়, তা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের বিক্ষিপ্ত রচনা জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে কালক্রমে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করে সার্বজনীন সৃষ্টি হিসেবে গৃহীত হয়।

লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু সমাজের পরিবেশ থেকে গৃহীত হয়। মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভাব, আবেগ, ঘটনা বা কাহিনী, গান, গীতিকা, ছড়া, প্রবাদ, গল্প ইত্যাদি আশ্রয় করে লোকসাহিত্যে স্থান করে নেয়। বাংলার লোকসাহিত্যে বাঙালি জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। অতীতের ইতিহাস ও সমাজচিত্র এ সাহিত্যে রূপায়িত হয়। আমাদের বিবেচ্য বিষয় যেহেতু গীতিকা, সেহেতু গীতিকার আলোকেই আমরা তৎকালীন সমাজ-জীবন-সংস্কৃতি ও সামগ্রিক প্রতিবেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালি জাতি হল শংকর জাতি। বাঙালি জাতির অবয়ব, চেহারা, মাথার চুল, নাক, মুখ প্রচলিত প্রথা ও লোকসংস্কৃতির মটিফ পরীক্ষা করে নৃতত্ত্ববিদ ও লোকবিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে আজকের বাঙালি জাতি। উত্তরে হিমালয়, নেপাল, ভুটান, পশ্চিমে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল, পরগনা, পূর্বে গাড় পাহাড়, খাসিয়া, জয়ন্তি এবং বঙ্গোপসাগর। এক রাষ্ট্র সীমার মধ্যে স্বভাবতই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হতে থাকে। খাদ্য, প্রাচুর্য্য, ভূমির উর্বরতা সহজলভ্য জীবন, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল আদিম অধিবাসীদের কাছে স্বর্গতুল্য ছিল। তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেসব জাতি এখানে বসতি স্থাপন করে তারা এ অঞ্চলে থেকেই নিজেদের জীবনধারার আলোকে সংস্কৃতি গড়ে তুলে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার লোকসমাজ ও লোকজীবনকে জানতে হলে এসব বিভিন্ন ও বিচিত্র জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধেও ধারণা নেয়া প্রয়োজন। বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এসব জাতি। আর্য, বেদ, উপনিষদে যাদের ভাষার দৃষ্টান্ত বর্তমান এবং খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতক থেকে ইসলামের যুগান্তকারী মুসলমানগণ আরবের সেমীয়-সেমেটিক গোষ্ঠী সম্ভূত বহু সওদাগর, ধর্মপ্রচারক এবং তাদের সঙ্গে ও পরবর্তী তুর্কী বিজয়ের পর মুসলমান শাসকবর্গের ও সৈন্যদের সঙ্গে আফ্রিকার নেগ্রিটো গোষ্ঠী সম্ভূত বহু হাবশীরাও এদেশে এসে বসবাস করতে থাকে এবং বাংলার বিরাট জনসমষ্ঠির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। একদিকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যদিকে ইসলামের সাংস্কৃতিক স্রোতে বাঙালি জাতির সম্মিলিত সংস্কৃতি গড়ে উঠে। স্বাভাবিক কারণেই বাঙালির ভাষা, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, জীবন-যাত্রা, শিল্প-সংস্কার আচার-বিচার প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন,

"It is evident that almost all the races of humanity know to live in the sub-continent of India with the exception of only a few can be imagined to have lived in or passed through Bengal at one or the other period of the pre-historic times. It only naturally follows that each race left its own mark not only physical but also cultural which collectively formed the basis of the future higher culture. This is the reason why so many variants, sometimes antagonistic to one another occur in the elements." (৩)

এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়েই গঠিত আজকের বাঙালি জাতি।

মৌর্য সম্রাট অশোকের পূর্বে (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ শতাব্দী) বাংলা ও বাঙালি জাতির তেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। এরপর পাল রাজাদের কীর্তিগাঁথা প্রচার হতে থাকে। তুর্কী বিজয়ের পর (১২০৪) বাংলার সংস্কৃতিতে ইসলামিক ঐতিহ্যের স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে-আরব্য ও পারস্য সাহিত্যের অনেক রোমান্টিক কাহিনী এবং নতুন সুফীবাদের প্রভাব- বাংলার ঐতিহ্যে মানবীয় ধারায় সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা আসে। বৌদ্ধ ও সুফীদের প্রভাবে জন্ম নেয় নাথ, বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়। সৃষ্টি হয় পুঁথি সাহিত্য, গীতিকা সাহিত্য, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি।

আমরা দেখতে পাই বাংলা লোকগীতিকাগুলি লোকঐতিহ্যে প্রবহমান। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "পল্লীগীতিতে প্রেমের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। আদর্শের এই রূপান্তর হওয়ার কারণ কি ? বৌদ্ধ-যুগান্তে গুপ্ত-যুগে শিবই-উপাস্য- দেবতা হইলেন। ভিক্ষুর আদর্শ ও ত্যাগ ধীরে ধীরে শ্লথ হইল। মহাভিক্ষু বুদ্ধ গৃহস্থালীকে সন্ন্যাস অপেক্ষা নিম্নস্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ স্ত্রীলোকের সাহচর্য-ত্যাগটাকেই বড় ধর্ম মনে করিতেন, কিন্তু শৈব ধর্ম গৃহস্থালীর উপর জোর দিল... ... ... ক্রমশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরা যে প্রেমকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন সেই দিকে লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। পল্লীগীতিগাগুলি এই শৈব ধর্মের চিহ্নাঙ্কিত যুগের বার্তা বহন করিতেছে।"(৪)

এ সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত ঃ "সুপ্রাচীন বাংলার শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা কঠিন। ... ... পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত... বাঙালি সমাজ প্রধানত শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর... ষষ্ঠ শতকেই সামন্তপ্রথা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে... সপ্তম শতকের শেষার্ধে ও অষ্টম শতকের প্রায় সবই জুড়িয়া রাষ্ট্রীয়-সামাজিক আবর্ত ... অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অর্থাৎ আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ কৃষি নির্ভর। সামন্তপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত, ভূমিই সমাজের প্রধান সম্পদ ।" (৫)

Dhaka University Institutional Repository

কোন শিল্পপ্রকরণের সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য সমকালীন সামাজিক কাঠামোর চুলচেরা আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষতঃ আমাদের বিবেচিত বিষয় যেহেতু "বাংলা লোকগীতিকায় নারী"- সেহেতু গীতিকাগুলো উদ্ভবের সময়কালে ঐ বিশেষ ভূ-খণ্ডের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা, তথা বাংলার লোকসমাজ ও লোকজীবনের একটি বিস্তৃত পরিচয় দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতিগুলো-সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, গারো, হাজং, মণিপুরী, খাসিয়া, চাকমা, মগ, মুরং, কুকি, লুসাই, টিপরা, খুমী, সেন্দুজ প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী উপজাতিরা হচ্ছে-সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ওঁরাও, মাল, মণিপুরী, নাগা, খাসিয়া, বীরহোড়, কোচ, গড়, বোরো, ভূমিজ প্রভৃতি।

প্রধানত পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলে এসব উপজাতিদের বাস। চাকমা, মগ, মুরং, টিপরারা থাকে পার্বত্যচট্টগ্রামে। মণিপুরী, খাসিয়ারা থাকে মণিপুর ও শ্রীহট্টের পাহাড়ী এলাকায়। নাগা, কুকি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা নাগাভূমিতে; গারো হাজংরা থাকে ময়মনসিংহের জৈন্তিয়া পাহাড় ও টাঙ্গাইলের মধুপুর অরণ্যভূমিতে; কোচ, রাজবংশী, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ির পাহাড়ী ভূমিতে; সাঁওতাল, ওঁরাও, মাল, কোল, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, সাঁওতাল, পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে।

নরতত্ত্বের দিক থেকে এসব উপজাতির স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, গোষ্ঠীর লোকদের মাথা গোল, চুল কোঁকরা, নাক খাঁদা, ঠোঁট মোটা, চোয়াল লম্বা ও উঁচু, গায়ের রং কাল। দেহের উচ্চতা মাঝারি। ওঁরাও, মালতো ভূমিজ গোত্রের মানুষের মাথা চৌকা, কান লম্বা, চোখ সমান্তরাল, নাক ছোট ও মোটা। একইভাবে গারো, খাসিয়া লোকদের চেহারা গৌরবর্ণ ও খর্বাকৃতি। এদের গোঁফদাড়ি বিরল, নাক চ্যাপটা, ভুরু ভারি ও নিভাঁজ। চাকমা, মগ, মুরং মণিপুরীদেরও মোটামুটি ঐরূপ বৈশিষ্ট্য। এসব রক্তধারার মানুষের ভিন্ন ভিন্ন নাম। প্রথমটি অষ্ট্রিক, দ্বিতীয়টি দ্রাবিড় ও তৃতীয়টি মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ভাষায় অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় রক্তের নরগোষ্ঠী যথাক্রমে Austroloid, Dravidian ও Mongoloid. "আর্যভাষায় অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকেরা 'নিষাদ' এবং মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা 'কিরাত' নামে অভিহিত।"[৬] মোঙ্গলীয়দের আর এক নাম 'মোঙ্গল-প্রতিম'। সিংহলের ভেড্ডাদের চেহারার সাথে দ্রাবিড়দের মিল আছে। এ জন্য তারা 'ভেড্ডা-প্রতিম' নামেও পরিচিত। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে এসব রক্তধারার মানুষ ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সমগ্র জনগোষ্ঠী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রাক আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশে আর্যদের আগমণের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসবাস ছিল। অনার্যদের জীবন-জীবিকা ছিল মূলত কৃষি ও শিকার। নিষাদ-শবররা শিকারোপজীবী ছিল। এরাই পরবর্তীকালে 'ব্যধ' নামে পরিচিত। এই প্রাক্ আর্য নরগোষ্ঠী বাঙালী জীবনের মেরুদন্ড। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী প্রধানতঃ নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত। আর্য পূর্বযুগে এরাই ছিল বাংলার তথা ভারত উপমহাদেশের অধিবাসী। অষ্ট্রিকরা চাষবাস ও শিকার করত। আর দ্রাবিড়রা ছিল কৃষিজীবী। তারা নগর জীবনেও অভ্যস্ত ছিল। আর্যদের বলিষ্ঠ দেহ, গৌর বর্ণ, উন্নত নাসিকা, কটা চোখ। তারা যাযাবর পশুপালক ছিল। ভারতে এসে দ্রাবিড় অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকদের ভশীভূত করে তারা ক্রমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। আর্য-অনার্যের মিলনে ভারতে হিন্দু জাতি প্রতিষ্ঠা পায়। আর্যদের পর এসেছে- শক, হুন, গ্রিক, পাঠান, মোগল, ইংরেজ

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি জাতি। শকদের চওড়া গোল মাথা, ঈষৎ হলদে চোখ ও টিকালো নাক। এরপর মধ্যপ্রাচ্যের সেমেটিক রক্ত ধারার মানুষ, আরব-পারস্যের মুসলমানদের আগমণ ও আধিপত্য বিস্তার ঘটে। এরাও গৌরবর্ণ, উঁচু ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। মোগলরা মোঙ্গলীয় গোত্রের মানুষ। এদেশে পাঠান ও মোগলদের প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়। ইউরোপ থেকে কয়েক শ্রেণীর মানুষ আসে। যথা ডাচ্, ওলন্দাজ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজ। ইংরেজরাই বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রভুত্ব করে ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে বিভিন্ন রক্ত ধারার সমন্বয়ে বাঙালী 'শংকর' জাতিরূপে পরিচিতি লাভ করে।

সমাজ ব্যবস্থার দিক থেকে উপজাতিদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) ও মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সাঁওতালরা পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে; কিন্তু গারো, খাসিয়া, হাজং উপজাতি মাতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্ভূক্ত। এখানে নারী সম্পত্তির মালিক এবং সন্তানের পরিচয় মাতৃকুল দিয়েই নির্ণীত হয়। কোথাও গোত্রবিবাহ, কোথাও অসবর্ণ-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি বিবাহ সংক্রান্ত নানা প্রথা প্রচলিত ছিল। ফলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে মেয়েরা ছিল পুরুষের সহকর্মী। স্বাধীনচেতা এই নারীর কর্তৃত্বকে সমাজ স্বীকৃতি দান করেছিল। কারণ "মুখ্য উৎপাদন কার্যগুলিই যে শুধু মেয়েদের হাতে ছিল তাহা নয়, সামাজিক ব্যাপারে তাহাদের হাত ছিল যথেষ্ট।" [৭] ফলে নারীরা তৎকালীন সমাজের প্রধান ভূমিকা পালন করত। স্বাভাবিক ভাবে নারীরা দৃঢ় মনোবলের অধিকারিনীরূপে সমাজে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। পরবর্তীতে শ্রমমূলক কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় ক্রমান্বয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর লাভ করে। অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক কৌম সমাজের ছাপ এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। উপজাতীয় কিছু কিছু অঞ্চলে তা এখনও বিরাজমান।

ক্রমান্বয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সমাজের কাঠামো পরিবর্তিত হয় এবং সামন্ত সমাজের জন্ম হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য বর্ণভিত্তিক সামন্ত সমাজের স্থায়িত্বকাল ছিল অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী তুর্কী আগমণ পর্যন্ত। এ পর্বে আমলাতন্ত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই- এদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ সামন্ত শাসন ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল এদেশের অপরিবর্তনীয় কৃষি-অর্থনীতি। সামন্ত রাজা ছিলেন সমস্ত ভূমি, সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক। প্রজারা শ্রম দিয়ে পণ্য উৎপাদন করত। রাজা পরিবার-পরিজন নিয়ে দূর্গে বাস করতেন। সৈন্য- সামন্ত দূর্গের বাইরে তাঁবুতে অবস্থান করত। দূর্গের বাইরে অস্থায়ী হাট-বাজারে বেচা-কেনা হত। এতে নগরের বিস্তার কোনদিন হয়নি। আধুনিক অর্থে নগরও গড়ে উঠেনি। সুতরাং গ্রামই ছিল বাংলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এসময় (মধ্যযুগে) ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষ গ্রামেই বসবাস করত।

এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে গ্রামের আর্থিক জীবন পরিচালনা করার ভার কারিগর, শিল্পী, চাষী, জাতিবৃন্দের উপর ন্যস্ত ছিল। গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজারা উৎপাদন করত। পরস্পরের মধ্যে প্রাপ্য, অর্থ বা শস্যের সহায়তায় মেটানো হত। সবাই পরস্পরের উপর নির্ভর করে চলত। এমনও দেখা গেছে, যদি কোন কারিগরের সঙ্গে এক গৃহস্থের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন গ্রামের আর পাঁচজন মিলে সেই বিবাদ মিটানোর চেষ্টা করত। আর্থিক ব্যাপারের জন্য ব্যবসা পরিবর্তন করার স্বাধীনতা যেমন স্বীকৃত হত না, সবাই কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করে চলত। তেমনি আবার গ্রামের কোন কারিগর অন্নাভাবে যেন কষ্ট না পায়, তা-ও গ্রামের পাঁচজন দেখার চেষ্টা করত। বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন বহু শতাব্দী ধরে অটুট রেখেছে। রাজনৈতিক গগনে শাসকের পর শাসক উদয় হয়েছে, দেশে বিদ্রোহ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বারবার দেখা দিয়েছে, তথাপি জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

ভারকেন্দ্র গ্রাম্য সমাজের অর্থনীতি ও সমাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় মানুষ গ্রামের শাসন এবং কৌলিক বা জাতিগত আইনের শৃংখলার জোরে সেসব আগন্তুক আঘাতকে বারবার উপেক্ষা করে জীবনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।[৮]

আমরা দেখতে পাই বাংলা লোকসমাজ ও লোকজীবনে কৃষিজীবী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি মাঝিমাল্লা, জেলে, জোলা, কামার, কুমার, সেকরা, ছুতার, কাঁসারী, চুনারী, তেলী, মালী, গোয়ালা, ময়রা, কাহার, কাঠুরে, ঘরামী, পটুয়া, বাড়ই, বেদে, দর্জি, কবিরাজ, কষাই, ধোপা, নাপিত, ডোম, চামার প্রভৃতি শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষ বসবাস করেছে। বাংলার লোকশিল্পের এরাই মুখ্য রূপকার। কৃষিপণ্যের বিনিময়ে তারা কৃষকের যাবতীয় আসবাবপত্র ও চাষের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। কৃষকের সাথে গাড়িয়াল, মাঝিমাল্লা, কাহার, ফকির, দরবেশ, আউল, বাউল, বৈরাগী, বোষ্টমী-সকলের জীবন ও আবেগ গ্রামবাংলার জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাদের সাহিত্যে, গানে, নৃত্যে, চিত্রে-এসবেরই প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়।[৯]

লোকজীবনকে কেন্দ্র করে লোক-সংস্কৃতির বিকাশ। এর জন্য আবশ্যক একটি জাতিগোষ্ঠী, একটি সংহত সমাজ ব্যবস্থা। বাংলা লোকসমাজ উপজাতীয়দের জীবনাচরণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-আশাক, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কৃতির পুঁজি নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল তা গ্রহণ-বর্জন, আদান-প্রদান, নতুন সৃষ্টি, পরিবর্তন ধারার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আজকের বৃহত্তর লোকসমাজে উত্তীর্ণ হয়েছে। কালে কালে নতুন জাতি, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির জোয়ার এসেছে, তাতে এ লোকসমাজ অবগাহন করেছে, নিজের মত করে গ্রহণ করে পরিবর্তিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। এ মিলন ধারায় আর্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল, খ্রিষ্টাণ সম্প্রদায়ের জীবনোপকরণ সঞ্চারিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের লোকসমাজ ও লোকজীবনের মূল উৎস ও ঐতিহ্য মুলতঃ অনার্য জীবন ও তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী।[১০]

মানব সংস্কৃতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় আদিমস্তরে দৈব নির্ভরতা, কুসংস্কার এবং আচারবিধি অধিক প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালির লোকজীবনে ধর্মের অনুশাসন বরাবর প্রবল ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুর জীবন ধর্মের নিগড়ে বাঁধা। একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্ম স্বচ্ছ ও মুক্ত জীবনের আদর্শ বহন করলেও দীর্ঘজীবনের একত্র বাস এবং মজ্জাগত সংস্কারবশতঃ মুসলমানের জীবন প্রকৃতিতে অনৈসর্গিক আচরণ প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য থেকে নির্জীব জড়বস্তুপূজা, দেবমূর্তিপূজা, উদ্ভিদপূজা, প্রাণীপূজা, নিরাকার ঈশ্বরোপাসানা বাঙালির লোকসমাজ ও লোকজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।[১১]

বাঙালির লোকমানসিকতা রক্ত মাংসের মর্তমানবকেও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যথাবিধি পূজা করেছে। আবার শাস্ত্রীয় দেবতাকে স্বর্গের আসন থেকে এনে মাটির পৃথিবীতে মানবীয় লীলাকীর্তি আরোপ করে ভজনা করেছে। দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকতার আচরণবিধির মধ্যেও বাঙালির ধর্মীয় মানসিকতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর, চোখে সুরমা, করতলে মেহেদি ধারণ ও রন্ধনে বাঙালি রমণীর প্রসাধন চর্চার সাথে সংস্কারও জড়িয়ে আছে। জারি-সারি, মুর্শিদী, মর্সিয়া, গজল, বাউল, কীর্তন, ব্রত, পট, পতিমা, আলপনা, অন্নপ্রাণ, বিবাহ, আনন্দ-উৎসব, বস্ত্রালঙ্কার, আহার-বিহার সর্বত্রই ধর্ম বিরাজমান।

বাঙালির কৃষিনির্ভর জীবনে প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ অনিবার্য ছিল। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝঞ্ঝা, কীটদংশন, পক্ষাঘাত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো বাঙালীর দুর্বল মনে এক একটি ভীরু, অন্ধ, অশাস্ত্রীয় আচার ও কুপ্রথার জন্ম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকে সে ভালবাসে কিন্তু জীবন রক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তার আয়ত্ত হয়নি। এজন্য জীবন স্বাচ্ছন্দের প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির অনুগ্রহ ও অনুকম্পা লাভের জন্য সে কেবল পূজা করেছে। প্রতিরোধের জন্য বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। বাংলার নদী-নালা-খাল-বিল, শ্যামল প্রান্তর, সবুজ বনানী, স্নিগ্ধ বাতাস, নীল আকাশ তার অবসর যাপনকে অলস চিন্তায় ভারাতুর করে তুলেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধরে বাঙালির কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিকতায়, আচার-আচরণে এই একই জীবন অভীপ্সা সক্রিয় ছিল।(১২)

বাংলার লোকজীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য- সাধারণ মানুষ ছিল রাজনীতির প্রভাব মুক্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট। রাজ্য ভাঙে-গড়ে, বিপ্লবের পর বিপ্লব আসে। হিন্দু-পাঠান, মোগল, ইংরেজ সকলের প্রভুত্ব একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারদিকেই পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু গ্রাম্য সমাজের কোন পরিবর্তনই হয় না। ভেঙে গেলেও এই গ্রাম্য সমাজ আবার ঠিক একই জায়গায় একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলার কুটির শিল্প বা হস্তশিল্প ছিল নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য। কুটির শিল্পী বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ তাঁতী, জোলা, কামার, কুমার, ছুতার, চামার, সেকরা প্রভৃতি সকলেই সরাসরি কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। চাষী ক্ষেতের তুলা দিয়ে জোলার কাছ থেকে বস্ত্র নিত। ফসলের বিনিময়ে কামারের কাছ থেকে চাষের যন্ত্রপাতি, কুমারের কাছ থেকে হাঁড়িপাতিল, ছুতারের কাছ থেকে গাড়ি, পাল্কি, সেকরার কাছ থেকে গহনাপত্র নিত। প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পর পরস্পরের উৎপাদন বিনিময়ে জীবন নির্বাহ করত। ফলে তারা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মকেন্দ্রিক।(১৩)

বাংলার লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং লোকসমাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। শ্রেণীগত বিচারের দিক থেকে সমাজের উচ্চ স্তরে আছে জমিদার, দেওয়ান, কাজি ও সরকারি আমলা। এরাই সমাজের ভাগ্য বিধাতা হিসেবে ক্ষমতা, আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মন্দ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে উত্তম গুণাবলীও প্রস্ফুটিত হয়। এর উদাহরণ 'দেওয়ানা মদিনা'। এরপর বণিক শ্রেণীর নাম করা যায়। এরাও ধূর্ত, জুয়ারী, অর্থলোভী এবং লালসাগ্রস্ত নারীঅপহরক হিসেবে পরিচিত। 'মহুয়া' গীতিকায় সাধুর (বণিক) কুচরিত্র প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। এভাবে ধণিক-বণিক শ্রেণীর লাম্পট্যের কবলে পড়ে গীতিকাগুলোর নায়িকারা অসহায় অবস্থায় শিকার হয়েছে। তবে দু'একটি গাথায় বণিক শ্রেণীর মন্দ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সততা, কৃতজ্ঞতা, উদারতা কিংবা প্রেমনিষ্ঠাও ফুটে উঠে। এরপর আমরা কৃষক শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে পারি। এদের মধ্যে সম্পন্ন গৃহস্থ ও দরিদ্র কৃষক বলে দুটি স্তর লক্ষণীয়। এ দু'টি স্তরের মধ্যে অবস্থা সম্পন্ন কৃষকরা অর্থ-স্বার্থ-বংশগত আভিজাত্যে সামন্ত প্রভুদের মতই শ্রেণী বৈষম্যজনিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মইষাল বন্ধু' গীতিকায় তৎকালীন সমাজে সম্পন্ন কৃষক গৃহস্থের শোষণ-পেষণে সাধারণ দরিদ্র কৃষকের সর্বস্ব হারানোর মর্মান্তিক কাহিনী ইতিহাসবিদ্ধ যা শ্রেণীবৈষম্য সমাজ ব্যবস্থার পরিচায়ক। ফলে গীতিকার নায়িকাদের ভাগ্যেও নেমে এসেছে নির্মম উৎপীড়ন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরকে চতুর্থ পর্যায়ে স্থান দেয়া যায়। এদের আরোপিত ধর্মীয় অন্ধ অনুশাসন, কৌলীন্য প্রথা বা বর্ণগত শ্রেণীবৈষম্য নীতির কারণেও নর-নারীর হৃদয়বৃত্তি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে গোঁড়ামীর কারণে নায়িকাবৃন্দ তাদের সম্ভাবনাময় জীবন থেকে অকালে ঝড়ে পড়ে। এর পর আমরা বারবনিতা, ডাকাত, জল্লাদের স্থান নির্ধারণ করতে পারি। এরাও অর্থের মোহে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এছাড়া দূত-দূতী-কুটনী চরিত্রগুলোও অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সায় নারী-

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। জল্লাদ চরিত্রগুলোও একইভাবে রাজা-বাদশাহের তাবেদারীর লক্ষ্যে নায়ক-নায়িকা কিংবা সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। অবস্থানগত দিক থেকে রাখাল, বংশীবাদক, বেদে, জেলে, জ্যোতিষী, ধোপা, ঘটক, মালাকার, ওঝা, চণ্ডাল, কাঠুরিয়া প্রভৃতি নিম্নবিত্তের মানুষ লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যেও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, ঈর্ষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ও সন্নিবেশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা পীর-ফকিরের কথা ও উল্লেখ করতে পারি। এরা ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, কুলীন নির্বিশেষে দু:খী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এদের কাছে রাজা-বাদশাহ্ থেকে আরম্ভ করে উপেক্ষিত নিম্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষ পর্যন্ত সমান সমাদর ও সাহায্য লাভ করেছে। আবার কিছু গাথায় সন্ন্যাসী চরিত্রেও রূপজমোহ, লাম্পট্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। । যেমন 'মহুয়া' পালার 'সন্ন্যাসী' চরিত্র। বৈষম্য পীড়িত এ মিশ্র সমাজ দীর্ঘকাল থেকেই বাংলা লোকসমাজ ও লোকজীবনে বিরাজ করছে।

বলা যেতে পারে বাংলা লোকসমাজ ও লোকজীবনের সামাজিক দর্পণ এই গীতিকাসাহিত্য। কারণ গীতিকায় বাঙালি সমাজ জীবনের জীবন্ত কাহিনী কাব্য রূপায়িত হয়েছে। অসহায় দরিদ্র জনমানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, খাদ্য-খাবার, খাদ্যাভ্যাস, আহার-বিহার, আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, পোশাক-আশাক, শিল্প-সাহিত্য, কৃষি-বাণিজ্য, শাসন-প্রশাসন, শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সমাজ-উন্নয়ণ, প্রাচীনতা-অর্বাচীনতা, রীতি-রেওয়াজ ইত্যাদি যা কিছু চিরাচরিত সবই বাঙালি সমাজ জীবন প্রসূত লোক ঐতিহ্য থেকে আর্হিত হয়েছে।

মহুয়া পালার 'বন্দনা' অংশে আমরা দেবতা, ভানুশ্বর, নদ-নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত, মক্কা, হিন্দু-মুসলমান, সুন্দরবন, জিন্দাপীর, চান্দ-সুরুজ, কিতাব-কুরান এসব বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত হই। 'মলুয়া' পালায় অনাদি ঈশ্বর, মহেশ্বর, শ্রীদুর্গাভবানী, লক্ষ্মী স্বরস্বতী ইত্যাদির অবতারণা করা হয়েছে। আবার 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর তরুলতা, আকাশ কিংবা বসুমাতা, পিতা-মাতা, জ্যেষ্ঠ ভাই এবং চন্দ্রসূর্য ও দিবারাত্রির শোভা-সৌন্দর্যানুভূতি প্রধান হয়ে উঠেছে। এখানে ওস্তাদ বা গুরুজনদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায়। এসব গীতিকায় ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতাও ফুটে উঠেছে। তবে এসব গীতিকায় দেবদেবীর চেয়ে পূর্ব বাংলার মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যারা এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা পল্লী বাংলার সাধারণ দুঃখী মানুষ ... ... এদের জীবন কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে এসব গীতিকায়।

'মলুয়া' পালায় অতিথি আপ্যায়নে লোটা ভরা শীতল জল ও খরম এগিয়ে দেয়া, মানকচু ভাজা, চালিতার অম্বল, জিরা সমম্বয়ে মাছের ঝোল, কই মাছের ভাজা ও চরচরি, কালোজিরার ছত্রিশ রকম বেগুন রান্না, শুকনা মাছ রান্না, শুকতা বেগুন ও বরা ভাজা, পুলিপিঠা, পাতাপিঠা, বরাপিঠা, চন্দ্রপুলিপিঠা, দুধের খিস্যা, পোয়া, চই ইত্যাদি পিড়িতে বসিয়ে খাওয়ানোর আনন্দ বাঙালির আবহমানকালের লোকঐতিহ্য। রান্নাবান্না ও আপ্যায়ন নারী সমাজের কাজ। যিনি অতিথি তিনিও প্রতিদান হিসেবে মা-বোনকে শ্রদ্ধা ও বিদায় জানিয়ে বাংলার লৌকিক জগৎকে উদ্ভাসিত করেন। যারা সেবা পায় তারা পরিবারের সদস্য- স্বামী-ভাই, পিতা, শ্বশুর ও ভাসুর অথবা দুরাগত কোন অতিথি।

বাঙালির আচার-আচরণে একটা গভীর বিনয় ও লজ্জাশীলতা প্রস্ফুটিত। তাই সে তার গুরুজনকে পরম শ্রদ্ধা করলেও তার কাছে নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জা পায়। এজন্য বিনোদ স্বীয় বিয়ের কথা বড় বোন কিংবা মায়ের কাছে বলতে পারেনি। প্রকাশ করেছে সঙ্গী সাথীদের সামনে। তাদের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হলে মা সঙ্গে সঙ্গে ঘটক পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই যে ঘটকালী প্রথা তা বাঙালি সমাজেরই ঐতিহ্য।

Dhaka University Institutional Repository

নদী মাতৃক পলি মাটি সমৃদ্ধ এদেশে নৌকাবাইচ আর ষাঁড়ের লড়াই এখনো বাঙালি সমাজে লক্ষ্য করা যায়। আর এগুলোই যুগ যুগান্তে বাংলা সাহিত্যের ব্যবহারিক মূল্যবান উপাদান। পল্লী বাংলার চালাঘর কিংবা বারোদুয়ারী ঘর অথবা শিতলপাটি, পাটের শাড়ির নক্সা সবকিছুই বাংলার ছায়াসুনিবিড় সৌন্দর্যের সাদৃশ্যে তৈরি হয়েছে। বিনোদ দারিদ্র্যের কারণে বিবাহ প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্বীয় চেষ্টায় কোড়া শিকারে ও শ্রমদানের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অথচ বিনোদ শ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটালেও দেবতার বরে সম্পদ পেয়েছে বলে সবার লোকবিশ্বাসজনিত আজন্ম সংস্কার উদ্ভাসিত হয়েছে। 'কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা' এবং এদিন জামাই ও বউয়ের দেখা-শোনার নিষেধাজ্ঞা, শুভরাতে মেলা, ঘরে সাজবাতি, বাসরঘরের বেড়ার ফাকে ভাবীদের উকি মারার রম্য-রসিকতা ও সকালে পরিহাস, প্রদীপ নিভানো-জ্বালানো, সবকিছুই বাঙালির প্রকৃতিঘনিষ্ঠ লোকঐতিহ্যের পরিচায়ক। আবার বরের বিদায় বেলায়ও কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান বাঙালির ঐতিহ্যনিষ্ঠ। যেমন- বিদায়কালে কনের বাবা-মা, মাসি-পিসি কিংবা পাড়া-পড়শী- সখিদের কান্না অথবা কোল দান কৃষি প্রধান সমাজের লোকজীবন ভিত্তিক দৃশ্য।

শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী দেয়ার রেওয়াজ আবহমান বাঙালি সমাজে প্রচলিত। তাই মলুয়ার বাবা ব্যবহারিক জীবনের কিছু দ্রব্য সামগ্রী- ঝাইল, ঝাঁপি, পটেরা, সজমশলা, চিকন চাইল, তৈল, সিন্দুর, বিন্নি ধানের খৈ- মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দিতে দেখা যায়। যাবার সময় মেয়েকে শ্বশুর বাড়ীতে আদব-কায়দা ও সুনামের সঙ্গে মর্যাদা রক্ষা করে চলারও উপদেশ দেয়া হয়। আবার বিনোদের নিজ বাড়ীতে তার মায়ের পক্ষ থেকেও কিছু অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বাঙালির লৌকিক জীবন প্রস্ফুটিত হয়। সেখানে ধানদুর্ব্বা দিয়ে বউকে বরণ করা, আঁচলে মুখ মোছানো, মায়ের চরণ ধূলা নেয়া, বউকে পিরিতে বসিয়ে বরণ করা, 'জয়াদিজুকার' দেয়া, গঙ্গাজলে মঙ্গলঘট রাখা, সোনা-রুপা স্পর্শে বউয়ের মুখ দেখা, মঙ্গলাচার করা ইত্যাদিও বাংলার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ লোকঐতিহ্যের প্রতিফলন। এসব আচার অনুষ্ঠান ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

'মলুয়া' পালায় নাকের নথ, মতির মালা, পায়ের খাড়ু, হাতের বাজু, পাটের শাড়ি, কানের ফুল ইত্যাদি বাঙালি নারীর লোকঐতিহ্যগত সজ্জালংকারের চিত্র প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। তখনকার মেয়েরা মাথায় নানা রকম খোপাও বাঁধত। তখন বাঙালি বধূদের মুষ্ঠির চাল তুলে রাখতে দেখা যেত। মুষ্ঠির চাল তোলা হয় ভবিষ্যতের অসুবিধার কথা ভেবে। বধূরা ভাত রান্নার সময় পরিবারের সদস্যদের ভাতের চাল থেকে প্রতি সন্ধ্যায় একমুঠো চাল তুলে রাখে। এতে খাবার সময় কারো ভাত কম পড়েনা বরং লাভের মধ্যে একমুঠো করে চাল সঞ্চিত হতে থাকে। এই যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তা কিন্তু বাঙালি নারীর লোক ঐতিহ্যগত গঠনমূলক চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত। এজন্যই মলুয়া শ্বশুর বাড়ীকে- গয়া-কাশি-বৃন্দাবন মনে করে। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করাকে ধর্ম-কর্ম মনে করে। এ বোধ কোন ধর্ম-শাসন আরোপিত বিষয়বস্তু নয় বরং তা স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুনিষ্ঠ মানবিক বোধ থেকেই উদ্ভূত।

'কঙ্ক ও লীলা' পালার বর্ণনায় আমরা গ্রাম বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে ও পরিচিত হই। এখানে সিকা, আবের পাখা, কলসী, বাঁশী এবং তাল পাখা আবহমান বাংলার শিল্প নিদর্শনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এরপর আমরা লোকখাদ্য সম্পর্কে জানতে পারি। এখানে গামছা বাঁধা দই, বাটার পান, চাউল-কলা-সিন্নি, শালিধানের চিড়া, ভাত ইত্যাদি বাংলার প্রকৃতিনিষ্ঠ আবহমান বাঙালির সাধারণ সামগ্রী। এসবের মধ্যেই তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা, মর্যাদাবোধ, সামাজিক হৃদ্যতা, সৌহর্দ্যপূর্ণ পরিবেশে জীবনবোধ, চাল-চলন, আচার-আচরণ প্রস্ফুটিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নীহার-রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, "এইসব আচারানুষ্ঠানের অনেকগুলিই মূলতঃ গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের অন্যতম ও আদিতম ভয়-বিস্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১৪] তিনি আরও বলেন, "যে ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালির গভীরে বিস্তৃত, সে জীবন নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া, গ্রামে কুটিরের কোণে, চাষীর মাঠে, গৃহস্থের আঙিনায়, ফসলের ক্ষেতে, গ্রাম্য সমাজের চণ্ডীমন্ডপে, বারোয়ারী তলায়, নদীর পাড়ে, বটের ছায়ায়, জনহীন শশ্মানে, অন্ধকার অরণ্যে, নৃত্যসঙ্গীতে, পূজা-আরাধনার বিচিত্র আনন্দে, দু:খ-শোক-মৃত্যুর বৈচিত্র লীলায় বিস্তৃত। সেই ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্য মনের আর্যব্রাহ্মণ বৌদ্ধজৈনতান্ত্রিক ধর্মকর্মের সাধনা ও অনুষ্ঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে।"[১৫] এ দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাসই বাঙালির মৌল ইতিহাস।

... ... "সোনার কলস, সোনার পালঙ্ক, সোনার ঝারির তো কথাই নাই, ধনীর গৃহে পরিবেশনের সময় সোনার থালা এবং সোনার বাটির ছড়াছড়ি হইত। ধনবান গৃহস্থের ঘরের মেয়েরা বহু সংখ্যক সহচরীর সঙ্গে নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। তাহাদের কাহারও মাথায় স্বর্ণকুম্ভ, কাহারও মাথায় সোনার থালায় নীলাম্বরী, অগ্নিপাটের শাড়ী বা মেঘডম্বুর বস্ত্র, কাহারও হাতে নানারূপ গন্ধ তৈল ও প্রসাধনের দ্রব্য। ... ... পাঁচশত টাকার হাতির দাঁতের শীতল পাটির উল্লেখ অনেক গীতি-কবিতায়ই পাওয়া যায় ... ... সোনার বাটায় কেয়া, খয়ের, চুয়া ও এলাচি দেয়া পানের খিলি নিয়ে তরুণীরা বাসর ঘরে প্রবেশ করত। গ্রীষ্মকালে নানারূপ আসবাবে সজ্জিত 'জলটুঙ্গীঘর', দীঘির জলে অবস্থিত থাকিত। দম্পতি নানা রহস্য ও মধুর আলাপে রজনী কাটাইয়া দিতেন। দীঘির জলের প্রস্ফুট পদ্মের সুরভি লইয়া বসন্তানিল মাঝে মাঝে সেই ঘরে ঢুকিয়া তাহা সুবাসিত করিয়া দিত। গজমতির মালা, হীরার হার, সোনার দাঁত খোঁচানী কাঠি প্রভৃতি অলংকার পত্র ও বিলাসের সামগ্রী যে কত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। লক্ষের শাড়ী 'ত কথায় কথায় পাওয়া যায়। স্নানের সময় মেয়েরা গলার হীরার হার এবং সোনার ও জহরতের অলংকার খুলিয়া রাখিতেন। পাছে তৈলসিক্ত দেহের স্পর্শে তাহারা মলিন হয়। সাধারণ রূপ ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে লড়াই করিবার জন্য আটটা দশটা ষাঁড় থাকিত। লড়াই করিতে আট গোটা ষাঁড় (মলুয়া) এবং প্রত্যেক গৃহস্থের ঘাটেই 'বাইচ' খেলিবার জন্য দীর্ঘ সুদর্শন ডিঙ্গি বাঁধা থাকিত ... ... এই পল্লী গাঁথাগুলিতে যে দেশ দেখিতে পাই তাহাই খাঁটি বঙ্গদেশ।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. Maria Leach ED : A.M. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (SDFML), New York, 1949), P. 399

২. Ibid, P. 403

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : The Basis of Bengali Folk Culture, Folklore, (কলিকাতা, ১৯৬০), পৃ. ১৬

৪. দীনেশ চন্দ্রসেন : বৃহৎ বঙ্গ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, পৃ. ৩৯৫

৫. আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১১১

৬. ওয়াকিল আহমদ : বাঙলার লোকসংস্কৃতি: উৎস ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশ, পৃ. ২৪৫

৭. রেবতী বর্মন : সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, পৃ. ২২

৮. নির্মল কুমার বসু : হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ. ৬১-৬২

৯. ওয়াকিল আহমদ : লোককলা প্রবন্ধাবলী, ঢাকা-২০০১, পৃ. ২৫৭

১০. ঐ, পৃ. ২৪২

১১. ওয়াকিল আহমদ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা-১৯৭৪, পৃ. ২২

১২. ওয়াকিল আহমদ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা-২০০১, পৃ. ৩৮

১৩. ঐ, পৃ. ৩৯-৪০

১৪. নীহার-রঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস, পৃ. ৪৭৯

১৫. ঐ, পৃ. ৪৮০

১৬. দীনেশ চন্দ্র সেন : বাংলার পুরনারী, ভূমিকা, (কলিকাতা-১৯৩৯), পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকগীতিকার উদ্ভবকাল ও অঞ্চল

লোকগীতিকার উদ্ভবকাল

বাংলা লোকগীতিকার উদ্ভবকাল ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করলে একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আবেগ-অভ্যাস, তাদের জীবনধারার বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী যে এ রচনার পিছনে সক্রিয় ছিল তা সহজেই অনুভব করা যায়।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতার উদ্ভবপূর্ব যুগে কৃষিজীবন কেন্দ্রিক গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসমষ্টির বিনোদনের কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উপায় ছিল অলিখিত স্মৃতিচারণ বাহিত লোকসাহিত্য। মধ্যযুগের শ্লথগতিমান গণ্ডিবদ্ধ গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের কালচক্রে যে বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে, তারই মধ্যে বিকশিত হয়েছে লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ধারা। বাংলা লোকগীতিকাগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা লোকসমাজ ও লোকজীবনের সামগ্রিক ঐতিহ্যকে আখ্যানধর্মী করে লৌকিক ধারায় প্রচার করার প্রবণতা থেকেই গীতিকার জন্ম। ধারণা করা হয় মধ্যযুগের বিশেষ একটি সময়ে নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং প্রণয়োপাখ্যানের কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত হওয়ায় পল্লী কবিরাও এ ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের মত করে মৌখিক ধারায় কাব্য রচনার সূত্রপাত ঘটান। মধ্যযুগের সাহিত্য ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশই ধর্মাশ্রিত ছিল। এসব কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন। গীতিকা সাহিত্য ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য হিসেবে জনসমাজে স্বীকৃতি পায়, প্রতিষ্ঠা পায়। যার ফলে আখ্যান ধর্মী-কাহিনী আকারে এই গাঁথা বা গীতিকা (Ballad) সাহিত্যে স্থান করে নেয়। নিতান্তই গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে গীতিকার পালাগান। অশিক্ষিত পালাকারগণ মুখে মুখে পালা গেয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করত। এভাবে "গাথা হিসেবে গীতিকার সূত্রপাত ঘটেছিল গ্রাম-বাংলার আনাচে-কানাচে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দু'তিনশ বছর মুখে মুখে প্রচলিত থাকার পরে মাত্র বিশ শতকের প্রথমভাগে সেই সব কাব্য- আমাদের হস্তগত হয়েছে।"(১)

গীতিকার উৎস, উদ্ভব ও সম্ভাব্যকাল নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র, পরিবেশ ও প্রকৃতি বিবেচনা সাপেক্ষ। এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- গাথার লেখকদের আবির্ভাবের কাল, বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক নির্ণয়ে সহায়ক। গীতিকায় যে কাহিনী বিধৃত, সেগুলোতে ঐতিহাসিক স্থান, কাল, পাত্রের পরিচয় সূত্রে এগুলো কোন্ সময়ের রচনা তা নির্ধারণ করা অনুমান সাপেক্ষ। গীতিকাগুলো নর-নারীর বাস্তব জীবন-যাপনের কাহিনী হওয়ায় এগুলোতে তৎকালীন সামাজিক, ঐতিহাসিক চিত্রগুলো ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। কাজেই বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে তথা ঘটনা, স্থান ও পাত্র-পাত্রী প্রভৃতি সূত্রে আমরা কালের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট হব।

আঙ্গিকগত দিক থেকে গীতিকার ভাষার রূপতাত্ত্বিক পরিচয় এবং কাহিনী বিন্যাস সহ বিভিন্ন কৌশলগত উপকরণ সম্ভাব্য কাল উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হবে। যেমন গীতিকায় ব্যবহৃত ভাষা কখনো কখনো সেই সময়কার মৌখিক কথ্যরূপকে প্রতিফলিত করেছে। কখনো বা রূপকথার কাহিনী গীতিকার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আবার কখনো বা আখ্যায়িকার সঙ্গীত ও নাট্যধর্ম গীতিকায় প্রবিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। --- এসব আঙ্গিকগত উপকরণ গীতিকায় কোন্ সময়ে লিপিবদ্ধ হয়েছিল সেই সময়কালকে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে।

গীতিকাগুলো যে মার্জিত ও পরিশোধিতরূপে উপস্থিত সেগুলোর আদিরূপ সম্পর্কে প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কারণ, মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যে বিভিন্ন রকম সংযোগ ও বিয়োগের সুযোগ প্রচুর ছিল---বিষয়গত, রূপগত, আঙ্গিকগত ক্ষেত্রে। একটি গীতিকা রচিত হওয়ার পর যখন গেয় বা গীত হয় কিম্বা কোন স্মৃতিধর সেটিকে প্রচারিত করেন তখন সেই রচয়িতার দ্বারা ঘটনা, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি পরিবর্তিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গীতিকার পালা গানগুলো যখন গেয় হয় তখন ঐসব অঞ্চলের ভাষাও তাতে সংযোজিত হতে পারে। অর্থাৎ গীতিকার সম্পূর্ণ রূপটাই হচ্ছে বিমিশ্র। এই বিমিশ্র রূপকে ভিত্তি করে গীতিকার উদ্ভবের কাল সম্পর্কে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

William Morris ব্যালাড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন--- the finest poems in our language. কবি Swinburne এর দৃষ্টিতে 'the most precious treasures of our own or any langauge' ? খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ব্যালাডের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি ঘটে। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে ব্যালাডের পরিচিতি অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে পাশ্চাত্যদেশে ব্যালাডের বহুল পরিচিতি ঘটে ষোড়ষ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকাল থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত। বলা হয় ডেনমার্কের প্রাচীনতম ব্যালাডগুলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত। জার্মানীতে প্রথম ব্যালাডের সন্ধান পাওয়া যায়:--- চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের সূচনালগ্নে। স্পেনে ব্যালাডের প্রচলনকাল চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কাল। ফ্রান্সে ব্যালাডের প্রচলন দেখা দেয়--- পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব বলা যায়, ব্যালাড খুব প্রাচীন কালের সৃষ্টি নয়। মধ্যযুগের অনেক পরবর্তীকালে সাহিত্যের এই বিশেষ আঙ্গিকটির উদ্ভব।

গীতিকার সুনির্দিষ্ট কালের সঠিক তথ্য প্রদান বির্তক সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কাল সম্পর্কিত তথ্য নির্ভর যুক্তির অবতারণা যুক্তিযুক্ত। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞের (গ্রেভস্, লীচ, মোলিয়র, চসার, গোয়ার) মতে ১৪শ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে ব্যালাডের উজ্জীবন কাল। যেমন ররার্ট গ্রেভস্, তাঁর ইংলিশ স্কটিশ ব্যালাড বইতে উল্লেখ করেছেন--- "ইউরোপের যে যুগটিকে ব্যালাডের স্বর্ণযুগ বলা হয় সেটি ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।"[২]

"Through most of them date from the early fourteenth to the widdle of the seventeenth century the golden age of Balladry"[৩] যদিও ইংলিশ ব্যালাডের জন্ম ১৬শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে তথাপি মারিয়া লীচের মতে--- "১৩ শতকের পান্ডুলিপিতে 'জুডাস' নামে একটি প্রাচীন ব্যালাডের সন্ধান পাওয়া গেছে যা কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে সংরক্ষিত।"[৪] ফরাসি কবি গিলম ডি ম্যাচট বলেছেন, ১৪শ শতাব্দীতে ব্যালাড সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। ক্রমান্বয়ে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জনে সক্ষম হয় ১৭শ শতাব্দীতে।

প্রাচ্যের প্রাপ্ত লোকগীতিকার কাল সম্পর্কে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে--- 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' প্রথম গীতিকা--- লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন--- "১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা লোকসাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রথম প্রকাশ পায়, তাহা 'গীতিকা'। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন উত্তর বাংলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এক গীতি কাহিনী শুনিতে পাইয়া তাহা 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশিত করেন।"[৫] গীতিকা হিসেবে উক্ত গীতিকাটি মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ গীতিকা রূপে জনমন আকৃষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

করে। তাছাড়া রূপগত ও কৌশলগত দিক বিচার করলে গীতিকার জন্ম কাল যে প্রাচীন নয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। গীতিকার উদ্ভবকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান দুরূহ ব্যাপার বলে বিবেচিত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটার অনেক পরে গীতিকা রচিত হয় বলে সন-তারিখ এবং মূলসূত্র থাকে অনুমান সাপেক্ষ। যেমন- 'ময়মনামতির গান' নামক গীতিকায় বাংলার খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সমাজচিত্রের যে তথ্য-- সে সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন দাবী করেছেন বলে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলার লোকসাহিত্যে উল্লেখ করেছেন, "খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই উক্ত গীতিকাটি রচিত হইয়াছিল।"[৬] কিন্তু এই তথ্যের সত্যতা নির্ণয় করতে হলে দেখা যায় একাদশ শতকের "ময়নামতি গোবিন্দ চন্দ্রের কাহিনীর অস্তিত্বের প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দের পূর্বে পাওয়া যায় নাই বটে তবে কয়েক শতাব্দ আগেই যে কাহিনীটি বাঙ্গালা ভাষায় গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার প্রমাণ আছে।"[৭] আমরা দেখতে পাই যে, গীতিকার বিষয়বস্তুর জন্ম পল্লীর স্বভাব কবিরূপ রচনাকারদের মুখে মুখে। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে শিল্পনিপুণ স্বকীয়তায় নিজস্ব ভাব ও রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে মঙ্গলকাব্যের। সমসাময়িককালে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব সে কারণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সংক্রামিত হয় গীতিকার আঙ্গিক গঠনের ক্ষেত্রে। সুতরাং 'ময়নামতি' গানের অস্তিত্বের প্রকাশ ষোড়শ শতকের দিকে হলেও পূর্ণাঙ্গ গীতিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সুতরাং কাহিনী সূত্রের অনুসন্ধান আনুমানিক না হয়ে পারে না।

ময়মনসিংহে প্রাপ্ত গীতিকা সাহিত্যও আঞ্চলিক লোকসমাজের আচার-আচরণে সুপুষ্ট। ময়মনসিংহ গীতিকা আমাদের হাতে যে কালে এসে পৌছেছে, সে যুগ পর্যন্ত কাল পরিক্রমায় পূর্ব-ময়মনসিংহের লোক-মানস ক্রম-বিবর্তিত হয়ে হয়ে সংস্কৃতি-মিশ্রণজনিত এক নূতন অবয়ব ধারণ করেছিল। তাতে গারো হাজংদের জীবনাচার-জাত মৌলিক প্রভাব যতছিল--- পরবর্তীকালের আর্য-ব্রাহ্মণ্য অভিজাত সংস্পর্শের ছাপও তার চেয়ে কিছু কম ছিল না। গীতিকাগুলোর প্রায় কোনটিই সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তীকালের রচনা নয়। তাছাড়া, দুতিনশ বছর মুখে মুখে প্রচলিত থাকার পর মাত্র বিশ শতকের প্রথম দিকে এসব কাব্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কাব্য কথা ও কাব্যরূপ বিশ শতক পর্যন্ত লোকমুখে ফিরে লোকজীবনের সঙ্গেই যে নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৮]

গীতিকার উৎপত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যে প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীনতর সমালোচকগণ গীতিকা ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত গীতিকাও কোন সংহত সমাজের সৃষ্টি। কালক্রমে এ মত সামান্য পরিবর্তিত হয়। তখন মনে করা হত যে, ব্যক্তিবিশেষের অধিনায়কত্বে সমাজের জনসাধারণ এটি রচনা করত--- যিনি এর রচনাকার্যে অধিনায়কত্ব করতেন, তিনি এর সম্পাদনকার্য করতেন মাত্র--- এর অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করে সামগ্রিকভাবে এর ভিতর থেকে একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তুলতেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ এই উভয় মতই পরিত্যাগ করে এটি ব্যক্তি প্রতিভার একক সৃষ্টি মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, গীতিকা ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্ত্যমধ্যযুগীয় সৃষ্টি, এর পূর্ববর্তী সৃষ্টি নয়।

পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যে গীতিকার উদ্ভব সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, এটি আদিম বা অসভ্য সমাজের সৃষ্টি নয়--- এটি উন্নততর বা সভ্য সমাজের সৃষ্টি। আদিম সমাজে সঙ্গীতের অস্তিত্ব থাকলেও গীতিকার কোন অস্তিত্ব নেই। অতএব এটি আদিম সমাজ হতে উদ্ভূত হতে পারে না। 'এপিক' রচনার পরবর্তী যুগে গীতিকা বা ballad এর উদ্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ মতটির উপর কোন কোন সমালোচক অত্যন্ত জোর দিয়ে থাকেন। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় এপিক হতে বিষবস্তু গ্রহণ করেও গীতিকা রচিত হয়ে থাকে।

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক মনে করে থাকেন যে, গীতিকা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় রোমান্সেরই এক একটি সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। তাঁদের মতে, গীতিকা মধ্যযুগীয় ইউরোপের সাহিত্য অবশেষ নিয়েই রচিত, বিষয়বস্তু কিংবা প্রেরণার দিক দিয়ে এদের মধ্যে অভিনবত্ব কিছুমাত্র নেই। আধুনিক কোন কোন সমালোচক এ উক্তি স্বীকার করেননি। তাঁরা মনে করেন, গীতিকা মধ্য যুগীয় রোমান্টিক সাহিত্যের অঙ্গ নয়; এটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, লোকসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করে এদের উদ্ভব হয়েছে।[৯]

গীতিকার রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য থেকে অধিকাংশ গীতিকার রচনাকাল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ- চিহ্নিত সময়পর্ব বলে অনুমান করা যায়। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক উভয়ে কোন কোন গীতিকার রচনাকাল প্রাক্-মুসলিম পর্ব, আবার কোন কোন গীতিকার রচনাকাল ব্রিটিশ শাসনযুগ বলেও মত ব্যক্ত করেছেন। শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন "পল্লীগীতিকাগুলির মধ্যে 'শ্যামরায়', 'আঁধাবধূ' ও 'ধোপারপাট' ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। 'কাজলরেখা', 'কাঞ্চনমালা', ও 'মালঞ্চমালা' তাহারও অনেক পূর্বের রচনা। এই সকল সুপ্রাচীন পল্লী গাথায় গুপ্তযুগের আদর্শ পাওয়া যায়।"[১০] একই গ্রন্থে তিনি আরও বলেছেন, "এই পল্লী গীতিকাগুলির মধ্যে 'মহুয়া', 'মলুয়া' ও 'ধোপারপাট' 'কালজরেখা', 'শ্যামরায়' প্রভৃতি কয়েকটি এমন পালাগান আছে যাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।"[১১]

এ ছাড়াও গীতিকার উদ্ভবকাল সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন:-

ক) "সংগ্রাহকরা এগুলিকে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে প্রচার করেছেন।"[১২] খ). কোন কোন গীতিকায় যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল। যদিও ইহাদের ভাষার এই প্রাচীনতা রক্ষা পাইবার কথা নহে এবং তাহা পায়ও নাই, তথাপি ইহাদের বিষয়বস্তু হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।"[১৩] গ). ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক তাঁর সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন, "এইসব পালাগানের অনেকগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে।"[১৪] প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকার চতুর্থ খণ্ডে (১৯৭২) 'মইষালবন্ধু', 'সাঁজুতী কন্যার পালা' শীর্ষক গাথার ভূমিকায় তিনি বলেছেন, পালাটি বোধ হয় প্রাক্-মুসলিম যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।[১৫] তবে তিনি অধিকাংশ গাথার রচনাকাল মুসলিম যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। ঘ). ধীরেন্দ্রনাথের এ সম্পর্কিত মন্তব্য হল---"পূর্ববঙ্গ গীতিকার বেশিরভাগ পালাই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে লেখা, বাংলা এ সময়ে মুঘল শাসনাধীনে। কিছু পালা হয়তো আরও আগেকার--- চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এই পশ্চাৎসীমা হতে পারে।"[১৬] গীতিকারদের অধিকাংশ পালাই বিশেষতঃ প্রণয়গাথাগুলো মুঘল শাসনকালের রচনা বলেই মনে হয়।

আমরা দেখতে পাই---গীতিকাগুলো মুদ্রিতরূপের পরিপ্রেক্ষিতে অর্বাচীনকালের রচনা বলে পরিগণিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অনেকেই আমাদের গীতিকাগুলোর বিশেষতঃ ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলোর অর্বাচীনত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখি গীতিকাগুলো প্রচারিত হয়েছে, গীত হয়েছে, ফলে এগুলোর ভাষারূপে যতই অর্বাচীনত্বের ছাপ থাকুক, মূলতঃ কাহিনীগুলো তেমন

Dhaka University Institutional Repository

অর্বাচীনকালের নয়। এসব কাহিনীর জন্মকাল, পালাকারের কাল এবং সংগ্রহের কাল সবই পৃথক বলে অনুমিত হয়।

ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে গাথা-কাব্যের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুর থেকে একটি গীতিকা সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে তা প্রকাশ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজী গল্প লেখক শশীচন্দ্রদত্ত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে পনেরটি কবিতা লিখেছিলেন 'Indian Ballads' নাম দিয়ে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে গ্রীয়ারসন সংগৃহীত গীতিকার কিছু অংশ উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করেন। সাধারণ পাঠকের কাছে এ সূত্রে 'গোপীচন্দ্রের গানের' পরিচিত লাভ ঘটে।

১৩০৮ বঙ্গাব্দে দুলর্ভমল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্রগীত' শীবচন্দ্রশীলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত এটিই একমাত্র নাথগীতিকা। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ময়নামতীর গানের একটি পাঠ সংগ্রহকরে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ভবানীদাস 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। ১৩২১ বঙ্গাব্দে নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্ত রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গোপীচন্দ্রের গানের ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। ২য় খণ্ডটির প্রকাশকাল ১৯২৪। ১ম খণ্ড ছিল 'গোপীচন্দ্রের গান' অপরপক্ষে ২য় খণ্ডে ছিল 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'। এরপর দীর্ঘ ৩৫ বৎসর পর ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় নাথগীতিকার সংকলন। এরপর আসে ময়মনসিংহ গীতিকার প্রসঙ্গ। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ছাড়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চল থেকে মুখ্যতঃ আশুতোষ চৌধুরী সংগৃহীত গীতিকাগুলো দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনাতেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যপুষ্ঠ হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় গীতিকাগুলো ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে 'Eastern Bengal Ballads- Mymensingh' -নামে প্রকাশিত হয়।

বাংলা গীতিকাচর্চার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তি ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হলে ক্ষিতিশচন্দ্র এ- পালাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হন। ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দীনেশচন্দ্র সেনের মৈমনসিংহ গীতিকা ও তিনখণ্ডে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গগীতিকায় সংকলিত মোট ৫৪টি পালার মধ্যে ছেচল্লিশটি পালা প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকার সাতটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। বলা যায় মতামতের ভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ গীতিকার উদ্ভবকাল বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগ চিহ্নিত।

সুতরাং গীতিকার কাল নির্ণয় সম্পর্কে বলা যায়--- "বাঙ্গালী জাতির জন্ম মুহূর্ত যেমন তার কোষ্ঠীতে নেই," [১৭] তেমনি গীতিকার জন্ম লগ্নের সঠিক কাল নির্দেশ আনুমানিক না হয়ে পারেনা। বাঙালির জন্মবীজে যেমন রয়েছে যৎসামান্য আর্যরক্তের সঙ্গে দ্রাবিড়, কোল ও মোঙ্গলের সংমিশ্রণ তেমনি গীতিকার মূলবীজে রয়েছে মধ্যযুগীয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা ও প্রজ্ঞার উৎকর্ষ। এভাবে ক্রমশঃ সামাজিক ও মানসিক বিকাশের ধারা অতিক্রম করে সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বিকাশ তরান্বিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। গীতিকা তারই একটি ক্রমবিকশিত রূপ। বিদ্বজ্জনের ধারণায় স্বাধীন সুলতান আমলে অনুপ্রাণিত হয়ে রচয়িতার অভিজ্ঞতার জীবনোপলব্ধির ফসল এই গীতিকা।

মৈমনসিংহ গীতিকা, নাথগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা---এ যুগেই সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সিঁড়ি বেয়ে বিকশিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণ এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে বাংলার লোকসাহিত্য বিকাশে সহায়তা করেছে। নানা কালে নানা দিক থেকে আগত বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ পল্লীগ্রামের একই প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার মধ্যে মূলগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কারণ লৌকিক সাহিত্য বা Oral Tradition দেশের জনমনেরই সাহিত্য। মানুষের সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা বিজড়িত হৃদয়াকুতির আলেখ্য যে সাহিত্য, সকল দেশের, সকল কালের, সর্বস্তরের জনমানুষের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত--- সে সাহিত্যের আবেদন সর্বকালীন। গীতিকার পূর্ণাঙ্গরূপ দেরীতে পাওয়া গেলেও গীতিকার সূত্রপাত যে নাথসাহিত্যের সূচনাকাল থেকে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, (প্রথম পর্যায়) কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮০

২. চিত্তমণ্ডল : লৌকিক বাংলা, ফোকলোর পরিষদ, ঢাকা-১৯৮৬, পৃ. ৭২-৭৩

৩. Robert Graves : English Scottish Ballads, London. 1957, P-vii

৪. Maria Leach Ed, Standard Dictionary of Folklore : Mythology & Legend. Vol- 1, P-108.

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৭৯

৬. ঐ, পৃ. ৩৫

৭. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খন্ড) কলিকাতা- ১৯৬৫, পৃ. ২২৭

৮. ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, (তৃতীয় সংস্করণ- ১৯৬২), পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, (দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৫৭), পৃ. ২৮৭-২৮৯

১০. দীনেশ চন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (নবম সংস্করণ-১৯৮৬) পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ১২৬

১১. ঐ, পৃ. ৬৯১

১২. নন্দগোপাল সেন গুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৮, পৃ. ৪৩

১৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খন্ড, কলিকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৬২, পৃ. ৩৭১

১৪. ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক : প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম খন্ড) পৃ. ৮

১৫. ঐ, পৃ. ৮

১৭. Robert Graves : English & Scottish Ballads, London. 1957.

Dhaka University Institutional Repository

লোকগীতিকাঞ্চল

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গীতিকা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'নাথগীতিকা', 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা', 'রংপুর গীতিকা' ও 'সিলেট গীতিকা' উল্লেখযোগ্য। 'মোমেনশাহী গীতিকা' 'রংপুরের পালাগান' প্রভৃতি নামেও কিছু গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে।

নাথগীতিকা

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত যেসব গান সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে সেসবের মধ্যে নাথগীতিকার কথাই সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। গোপীচন্দ্রের গান স্মরণাতীত কাল থেকে রংপুর জেলায় প্রচলিত ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে এ গান সংগ্রহ করে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' নামে তা প্রকাশ করলে নাথগীতিকা সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গোপীচন্দ্রের গানের হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় সংগৃহীত ভবানীদাস বিরচিত পুঁথি এবং উত্তরবঙ্গে সংগৃহীত মুসলমান কবি সুকুর মামুদের লিখিত পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে শিবচন্দ্রশীলের সম্পদনায় দুর্লভ মল্লিক বিরচিত 'গোবিন্দচন্দ্রগীত' প্রকাশিত হয়। বর্ধমান জেলার এই গীতিকাটি পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত একমাত্র নাথগীতিকা। নাথগীতিকাগুলো প্রধানত উত্তরবঙ্গেই প্রচার লাভ করে। সেখানে তা 'যুগীযাত্রা' নামে পরিচিত। এই গীতিকার নায়ক গোপীচাঁদ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র বলে গৃহীত হন। ত্রিপুরা জেলা তার রাজধানী ছিল বলে মনে করা হয়। নাথগীতিকার কোন কোন পুঁথি পূর্ববঙ্গে আবিস্কৃত হলেও উত্তরবঙ্গেই এর প্রচার সর্বাদিক।

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা গীতিকাগুলোকে দু'টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন- (১). পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা ও (২). দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা। তাঁর মতে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ হল পূর্ববঙ্গ গীতিকার অঞ্চল আর নোয়াখালী-চট্টগ্রাম, দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার অঞ্চল। ময়মনসিংহ প্রধানতঃ দুটি ভৌগোলিক অংশে বিভক্ত। এ দুটি স্বতন্ত্র বিভাগে দু'টি আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে উঠে। অবস্থান অনুযায়ী এদের পূর্বে ময়মনসিংহ ও পশ্চিম ময়মনসিংহ বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

পূর্ব ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গীতিকার সূতিকাগার বলে পরিগণিত। বিশেষ করে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, কেন্দুয়া প্রভৃতি স্থানের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাই এ অঞ্চলের উৎপত্তি ও সীমারেখা সম্পর্কেও আমাদের মোটামুটি ধারণা নেয়া প্রয়োজন মনে করি। ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে জানা যায় "পূর্ব বাংলা একান্তই নবভূমি এবং নবভূমি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা মেঘনার সৃষ্টি।"[১] সে সূত্রে ময়মনসিংহ জেলা এক সময় ব্রহ্মপুত্র বা 'লৌহিত্য নদীর'[২] ভাঙ্গা গড়ায় উদ্ভূত। বলা যেতে পারে এটি মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল। এখানে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল এবং চরের বুক চিরে প্রবাহিত অসংখ্য ছোট-ছোট খাল, নদী,শাখা-নদী এবং সে নদীগুলোর গতি পরিবর্তনকালে সাবেক চর ভেঙ্গে গড়ে তোলে নতুন চর ও হাওর। আবার কোন কোন সময় নদীবাহিত বালি-পলি মাটির স্তর বিন্যাসেও গহীন নদীর গর্ভ থেকে জেগে ওঠে দ্বীপ সদৃশ্য বিশাল হাওর। আর এ হাওর বা বিস্তীর্ণ জলাভূমিই এতদঞ্চলকে বিশেষ করে সমগ্র ভাটি অঞ্চলকে মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বরাবর। তাছাড়া এখানে জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-খণ্ড বিশাল মধুপুর গড় বলে আখ্যাত। অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক বিবরণের দিক থেকে এতদঞ্চলের অধিকাংশই জঙ্গল-চর-নদ-নদী ও হাওর অধ্যুষিত। বিশেষ করে জামালপুর ও সদরের বিস্তীর্ণ এলাকা ছোট-ছোট খাল, শাখা-নদী, চর কিংবা দ্বীপাঞ্চলে মণ্ডিত।[৩] তাছাড়া দেওয়ানগঞ্জ এবং শেরপুর থানা এমনকি জামালপুরসহ সরিষাবাড়ি, দুর্গাপুর ও ফুলপুর একসময় ব্রহ্মপুত্র গর্ভে নিমজ্জিত ছিল।[৪]

আটটি জেলার সমন্বয়ে পরিবেষ্টিত একটি সর্ববৃহৎ জেলা ময়মনসিংহ। এ জেলার পশ্চিমে পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী, উত্তরে গারো পাহাড় এবং পূর্বে সিলেট ও ত্রিপুরা এবং বাকি অংশ ঢাকা জেলা ও ছোট-ছোট খাল, শাখা-নদী, বিশেষ করে মেঘনা নদী পরিবেষ্টিত সীমারেখায় নির্দিষ্ট। এই ভূ-খণ্ডে ফুলপুর ও দুর্গাপুর থানার কেন্দ্রবিন্দুতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জঙ্গলাকীর্ণ বহু গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয় এবং বহু গ্রাম বিশাল বিল-পরিব্যাপ্ত দ্বীপের মত শোভা বর্ধন করে। সঙ্গে সঙ্গে নলিতাবাড়ী ও পিয়ারপুরের কিছু অংশ এবং সরকারপুর থেকে পাগলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল এক ধরণের ঘাসে পরিপূর্ণ। এছাড়া ময়মনসিংহের বাকী অংশ বিশাল বিল সমন্বিত, যা নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এসব নিম্নাঞ্চল সারা বছরই পানি ও কাদায় পরিপূর্ণ থাকে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে তাতে বোরো ধান ছাড়া অন্য কিছুই লাগানো যায় না। আর কিছু কিছু গভীর বিল আছে যা কেবল পদ্মফুল সজ্জিত লেকের মতই দৃশ্যমান।

বৃহত্তর ময়মনসিংহে ধান, পাট, চিনা, কাউন, সরিষা, তুলা, তামাক, মরিচ, আলু, ঝিঙা কিংবা বিচিত্র রকমের শাকসবজি উৎপাদিত হয়। চরাঞ্চলের ঝাউবন, কাশবন ইত্যাদিও বৈচিত্রপূর্ণ ভূ-প্রকৃতির সন্ধান দেয়। জামালপুর, টাঙ্গাইল এবং নেত্রকোণা মহকুমার গ্রামের সমতল ভূমি ও বিলগুলোতে প্রচুর ধান জন্মে। ধানের মধ্যে আমন, আউস ও বোরো প্রসিদ্ধ। এছাড়া সমগ্র এলাকায় তিশি, পেঁয়াজ, রসুন, মিষ্টি আলু, মুলা, ডাল, তরিতরকারি ও শাকসবজির চাষ হয়। এ সমস্ত অঞ্চলে আখ চাষেরও প্রচলন দেখা যায়। তাছাড়া মধুপুর জঙ্গল ও গারো পাহাড়ে তুলা চাষের প্রচলন ছিল। কৃষি কাজের উপযোগী পলিমাটি সমৃদ্ধ উর্বর ভূমির কারণে এসব অঞ্চলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নিরন্ন দরিদ্র জনমানুষের মিশ্র সমাজ গড়ে উঠতে থাকে, যা গীতিকায় মুক্ত সমাজ গঠনে সহযোগিতা করেছে।

আমরা দেখতে পাই- ময়মনসিংহের গীতিকাগুলোর উদ্ভব বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা অঞ্চলের সর্বত্র ঘটেনি। ব্রহ্মপুত্র নদ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলকে যে প্রধান দুই অংশে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে বিভক্ত করেছে, তা রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক পরিবেশগত দিক থেকেও ভিন্নমাত্রায় চিহ্নিত। এর মধ্যে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলই গীতিকাগুলোর উর্বর উদ্ভব ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "মৈমনসিংহ গীতিকা মৈমনসিংহ জেলার পূর্বভাগ বিশেষতঃ নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই প্রচলিত। সদর মহকুমার পূর্বাংশ ও এই সীমার সহিত সংযুক্ত। যে ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহ জিলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে সাধারণভাবে বলিতে গেলে, তাহার পূর্বভাগই মৈমনসিংহ-গীতিকার উৎপত্তি ও প্রচারস্থল, পশ্চিমভাগ নহে।" [৫]

পাহাড়, নদী, জঙ্গল, হাওর, প্রভৃতির সমাবেশে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল বিচিত্র ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। উত্তরে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তা পর্বতশ্রেণী, পূর্বে বিভিন্ন হাওর (তলার হাওর, জেলের হাওর, বাবারার হাওর প্রভৃতি) এবং বহু নদ-নদী (ব্রহ্মপুত্র সোমেশ্বরী, কংস, ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া, উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা প্রভৃতি) নিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চল সমৃদ্ধ। পর্বতের কোল বেয়ে যেমন নেমেছে নদী, তেমনি নেমেছে হিংস্র, সর্প, বাঘ সঙ্কুল ঘন অরণ্য ভূমি। ঝিল ও তড়াগ, কুড়া পাখির গুরু গম্ভীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, বারদুয়ারী ঘর, সানবাঁধা পুকুরঘাট, শালিধানের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত, সুরভিময় কেয়াবন--- সবমিলে এক বিচিত্র বহুবর্ণিল নিসর্গ শোভা। পূর্ব ময়মনসিংহের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানকার মানুষের হৃদয়াবেগকে গতিময়তা দান করেছে।

এসব চর, হাওর, বিলের কথা গীতিকায় নর-নারী চরিত্রগুলোকে আশ্রয় করে উল্লিখিত হয়েছে। নদ-নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র কিংবা ফুলেশ্বরী অথবা ধনু নদীর কথাও নায়িকা চরিত্র প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এসব নিম্নাঞ্চলের অসংখ্য খাল-বিল-হাওর-নদীর উপস্থিতি দৃষ্টে মনে হয় এগুলোই এতদঞ্চলের মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে এবং তারই বাস্তব রূপ গীতিকায় প্রতিফলিত। যেমন 'মানিক তারা বা ডাকাইতের পালা' এখানে ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙা-গড়ায় মানব-মানবীর মানস গঠনের দিকটিই যেন প্রস্ফুটিত হয়েছে। অভাব তাড়িত মানুষ যে কিভাবে নির্মম ডাকাতে পরিণত হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত এই 'মানিক তারা বা ডাকাতের পালা' গীতিকাটি।

বলা যায়, এই বিল-হাওর অধ্যুষিত বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত নিম্নভূমি বা ভাটি অঞ্চলই মৈমনসিংহ- গীতিকার জন্মভূমি। এই অঞ্চলেই বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল। বর্তমানে এই অঞ্চলই প্রধানত: কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা মহকুমা দ্বারা বিভক্ত। সদর মহকুমার পূর্বাংশ অর্থাৎ নন্দাইল ও কিশোরগঞ্জ থানাও এর সীমাভুক্ত। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গীতিকাগুলোর প্রতি পদে যুক্ত হয়ে আছে। তাই একটি সার্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও আঞ্চলিক আবেদনটি এর মধ্যে অধিক প্রত্যক্ষ। এজন্যই এ গীতিকাগুলো এর নিজস্ব সীমা অতিক্রম করে বাংলার অন্যত্র বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

এই অঞ্চলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে আদিবাসী জনগণের বসবাস অধিকমাত্রায়। গারো, হাজং, কোচ, হাদি প্রভৃতি আধিবাসী জনগোষ্ঠী সুপ্রাচীন কাল থেকে এখানকার পাহাড় বেষ্টিত অঞ্চলে বসবাস করেছে। বাংলাদেশের হাজং সম্প্রদায়ের প্রায় শতভাগ এবং গারো জনসংখ্যার প্রায় নব্বই ভাগের বসবাস এই অঞ্চলে। এসব আদিবাসী জনগণের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনাচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের পরিবর্তনহীন কৃষি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল উপাদান হিসেবে সক্রিয় থেকেছে। আমরা দেখতে পাই কেবলমাত্র পূর্ব-ময়মনসিংহেই নয়; বাংলাভাষী যে সব অঞ্চল ব্রাহ্মণ্য শাসন বহির্ভূত ছিল, সেসব অঞ্চলেই গীতিকার উদ্ভব লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "পালা গানের অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, সে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সকল অবাধ ও অপ্রতিহত যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে--- সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।"(৬)

এতদঞ্চলের জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা এ সমস্ত বৈরী পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে দেখা যায়। ফলে এসব মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য যেমন বেপরোয়া, বর্বরতা, নির্মমতা এবং সংগ্রামশীলতা গীতিকায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এতদঞ্চলের মানুষ বিপর্যস্ত হলেও প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যও তাদের উজ্জীবিত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে অবগাহন করে তারা নিজ ভুবন গড়ে তোলে। প্রকৃতি ও মানুষের এ সান্নিধ্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যালোকে রূপায়িত হয় এবং সেজন্যই ময়মনসিংহের গীতিকায় উক্ত অঞ্চলের খাল-বিল, নদ-নদী, চর, হাওর, ফুল, পাখি, জীব-জন্তু এমনকি আলো-হাওয়ার গন্ধ-স্পর্শ লাভ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন- "এই গীতিকাগুলিতে যেন প্রকৃতি ও মানব হৃদয় একাত্ম হইয়া গিয়াছে, কবিরা প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে মানুষের নিগূঢ় হৃদয় রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।"(৭) তাছাড়া "ইহাদের মধ্যে মানুষের হৃদয়ানুভূতি, মানুষের সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের সমন্বয়ে এক সজীব ব্যঞ্জনাময় কবিত্বস্বর্গ রচিত হইয়াছে। এ স্বর্গই যেন পূর্ববঙ্গ গীতিকার জীবনালেখ্য।"(৮)

ড. রমাপ্রসাদ চন্দের অনুসরণে আমরা অসভ্য বর্বর- নিষাদের (কিংবা কিরাতের) সঙ্গেই ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষের জাতিতত্ত্বের সংযোগ স্থাপিত হতে দেখি। ময়মনসিংহের বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলে গোড়া থেকেই যে একদল সুসভ্য মানুষ বাস করত এ কথা খুব জোরালো ভাবে বলা না গেলেও তাদের সঙ্গে যে দু'একজন বহিরাগত কবি সাহিত্যিকের আর্বিভাব ঘটতে পারে কিংবা তাদের দ্বারা গীতিকার মত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব-- এ কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ক্রমান্বয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে এসব এলাকায় সভ্য মানুষের আগমন ঘটে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ কাঠামো ও পরিবর্তিত হয়।

ময়মনসিংহের বিচ্ছিন্ন এলাকায় এক সময় রাজচ্যুত ভিন্ন মতাদর্শী, স্বাধীনচেতা দুঃসাহসী, যুদ্ধাপরাধী, আইনের শাসন অমান্যকারী, সমাজচ্যুত ব্যক্তি কিংবা দস্যুতস্কর একটু নিরীহ শান্তিপ্রিয় সৃষ্টিশীল অধিবাসী এবং আদিবাসী কৃষক অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে স্বাধীনমুক্ত সমাজ গড়ে তুলেছিল। এ সমাজই পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলের চর-হাওর-বন-জঙ্গলের বিচ্ছিন্নমুক্ত স্বাধীন গীতিকার সমাজ। এ জন্যই বোধকরি গীতিকাগুলোতে রাজা-বাদশাহ থেকে আরম্ভ করে কৃষক, কোচ, হাজং, রাজবংশী, গারো, দরিদ্র, নিরন্ন-বর্বর, কিরাত, নিষাদ অথবা বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কামার-কুমার, ধোপা, নাপিত, ডোম-গোপ, দাস-পতিতা, কুলি-মজুর,পালকি বাহক, রাজা-বাদশাহ, সৈনিক-পীর-ফকির, দরবেশ-সাধু, সন্ন্যাসী-ব্রাহ্মণ এমনক দরিদ্র চাষী মজুরের মুক্ত সমাজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আর এভাবেই এতদঞ্চলের মানুষের রক্ত মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় ময়মনসিংহের মানুষ ও সমাজ গড়ে উঠেছে বলে ধারণা জন্মে।

রংপুর গীতিকা

রংপুর গীতিকা আলোচনা প্রসঙ্গে রংপুরে প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা নেয়া প্রয়োজন। ভৌগোলিক দিক থেকে আসাম, মণিপুর, জৈন্তিয়া, কাছাড়, মোমেনশাহীর কিছু অংশ এবং সিলেটের সঙ্গে রংপুরের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এখানকার প্রাথমিক যুগের নৃপতিদের মধ্যে পৃথ্বিরাজের নাম জানা যায়। রংপুরের 'চাকলাবোদা' স্থানে তাঁর রাজত্ব ছিল। পাল বংশের নৃপতিরাও এখানে রাজত্ব করেন। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মুসলমান বিজয়ের সূচনা হয়। মুসলমান বিজয়ের পর থেকে রংপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

বর্তমানে রংপুরের উত্তরে 'জলপাইগুড়ি' ও 'কুচবিহার', পূর্বে আসামের 'গারো পাহাড়' এবং যমুনা নদীর পশ্চিমে দিনাজপুর এবং দক্ষিণে বগুড়া জেলা। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও করতোয়া, নদীবাহিত অংশ পলি দিয়ে গঠিত হয়েছে রংপুরের মাটি। তিস্তা, ধর্লা, দুধকুমার ও সমকা রংপুরের জনপদকে স্নিগ্ধ ও সিঞ্চিত করেছে। ব্রহ্মপুত্রের নিরন্তর ধারা পরিবর্তন, ধূসর বালুচরের সূচনা ও বিলয় এর অধিবাসীদের মনকে উদাস করে দিয়েছে। সৃষ্টি করেছে লোকসাহিত্যের উর্বর পশ্চাদভূমি।

ময়মনসিংহ গীতিকার পটভূমি হিসেবে আমরা যে পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ্য করেছি রংপুরের ক্ষেত্রেও তার কিছুটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। ভৌগোলিক দিক থেকে এসব অঞ্চল অনেকটা

Dhaka University Institutional Repository

একই উপাদানে গঠিত। সাঁওতাল, কোচ, হাজং, রাজবংশী ইত্যাদি উপজাতীয় সংস্কৃতির বিস্তার রংপুরের মৌলিক সমাজকে অনেকাংশে স্পর্শ করেছে। রংপুরের গীতিকাগুলোতে আমরা তা লক্ষ্য করি।

সিলেট গীতিকা

আমরা দেখতে পাই ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান তেমন বেশি নেই। সেজন্য এসব অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান অনেকটা একই সংযোগ সূত্রে আবদ্ধ। খরস্রোতা, পাহাড়ী নদ-নদীর নিরন্তর ধারা পরিবর্তনের ফলে জনপদের সৃষ্টি ও বিলয়, সুনীল আকাশের নীচে বেতস বাঁশ ও অন্যান্য জানা-অজানা বৃক্ষের অরণ্যভূমি ইত্যাদি এর অধিবাসীদের মানস ক্ষেত্রকে লোকসাহিত্যের উর্বরভূমিতে পরিণত করেছে। সিলেটের আঞ্চলিক লোকজীবন প্রধানত: মাতৃতান্ত্রিক। নারীর স্বয়ম্বর গ্রহণ, পূর্বরাগ ইত্যাদি এর বৈশিষ্ট্য। নারী এখানে স্বেচ্ছাচারী নয়; বরং তার স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। গীতিকা সাহিত্যে আমরা এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি।[৯]

অন্যান্য গীতিকা

চট্টগ্রাম অঞ্চলের গাথাগুলোতে মানুষের জীবন-সমাজ-সংস্কার-সংস্কৃতি তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হার্ম্মাদ্যা (দস্যু) কবলিত দুর্দশাগ্রস্ত জনজীবন লক্ষ্য করা যায়। চট্টগ্রামের প্রায় সব পালাতেই রাজা-বাদশাহ, ধনিক-বণিক শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে নীতিকথা আধ্যাত্মিকতা এবং মুসলিম ঐতিহ্যবোধ ফুটে উঠেছে।

ফরিদপুর অঞ্চলের গীতিকাগুলোতে আমরা দেখি তৎকালীন পুরুষপ্রধান সমাজে নারী মূলত: গুরুজনের মর্জি-বন্দী ছিল। ফলে তারা স্বাধীনভাবে হৃদয়বৃত্তির পরিচর্যা করতে পারেনি। এ অঞ্চলের গীতিকায় নারী স্বাধীনতা দৃষ্ট না হলেও তাতে বস্তুনিষ্ঠ জীবন নির্ভরতা একেবারে উপেক্ষিত হয়নি এছাড়া ফরিদপুরের পালাগুলোতে তৎকালীন সামন্ত রাজা-বাদশাহদের বিলাসী ভাবনা-চিন্তা, আচার-আচরণ বহুবিবাহ ও বহুনারী সম্ভোগের চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এগুলোতে বস্তুনির্ভর স্বাধীন প্রেম নেই। কিন্তু এদের মধ্যে একটা বীরাঙ্গনা ভাবমূর্তি লক্ষ্য করা যায়।

খুলনা অঞ্চলের গাথাগুলোতে শ্রেণী বৈষম্যমূলক সমাজের সামন্তরাজা-বাদশা-ধনিক-বণিক সম্পন্ন গৃহস্থ প্রভৃতির চাওয়া-পাওয়া, আচার-আচরণ ইত্যাদির প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। এখানে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত মানুষের বিরংসাবৃত্তির পরিচর্যা, নারী সম্ভোগজনিত বহুবিবাহ, দাম্পত্য কলহ, অলৌকিকভাবে বিপদমুক্তি কিংবা নি:সন্তান রাজা-বাদশাহর সন্তান লাভ, রাজপুত্রের স্বাপ্নিক অভিযানের ভিত্তিতে পরী-মানুষে বিয়ে এবং কাহিনীর মিলনান্তক পরিণতি লক্ষণীয়। সর্বোপটি এগুলোতে সর্বত্রই পুরুষ প্রধান সমাজের পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিতা নারীর মর্মান্তিক কাহিনী ও পরিস্ফুট।

এমনিভাবে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের বহুবিবাহ, দাম্পত্য কলহ, সতীনের ঈর্ষায় ছোট রাণীর নবজাত শিশুর প্রাণ-সংহারের অপচেষ্টা কিংবা কোন কোন গাথায় সতীনকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র ও দৃষ্ট হয়। এমন সমস্যা আমরা সিলেট, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলেও লক্ষ্য করি।

এভাবে বস্তুনিষ্ঠ জীবনালেখ্যের পাশাপাশি যাদু-টোনা তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটন, পীর-ফকির, সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন, মহাপ্রভু বা জিবরাইলের অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য দান, পরী-মানুষে বিয়ে, দৈত্য-দানবের উৎপীড়ন, অসহায় মানুষের প্রতি বাক-শক্তি সম্পন্ন,

Dhaka University Institutional Repository

পশু-পাখির সহানুভূতি প্রদর্শন--- "প্রভৃতি সব গীতিকায় এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর শিশুতোষ রূপকথার রস সঞ্চার করেছে। তবে ময়মনসিংহ গীতিকাগুলোতে তা স্বতন্ত্ররূপে আবির্ভূত হয়। কারণ সেখানে সবকিছুতেই একটা বস্তুনিষ্ঠ জীবন-নির্ভরতা উপলব্ধি করা যায় এবং সে তুলনায় অন্যান্য আঞ্চলিক গীতিকাগুলোতে এক অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক জগতের ভাবমণ্ডল গড়ে উঠেছে।"[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. নীহার রঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৯, পৃ. ১২৭

২. রমাপ্রসাদ চন্দ : ইতিহাসের বাঙালি, কলিকাতা- (প্রথম প্রকাশ- ১৯৮১) পৃ. ৯৭

৩. F.A.SACHSE : BENGAL DISTRICT GAZETTEERS, MYMENSINGH, BENGAL SECRETARIAT BOOK DEPO-1917, P-5

৪. Ibid. P-5

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, (প্রথম খন্ড : আলোচনা), পৃ. ঃ ৩৬৯

৬. দীনেশ চন্দ্র সেন : মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকাংশ, পৃ. ৫

৭. সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলাদেশের ইতিহাস, কলিকাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ) মাঘ- ১৩৮০, পৃ. ৪১৯

৮. ঐ, পৃ. ৪২০

৯. বদিউজ্জামান : সিলেট গীতিকা (প্রথম খন্ড) ১৯৭৯, ডিসেম্বর, ১৯৬৮, পৃ. ৩

১০. মোঃ শহীদুর রহমান : ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা লোকগীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গীতিকার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা লোকসাহিত্যে গাথা বা লোকগীতিকা এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে। মধ্যযুগের আগে লৌকিক সাহিত্য সম্বলিত কোন কাহিনী বড় পরিমণ্ডলে পরিবেশন করার পদ্ধতি জানা ছিল না। মধ্যযুগের এটি একটি বিশেষ অবদান। আবহমান গ্রাম বাংলার বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণ, সামাজিক রীতি-নীতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে আখ্যানমূলক গানগুলোতে।

গীতোপযোগী ছন্দোবদ্ধ জীবনালেখ্য 'গীতিকা' নামে অভিহিত। গীতিকার প্রতিশব্দ হিসেবে 'গাথা', 'পালাগান' ও 'গীতিকথা' শব্দের প্রচলন আছে।[১] বলা যেতে পারে-- এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে গীতিকা নামে পরিচিত। এটি গীত হয়ে থাকে বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যতালের সহযোগে। নাটকীয়তা গীতিকার অপর একটি বৈশিষ্ট্য। গায়েন যখন দোহার ও বাদ্যকারের সাহায্যে আসরে ঘুরে ফিরে গীতিকা পরিবেশন করেন, তখন গীত-নাচ-অভিনয়ের সমন্বিত দৃশ্যটি ফুটে উঠে। পরিবেশনের গুণে গীতিকা লোকনাট্যের আমেজ এনে দেয়। পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানীর সংজ্ঞাতেও গীতিকার বিষয় ও রূপাঙ্গিকগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ম্যাক এডওয়ার্ড লীচ বলেন ঃ

> 1. A ballad is narrative. 2. A ballad is sung. 3. A ballad belongs to the folk in content, style and designation. 4. A ballad focuses on a single incident. 5. A balled is impersonal, the action moving of itself by dialogue and incident quickly to the end.[২]

ইংরেজী Ballad-এর সমধর্মী পালাগানকে বাংলায় 'লোকগীতিকা' বলা হয়। ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন-ডেনমার্কের ভাষায় Visc, স্পেনীয় ভাষায় romance, রুশ bylina, ইউক্রেনীয় *dumi*, সাইবেরীয় *junacka*, *pesme* ইত্যাদি। জনশক্তিমূলক বিষয়ই এর ভিত্তি। গীতিকার মধ্যে রচয়িতার একটি আত্মনির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ পায়। একটিমাত্র ঘটনাই এর লক্ষ্য। গীতি-সংলাপ ও ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়ে এর কাহিনী শেষ পর্যন্ত দ্রুত সঞ্চারিত হয়। গীতিকায় বিশেষ একটি সঙ্কটপূর্ণ ঘটনামুখী কাহিনী থাকবে, ঘটনা এবং সংলাপের ভিতর দিয়েই এ কাহিনী অগ্রসর হবে। গীতিকার প্রধান শর্তই হচ্ছে একটি বিশিষ্ট কাহিনী অবলম্বন করে গীতিকা রচিত হবে-- এই কাহিনী শিথিলবদ্ধ হলে চলবেনা, দৃঢ়বদ্ধ হতে হবে। কাহিনী মাত্রেরই কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন-ক্রিয়া, চরিত্র, পরিবেশ ও বিষয়বস্তু। গীতিকার মধ্যেও এদের প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব থাকলেও তাদের মধ্যে ক্রিয়ার বা Action-ই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। অন্যান্য বিষয় গৌণ হয়ে যায়। নিরবচ্ছিন্ন কোন কাহিনীর ধারা অনুসরণ করে গীতিকা রচিত হয় না, বরং তার পরিবর্তে কাহিনীর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কতগুলো ঘটনার উপর গুরুত্বারোপ করে গীতিকা রচিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে কাহিনী একটি সমগ্রতা লাভ করে।

লোকগীতিকা সর্বত্রই গীত হয়। গীতের সঙ্গে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রও প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর সুর গতানুগতিক বলেই বৈচিত্র্যহীন, তবে সুর গীতিকার লক্ষ্য নয়, কাহিনীই এর লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সেজন্য অনুপূর্বিক গতানুগতিক সুরে গীত হওয়া সত্ত্বেও গীতিকা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এতে কথাই মুখ্য, সুর গৌণমাত্র।[৩]

গীতিকা নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত। সেজন্য এটি কণ্ঠস্থ করে রাখার কতগুলো সহজ প্রণালী অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সর্বপ্রধানই কোন কোন অংশের পুনরক্তি। অনেক গীতিকায় প্রতি স্তবকের শেষে থাকে 'ধুয়া' বা ধ্রুবপদ (refrain), যেমন- 'পরীবানুর হাঁহলায়' রয়েছে- হায়! হায়! দুক্ষে মরি রে' ধুয়ার পুনরক্তি। কোন কোন লোকগীতিকায় একটি চরণের বা বাক্যের বারবার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- 'সুজা তনয়ার বিলাপ'-এ আছে: 'নছিব এ কি ছিল রে!' আবার কোথাও কোথাও একটি ঘটনার পুন:পুন: উল্লেখ করা হয়; যেমন- পরীবানুর হাঁহলায়- 'সাগরে ডুবালি পরী রে'- কথাটির পুনরাবৃত্তি।

লোকগীতিকা মূলত বাস্তব জীবন ধর্মী, সমাজে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়। গীতিকার আখ্যানভাগ কদাচিৎ আজগুবি (fantastic) হয়ে থাকে। গীতিকা রূপকাশ্রয়ীও হতে পারে; তবে বস্তুধর্মিতা কোথাও লোপ পায় না। প্রেম ও মৃত্যু প্রভৃতি চিরন্তন বিষয় নিয়ে তার কারবার। ফলে তা প্রায়শই 'বিষাদান্তক' হয়ে থাকে। তার ঘটনা বিন্যাস ও সংলাপ-রীতি নাটকীয়। 'মহুয়া', 'ধোপার পাঠ' প্রভৃতি গীতিকায় এই নাটকীয়তা অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করেছে।

বর্তমানে প্রায় সকলেই গীতিকা ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনা বলে মত প্রকাশ করে থাকেন। অন্তত:পক্ষে গীতিকার প্রথম পর্যায় ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হয়। পরবর্তীকালে তা নানা জনের দ্বারা পরিমার্জিত হয়, সংযোজিত অথবা অংশবিশেষ বা পংক্তিবিশেষ বিয়োজিত হয়। সমালোচক যথাযথই মন্তব্য করেছেন: After an individual ballad was composed then the Folk came in. Ballads were oral the Folk took them over. Through the years of singing them, improved them sometimes, sometimes debased then but the folk had their way with them, and over the years put their mark upon them.[৪]

গীতিকা বিশেষ এক শ্রেণীর প্রতিভাবান কবি, শিল্পীদের দ্বারা রচিত। এঁরা নিছক সৃষ্টির আনন্দে বিভোর থাকেননি; বরং আপন গোষ্ঠীর মানুষকে আনন্দ দিতে, সে সঙ্গে নিজেদের উপার্জনের মাধ্যম রূপে এবং তৎসহ সৃজনী প্রতিভার পরিচয় রাখতে গীতিকা রচনায় ব্রতী হয়েছিলন। গীতিকায় যে শিল্পগুণের পরিচয় মেলে তাতেই বোঝা যায় গীতিকার রচয়িতারা অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই এই বিশেষ শ্রেণীর মৌখিক রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি, সুস্পষ্ট এক শিল্পবোধ এবং রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েই গীতিকা রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।[৫]

অধ্যাপক বিমল ভূষণ চট্টোপাধ্যায় গীতিকাগুলোতে সন্ধান পেয়েছেন ইউরোপীয় বণিকতন্ত্র ও এদেশীয় বণিকদের সহায়তায় এ দেশে পুঁজিবাদ বিকাশিত হবার, অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজ বিভাগের প্রতিফলন, শ্রেণী শোষণের অকপট অভিব্যক্তির--- "য়ুরোপীয় বণিকতন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও প্রাগাধুনিক যুগে আমাদের দেশীয় বণিকেরাও যে একদা আমাদের এ দেশের পুঁজিবাদকে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে তার প্রমাণ বাঙলার লোককাহিনীতে মেলে, বিশেষ করে গীতিকা সাহিত্যে।"[৬] "সনাতন হিন্দু ধর্ম ও তার চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করে যাবতীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ ছিল গীতিকার আখ্যানগুলি"। মধ্যযুগের গীতিকার পালা রচয়িতারা অর্থনীতিভিত্তিক সমাজ বিভাগকে প্রতিফলিত করেছিলেন গীতিকার মধ্যে। উন্নততর লিখিত সাহিত্যে শক্তিমানের আনুকূল্য ধন্য সাহিত্যিকেরা শ্রেণী শোষণকে আভাসে ইঙ্গিতে রূপক- প্রতীকের আশ্রয়ে ফুটিয়ে তুলতেন। কিন্তু গীতিকায় তা স্পষ্টোচ্চারিত।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

কালিদাসবাবু গীতিকাগুলোকে বাঙ্গালার লোকসাহিত্যের 'সর্বপ্রধান সম্পদ' বলে অভিহিত করে বলেছেন, রসের দিক হইতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলীর পরই এগুলির স্থান। কালিদাস রায়ের মন্তব্য,--- "কোন পারিপাট্য বা কলাশ্রীসম্মত আভরণ নাই বলিয়া এইগুলি যেন জেলের মেয়ে মৎস্যগন্ধা সত্যব্রতী। সত্যব্রতীর মতই এইগুলি রাজরাণী হইবার যোগ্য। মানবজীবনের চিরন্তর সত্যই এইগুলির রসশ্রী সম্পাদন করিয়াছে বলিয়াই এইগুলি সত্যব্রতী। দেবতাকে মানুষ বানাইয়া অথবা মানুষকে দেবতা বানাইয়া সভ্য বাঙ্গালা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সত্যকে পূর্ণরূপে আশ্রয় করে নাই। এই গীতগুলি মানুষকে মানুষ রাখিয়াই তাহার শক্তি-সামর্থ্য, তাহার আশা-আকাঙ্খা, তাহার সুখ-দু:খ, তাহার ভুল-ভ্রান্তি ও উত্থান-পতনের কথাকেই রূপদান করিয়াছে।"[৮]

পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যালাডের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংযত প্রকাশভঙ্গী। বাংলা গীতিকায় এই দৃঢ় সংহত রূপ তেমন সুলভ নয়। বাঙালি স্বভাবতই উচ্ছ্বাসপ্রবণ, তাই সীমিত পরিসরে বাংলা লোকগীতিকার কাহিনীকে উপস্থাপিত হতে দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক বর্ণনার ভারে তা ভারাক্রান্ত হয়। তবুও ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের গীতিকাতেও রচয়িতারা তাঁদের সংযম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষতঃ দীর্ঘ সময়ের অনাবশ্যক বিবরণকে তাঁরা কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। যেমন- ... ... "এক দুই তিন করি গুলো বছর যায়/ খেলা কছরত তারে যতনে শিখায়।" (মহুয়া)

আমরা দেখতে পাই--- পাশ্চাত্য গীতিকা ঘটনা-প্রধান, বাংলা গীতিকা বর্ণনা-প্রধান। এজন্য পাশ্চাত্য দেশে ছোট-বড় উভয় প্রকার গীতিকা আছে। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের দেশের গীতিকা দীর্ঘ হতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য গীতিকাগুলো অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ (Objective)। কিন্তু আমাদের গীতিকাগুলোতে মন্ময়তা (Subjectivity) অনেক বেশি। পাশ্চাত্য গীতিকায় অলৌকিক উপাদানের রাজকীয় আধিপত্য সে তুলনায় বাংলা গীতিকায় অলৌকিতার সন্ধান সীমিত পরিসরেই লভ্য। পাশ্চাত্য দেশে ধর্মীয় গীতিকা আছে যেমন- স্যার হিউজ, দি চেরী ট্রি ক্যারল, জুডাস ইত্যাদি। আমাদের তেমনি রয়েছে নাথগীতিকা। অপর পক্ষে brave wolf, the last fierce charge, paul jones -এর মত আমাদের দেশে রয়েছে রাজা রঘু, মুকুট রায়, তিলক বসন্ত, চৌধুরীর লড়াইয়ের মত ঐতিহাসিক গীতিকা। পাশ্চাত্য দেশের রবিন হুড, টম ডুলির মত আমাদেরও 'দস্যু কেনারামের পালা', 'মানিকতারা', 'কাফনচোরা' পালাগুলো বিদ্যমান।[৯] এ প্রসঙ্গে ড: মাযহারুল ইসলামের মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন:

> "ইংরেজী ব্যালাডগুলোর প্রকৃতি আর বাংলা গীতিকার প্রকৃতি ঠিক এক নয়। ইংরেজী বালাডে যেসব বৈশিষ্ট্য না হলে ব্যালাড পদবাচ্য হতে পারে না, বাংলা গীতিকায় হয়তো তা একেবারেই অনুপস্থিত; আবার বাংলা লোকগীতিকায় যে সমস্ত বিষয় প্রায় অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়, সেসব হয়তো ইংরেজী ব্যালাডে খুঁজতে যাওয়া বৃথা।"

বাংলা লোকগীতিকায় আমরা যেসব বিষয়বস্তুর রূপায়ণ লক্ষ্য করি তা হ'ল- নর-নারীর প্রেম, সামাজিক অনাচার, চৌর্যবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা, ইত্যাদি। এসবের মধ্যে প্রেমই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কৌমার্য প্রেম, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ প্রেম, দাম্পত্য প্রেম ইত্যাদি প্রেমের না বিভাজন আছে। বলা যায় যে, গীতোপযোগী প্রেম, বিরহ, মিলনকেন্দ্রিক কাহিনী লেখকের আত্মোপলব্ধিজাত হয়ে একই রূপ-ছন্দে বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ পরিসরে বর্ণিত হয়ে 'গীতিকা' নামে আখ্যায়িত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার শ্রেণী বিভাগ

গীতিকা কাহিনীনির্ভর রচনা হওয়ায় শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বিভক্তি করণের প্রয়োজন দেখা দেয়। পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ভাগ, উপবিভাগের মাধ্যমে গীতিকার শ্রেণী বিভাগ করেছেন। গীতিকার অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে প্রেম। তাই প্রেম জাতীয় গীতিকাগুলোকে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রণয় গাঁথাগুলোর মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম লৌকিক প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের পরিচয় লাভ করি। আবার অবিমিশ্র প্রেমকাহিনীই গীতিকাগুলোর একমাত্র উপজীব্য নয়। সমাজের অন্য অনেক বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে, এমন গীতিকাও আছে। বিষয়বস্তুর মতো আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা আছে।

সব দিক বিবেচনা করে বাংলা গীতিকাগুলোকে বিশেষ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. কিংবদন্তীমূলক গীতিকা ২. সামাজিক গীতিকা ৩. ঐতিহাসিক গীতিকা ৪. দস্যুচরিত্র ভিত্তিক গীতিকা ৫. বারমাসী গীতিকা এবং ৬. রূপকথা ধর্মী গাঁথা বা গীতিকা।

১. কিংবদন্তীমূলক গীতিকা

কিংবদন্তীমূলক গীতিকায় অলৌকিক কাহিনী ভিত্তিক ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়ের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস অতিক্রম করে legend অর্থাৎ কিংবদন্তীরূপে মানবিক আবেদনের ভিত্তিতে গীতিকায় রূপান্তরিত কাহিনী। নাথগীতিকা তার মধ্যে অন্যতম। নাথগীতিকা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারসহ অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিত গোরক্ষনাথ, মীননাথ প্রভৃতি যোগী সিদ্ধাগণের কাহিনী দ্বারা প্রথমাংশ রচিত হলেও শেষোক্ত বিভাগটিতেই মানবিক আবেদন অনেক বেশি পরিমানে পরিস্ফুট। এই অংশটি গোপীচন্দ্র ময়নামতির কাহিনী সমৃদ্ধ। ফলে নাথগীতিকা বাস্তব জীবনবোধজাত মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ লোকগীতিকাভূক্ত হয়েছে।

২. সামাজিক গীতিকা

বাংলা লোকগীতিকায় সামাজিক গীতিকা পর্যায়ে উপবিভাগীয় শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্যণীয়। যথা- ক). বিবাহপূর্ব প্রেমমূলক কাহিনী। যেমন- মহুয়া, মলুয়া, ভেলুয়া, দেওয়ান ভাবনা ইত্যাদি। খ). বিবাহোত্তর প্রেমমূলক কাহিনী। যেমন- দেওয়ানা মদিনা, শ্যামরায়ের পালা। গ). রূপকথাশ্রিত অলৌকিক প্রেমমূলক কাহিনী। যেমন- কঙ্ক ও লীলা। ঘ). ধর্মভিত্তিক প্রেমমূলক কাহিনী যেমন- চন্দ্রাবতী।

প্রেমের ধর্ম অনুসারে নর-নারীর আকর্ষণ সহজাত এবং স্বাভাবিক। অথব নারীর ভাগ্যেই জোটে যত বিড়ম্বনা। নারী জীবনের এই ট্রাজিক পরিণতির স্বীকার হয়ে মহুয়া, মলুয়া, ভেলুয়া, সোনাই প্রভৃতি চরিত্র সামাজিক গীতিকার আবেদনকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

৩. ঐতিহাসিক গীতিকা

ঐতিহাসিক গাঁথা বা গীতিকা সম্পর্কে বলা চলে ঐতিহাসিকতা প্রক্ষেপে কাহিনীর গুরুত্ব বা প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। আবার বহুল প্রচারের ফলে লোকমুখে গীত হতে হতে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাও স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক গীতিকা হিসেবে মহারাষ্ট্র পুরাণ এবং মহিপালের গীত বা গানকে ধরা যায় (ড. দীনেসচন্দ্র সেন সংগৃহীত পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা চতুর্থ খণ্ড)। ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এটি ঐতিহাসিক গীতিকার মর্যাদা লাভ করেছে। কমলা রাণীর পালা, ঈশা খাঁ মসনদালী, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, চৌধুরীর লড়াই, সুজাতনয়ার বিলাপ, শীলাদেবী প্রভৃতি বাংলার তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় কাহিনী নির্ভর ঘটনা। ঐতিহাসিক গাঁথা বা গীতিকায় ঘটনার প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক সূত্র এসেছে প্রক্ষিপ্তভাবে। এগুলোতে মূলতঃ কাহিনী গ্রন্থনাই প্রধান। কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক সূত্রের মিল-অমিল যতটুকু থাকুক না কেন রচয়িতার রচনার গুণে ইতিহাস গৌণ হয়ে কাহিনী মুখ্য হয়ে উঠেছে। একইভাবে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, ঈশা খাঁ মসনদালী, চৌধুরীর লড়াই প্রভৃতির মধ্যে ঐতিহাসিক সূত্র বা তথ্যের চেয়ে রচয়িতার রচনার গুণে ইতিহাস অতিক্রান্ত হয়ে গীতিকাগুলো জীবনমুখী হয়ে উঠেছে।

৪. দস্যুচরিত্র ভিত্তিক গীতিকা

বাংলা লোকগীতিকায় কিছু দস্যুচরিত্র ভিত্তিক গীতিকা রয়েছে। যেমন-দস্যুকেনারাম, নেজাম ডাকাইত, মাণিকতারা ডাকাইত প্রভৃতি। যেগুলো মানুষের সার্বজনীন ধর্মীয় অনুশাসন বা মাহাত্ম্য কথার চেয়ে ভিন্নতর উপায়ে সুপ্ত মানবিক গুণাবলীর স্বরূপ প্রকাশে সাহায্য করেছে। মঙ্গল কাব্যের যে ধরণের ধর্মীয় নীতিবোধাজাত সংস্কার মানুষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে সে ধরণের অলৌকিক অপ্রাকৃত ঘটনা সম্বলিত কাহিনী বিস্তার এ শ্রেণীর গীতিকায় নেই, বরং সম্পূর্ণ মানবিক বৃত্তিমূলক বাস্তব জীবনচিত্রের আলেখ্য বা কাহিনী নিয়ে পালাগুলো রচিত। যার ফলে দস্যুচরিত্র সম্বলিত কাহিনীর গভীরে ধর্মীয় সংস্কার, মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক অবক্ষয় থেকে আত্মার মুক্তির সরল সহজ স্বাভাবিক পথনির্দেশ উক্ত পালাগুলোতে বিধৃত। সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আমরা দেখতে পাই, মনসাদেবীর বরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মলাভ করেও দৈব দূর্ঘনায় অতি শৈশবে ডাকাত দ্বারা অপহৃত হওয়ার কারণে কেনারাম ডাকাতি করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে ঠিকই, পরবর্তীতে দ্বিজবংশীদাসের 'মনসার ভাসান' শোনার পর তার চেতনার গভীরে আমুল পরিবর্তন আসে। দ্বিজবংশীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে নরঘাতক দস্যু থেকে পরম ধার্মীক ব্যক্তিতে পরিগণিত হয়। কেনারামের এই রূপান্তর মানব চরিত্রের এক বিশেষ দিক, যা জন্মগত সংস্কার চেতনা ও নীতিবোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব ময়মনসিংহের 'দস্যুকেনারামের পালা'র সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের 'নিজামডাকাইতের পালা'র অদ্ভূত সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় ডাকাত দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে পরম ধর্মীক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

৫. বারমাসী গীতিকা

গাঁথা কাব্যের পঞ্চম ধারা বারমাসী গীতিকা। বাংলা লোকগীতিকায় বারমাসী গীতিকাগুলোই সর্বাপেক্ষা কাব্যসৌন্দর্য মণ্ডিত। প্রাচীনকালে বৎসরের অন্তর্গত বারমাস অথবা ছয় ঋতু বর্ণনার মাধ্যমে বিরহ, মিলন, বাৎসল্য ইত্যাদি রসাশ্রিত ছোট ছোট কাহিনীমূলক গীত রচিত হত। এসব গীতে কাহিনী অপেক্ষা প্রকৃতি বা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ভাব বর্ণনার প্রাবলই লক্ষ্যিত হত। এই কাহিনীর মাধ্যমেই কখনও বিরহিনী নায়িকার অন্তর্দাহ, কখনও প্রণয়ীর মিলনান্তে মধুর রসের সমাবেশ এবং কখনও বা পুত্রশোকাতুর নারীর হৃদয়াবেগ বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা বাংলা লোকগীতিকায় বারমাসীর বৈচিত্র্য হচ্ছে অন্তর্জীবনের দুঃখ-বেদনার চিত্রকে চিত্রিত করা। মানসিক কারণ সজাত দুঃখকে গীতিকার নারীরা জয় করেছে বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসের দ্বারা। 'বগুলার বারমাসী' তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও আছে 'মলয়ার বারমাসী' 'শান্তি ও নীলার বারমাসী' শীর্ষক রচনাগুলো।

৬. রূপকথাধর্মী গাঁথা বা গীতিকা

'রূপকথাধর্মী গাঁথা' বা গীতিকায় রূপকথার উপাদান মিশ্রিত আঙ্গিকে সমাজ জীবনের চিত্রই ফুটে উঠেছে। যেমন- রূপবতীর মধ্যে দিল্লির বাদশাহ এবং জায়গীরদারের বর্ণনা, সেই সঙ্গে নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

অসহায়ত্বের সুযোগে নারী নির্যাতন তন্ত্র-মন্ত্রের অলৌকিক মহিমার প্রকাশ প্রভৃতি। 'কাজলরেখা'র মধ্যেও একই উপায়ে নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ দেখা যায়। যেমন- দাসীর রাণী হওয়া, রাণীর দাসীতে পরিবর্তন। অন্যদিকে রূপবতীকে বাড়ীর কর্মচারী মদনের হাতে গোপনে বিয়ে দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা প্রভৃতির জন্য কোন অলৌকিক ঘটনা দায়ী নয়। বরং মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে পরিচালিত করে ট্রাজেডির সূচনা ঘটায়। নারী নিরুপায় বলে তাকেই সেই ট্রাজেডির স্বীকার হতে হয়। জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে মানুষের কাছে মানুষের আবেদন গীতিকাগুলোকে প্রাণবন্ত করেছে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলা গীতিকাগুলোকে দু'টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। ১. মৈমনসিংহ পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ২.দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা। তাঁর মতে বৃহত্তর মৈমনসিংহ হলো পূর্ববঙ্গ গীতিকার অঞ্চল। 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'চৌধুরীর লড়াই', ভেলুয়া', 'কাফনচোর', 'আয়না বিবি', 'কমল সদাগর', 'নুরুন্নেসা ও কবরের কথা' দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের বাণিজ্যিক পেশা, দুঃসাহসিকতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি এসব গাথায় প্রকাশিত হয়েছে। সে তুলনায় পূর্ববঙ্গ গীতিকার ভাব ও বিষয় অধিকতর মানবিক গুণসম্পন্ন ও মাধুর্যমণ্ডিত। বাংলার এ যাবৎ সংগৃহীত সামাজিক, ঐতিহাসিক, অলৌকিক লোকগাঁথাকে প্রেমমূলক, ধর্মীয়, বীরত্বসূচক, দস্যুতামূলক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সামাজিক ও রূপকথাশ্রিত গাঁথাগুলো অধিকাংশই প্রেমমূলক। ঐতিহাসিক গাঁথাগুলো বীরত্বব্যঞ্জক। তিন-চারটি গাঁথায় দস্যুবৃত্তির নিষ্ঠুরতার কথা আছে। পুরাণ ইতিহাসমিশ্রিত নাথগীতিকা ধর্মাশ্রিত।

ড: বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা গাঁথা কাব্যে' (১৯৬২) গাঁথা কাব্যকে সর্বমোট পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। তা হ'ল ১. প্রণয় গাঁথা ২. ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত গাঁথা ৩. ধর্মাশ্রিত গাঁথা, ৪. নীতিকথাশ্রিত গাঁথা এবং ৫.বারমাসী গাঁথা। প্রণয়গাঁথা পর্যায়ে তিনি ফকিররাম কবিভূষণের 'সখী সোনা', খলিল রচিত 'চন্দ্রমুখীর পুঁথি, দ্বিজ পশুপতির 'চন্দ্রাবলী বিশ্বকেতু'. সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' ইত্যাদি আখ্যানগুলোর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করেছেন মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত বত্রিশটি গীতিকাকে। ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াবলম্বনে বারটি গীতিকা রচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধর্মাশ্রিত গাঁথা পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করেছেন নাথগীতিকাগুলোকে। আর বারমাসী গাঁথা পর্যায়ে---- মলয়ার বারমাসী, 'বগুলার বারমাসী' ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের লোকবিজ্ঞানী বিষয় অনুসারে গীতিকাগুলোকে নিম্নরূপ ১২টি ভাগে বিভক্ত করেন:

ক. অলৌকিক কাহিনী কেন্দ্রিক গীতিকা (Ballad of the Supernatural)

খ. ধর্মীয় গীতিকা (Religious Ballads)

গ. রোমান্টিক বিয়োগান্ত গীতিকা (Romantic Tragedies)

ঘ. প্রেমকেন্দ্রিক (Love and Sentiments)

ঙ. রাখালী গীতিকা (Pastorals)

চ. গৃহ বিবাদ সম্পর্কিত (Domestic Tragedies)

ছ. ঐতিহাসিক গীতিকা (Historical Ballads)

জ. অর্ধ-ঐতিহাসিক গীতিকা (Semi Historical Ballads)

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. অপমৃত্যু ও বিপদ বিষয়ক (Accident and Disasters)

ঞ. দস্যু (Out, Laws, Piracs)

ট. আঞ্চলিক গীতিকা (Regional Ballads)

ঠ. লোক-নায়ক (Folk-hero)

ড. ধাঁধা কেন্দ্রিক গীতিকা (Riddle Ballads)

ঢ. হাসির কাহিনী (Humorous)

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী প্রেমকেন্দ্রিক গীতিকাগুলোর মধ্যেও কয়েকটি শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী। যেমন- খাঁটি প্রেম কাহিনীমূলক, ধর্মভিত্তিক প্রেম, রূপক-প্রণয়-গীতিকা, বিবাহোত্তর প্রেম। মহুয়া, মলুয়া, কমলা, সুরৎ জামাল, অধুয়া সুন্দরী, ভেলুয়া, মইষালবন্ধু, শ্যামরায়, কমল সওদাগর, পীরবাতাসী, সন্নমালা,আয়ানবিবি, রূপবতী, দেওয়ানভাবনা, মাগুর মা, নুরন্নেছা--এগুলো ড. আশরাফ সিদ্দিকী কথিত খাঁটি প্রেমমূলক কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত।

ধর্মভিত্তিক প্রেমমূলক গীতিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'চন্দ্রাবতী', 'কঙ্ক ও লীলা', 'ধোপার পাট', পালাগুলো রূপক-প্রণয়-গীতিকা পর্যায়ের। 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি বিবাহোত্তর প্রেম নিয়ে রচিত একটি আদর্শ গীতিকা। ঐতিহাসিক গীতিকার পর্যায়ে পড়ে 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', 'ঈশা খাঁ মসনদে আলী', 'সোনাবিবি', 'রাজা রঘু', 'বীর নারায়ণ', 'মুকুট রায়', 'তিলক বসন্ত', 'চৌধুরীর লড়াই', 'সুজা-তনয়ার বিলাপ' ইত্যাদি পালাগুলো। দস্যুতা বিষয়ক গীতিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দস্যু কেনারামের পালা', 'কাফেন চোরা', 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'মানিকতারা ডাকাতের পালা'। রূপকথার পর্যায়ভুক্ত হ'ল 'কাজলরেখা', 'রূপবতী', 'কাঞ্চনমালা'। বারমাসীর পর্যায়ভুক্ত 'মলয়ার বারমাসী', 'বগুলার বারমাসী', 'শান্তি ও নীলার বারমাসী' শীর্ষক রচনাগুলো।

অসিতকুমার বন্দোপাদ্যায় মনে করেন- এই পালাগুলোতে বিষয়বস্তুগত তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। লৌলিক প্রণয়গাথা, ঐতিহাসিক রোমান্টিক আখ্যান এবং বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আখ্যান। এছাড়াও বিষয় নিয়ে দু'একটি পালা রচিত হয়েছে। যেমন ঃ 'হাতিখেদা'।

লৌকিক প্রেম এবং তার বাধাবিপত্তি ও পরিনাম নিয়েই অধিকাংশ পালা রচিত হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ পালাগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার পাট, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি পালাগুলোতে নারীর অত্যাজ্য প্রেম, প্রেমের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার এবং প্রেমের স্বর্গীয় প্রবাহে জাতি সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা লোপের ছবি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

এ যাবৎ বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোকগীতিকাগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ নাথগীতিকা, দ্বিতীয়তঃ মৈমনসিংহ গীতিকা, তৃতীয়তঃ পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে যেসব গীতিকা সংগৃহীত হয়েছে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩) ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে (চার খণ্ডে) প্রকাশিত হয়। এগুলোতে সর্বমোট ৫৪টি গীতিকা আছে। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে মোমেনশাহী গীতিকা (১৯৭১), সিলেট গীতিকা ও রংপুর গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দেব 'বাংলার লোকগীতিকথা' (১৯৮৬) প্রকাশ করেছেন। এখানে ৯টি গীতিকা আছে। এগুলোর অধিকাংশই ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত। পুনরাবৃত্তি ও পাঠান্তর বাদ দিয়েও আমাদের গীতিকার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় শ'খানেক ।

Dhaka University Institutional Repository

নাথগীতিকা

বাংলাদেশে প্রাচীনতম গীতিকা হ'ল নাথগীতিকা। নাথগীতিকার দুটি শাখা- গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান। উভয় আখ্যানের লিখিত ও মৌখিক ধারা পাওয়া গেছে। নাথ ধর্মের মাহাত্ম্য ও নাথ গুরুর গৌরব প্রচার উভয় শাখার অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্য। গোরক্ষবিজয় আখ্যানে সাধক সিদ্ধ গোরক্ষনাথ বিপদগামী গুরু মিননাথকে উদ্ধার করেন। গোপীচন্দ্রের গানের বিষয়বস্তু হ'ল গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ। রাজ গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র মায়ের নির্দেশে তরুণ যৌবনে দুই নবপরিণীতা বধু প্রাসাদে রেখে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং দীর্ঘ বার বছর কঠোর সাধনা করে সিদ্ধি অর্জন করেন। একাধিক নামে এ আখ্যান প্রচলিত- 'মানিক রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি। ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি মানবিক আবেদন সৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের গান অধিক সফল রচনা। ফলে নাথসাহিত্য বাস্তব জীবনবোধজাত মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ লোকগীতিকাভুক্ত হয়েছে। নাথগীতিকাগুলির মধ্য থেকে ধর্ম নিরপেক্ষভাবে সংযম ও বৈরাগ্য সাধনার বাণী প্রচারিত হয়েছে। গ্রাম্য কবিদের গৃহস্থালী চিত্র বর্ণনায় শিব-দূর্গা লৌলিক আকারপ্রাপ্ত হয়েছে। এসব গাথায় শিব দূর্গা পুরাণের অন্তর্গত দেবদেবী নন, তাঁরা সাধারণ মানুষ, গ্রাম্য সমাজের গৃহদম্পতি।

মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

দীনেসচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৫৪টি লোকগীতিকার খণ্ডভিত্তিক নাম নিম্নরূপঃ প্রথম খণ্ডে দশটি গীতিকা স্থান লাভ করে। এগুলো হল- 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী, কমলা', 'দেওয়ানভাবনা', 'দস্যু কেনারামের পালা', 'রূপবতী', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কাজল রেখা' এবং 'দেওয়ানা মদিনা'।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার দ্বিতীয় খন্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট চৌদ্দটি গীতিকা বিধৃত হয়েছে। 'ধোপার পাট', 'মইষাল বন্ধু', 'কাঞ্চন মালা', 'শান্তি', 'নীলা', 'ভেলুয়া', 'কমলারাণীর গান', 'মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা', 'মদনকুমার ও মধুমালা', 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া', 'নেজাম ডাকাইতের পালা', 'দেওয়ান খাঁ মসনদ আলী', 'সুরৎজামাল ও অধুয়া' এবং 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান'।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খন্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় এগারটি পালা স্থান পেয়েছে। এগুলো হল- 'মাগুর মা', 'কাফেন চোরা', 'ভেলুয়া', 'হাতীখেদা', 'আয়নাবিবি', 'কমল- সওদাগর', 'শ্যামরায়', 'চৌধুরীর লড়াই', 'গোপিনী কীর্তন', 'সুজাতনয়ার বিলাপ' ও 'বারতীর্থের গান'।

পূর্ববঙ্গ, গীতিকার চতুর্থ খন্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট উনিশটি পালা আছে- 'নছর মালুম', 'শীলা দেবী', 'রাজা রঘুর পালা', 'নুরন্নেহা ও কবরের কথা', 'মুকুট রায়', 'ভারাইয়া রাজার কাহিনী', 'আন্ধাবন্ধু', 'বগুলার বারমাসী', 'চন্দ্রাবতীর রামায়ন', 'সন্নমালা', 'বীরনারায়নের পালা', 'রতনঠাকুরের পালা', 'পীরবাতাসী', 'রাজা তিলক বসন্ত', 'মালয়ার বারমাসী', 'জিরালনী', 'পরীবানুর হাঁহলা', 'সোনা রায়ের জন্ম এবং 'সোনাবিবির পালা'।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে এ গীতিকাগুলোর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কাহিনী বর্ণনার গতানুগতিক রীতি অনুসরণেই এগুলো রচিত হয়েছে। তবে এই পালাগানগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি গীতিকা রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, গোপিনী কীর্তন, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ইত্যাদি। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন ... কাজলরেখার পালা পুরাপুরি রূপকথা জাতীয় ... হাতীখেদার পালা বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও এই পালাগানের সঙ্গে এর যোগাযোগ

Dhaka University Institutional Repository

অতি অল্প। বারতীর্থের গানও পালাগানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কোন কোন সমালোচক 'দস্যুকেনারামের পালা'কেও গীতিকা বলে স্বীকার করেননি। কাজলরেখা গদ্যে পদ্যে রচিত রূপকথা জাতীয় রচনা হলেও গীতিকার সমধর্মী রচনা বলেই মনে করা হয়। দস্যুকেনারামের পালা ও নেজাম ডাকাতের পালাকে সমশ্রেণীভুক্ত রচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক চেতনা, আভিজাত্যের অহংবোধ, হিন্দু-মুসলমান শ্রেণীকরণের সামাজিক বিভেদ বৈষম্য, সমাজবদ্ধ মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে অবৈধ বিধ্বংসু ঘটনার পরিণাম গাথাকারে রচিত হয়েছে। পেশাভিত্তিক বর্ণভেদ, কৌলিন্যের দর্প, আভিজাত্য লোকসমাজ ও লোকজীবনকে কিভাবে অবমুল্যায়িত করে চলেছে তারই সংবেদনশীল বর্ণনাধর্মী পালা মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলো।

মৈময়নসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অধিকাংশ পালা সামাজিক প্রভাবদুষ্ট। ধারণা করা হয় পূর্ব মৈমনসিংহের লোকসমাজে সংস্কৃতি বিমিশ্রতা এবং আঞ্চলিক পার্বত্য জাতির মাতাপ্রধান সমাজের জীবনব্যবস্থা নিখিল বাঙালীর সার্বজনীন ঐতিহ্য সম্পদ-- রূপে গীতিকাগুলোর প্রাণকেন্দ্রে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলে প্রতিটি পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র একদিকে যেমন নারী প্রধান ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল্যে ভাস্বর অন্যদিকে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জনিত কারণে নিয়তির করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে নারী-- মহুয়া, মলুয়া, মদিনা এমনি প্রায় সকল পালার নায়িকারা যেন তাদেরই সহযাত্রী। যুগে যুগে নারীরাই হয়েছে ঘরে-বাইরে পুরুষের কাছে ধর্ষিতা, নির্যাতিতা, নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা। মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারী স্বাভাবিক উপায়ে সংসার কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও মানবিক মৌল বৃত্তি-প্রবৃত্তি, শিক্ষার-সভ্যতার, সংস্কৃতির প্রভাবে নির্মূল হয় না, সুপ্তভাবে কিংবা গুপ্তভাবে থেকেই যায়, কখনো লুপ্ত হয় না। দেখা যায়, প্রলোভন প্রবল হলে, সংকট আসন্ন হলে, প্রাণ বিপন্ন হলে মানুষের সহজাত রিপু-- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি প্রকট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মলুয়া, ভেলুয়া, সোনাই প্রভৃতি চরিত্রের করুণ পরিণতি এইসব কুপ্রবৃত্তিগত লালসার শিকারে পরিণতি হয়। সমাজ-সৃষ্ট অনুশাসনের এসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি জীবনে সাংঘাতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন ও সংসার ধ্বংস করে দেয়।

আমরা দেখতে পাই প্রতিটি পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র একদিকে যেমন নারীপ্রধান ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল্যে ভাস্বর অন্যদিকে সমাজশক্তির বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের জীবনাদর্শ এবং নৈতিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিবাদী হয়েছে। আলোচ্য গীতিকাগুলোতে মানুষের ব্যক্তিগত কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মানবীয় প্রেমের একনিষ্ঠতার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরাই সংগ্রাম করেছে। পরিণামে সমাজ নারীদেরই করেছে ধিকৃত, কলঙ্কিত। পরিণতিতে আত্মহত্যা বা আত্মহননের মাধ্যমে তাদের নিস্কৃতি লাভ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহুয়া

'মহুয়া' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়-- বেদে দলের সর্দার হুমরা ছিল নিঃসন্তান। একবার সে তার দলবল নিয়ে ধনু নদীর তীরে কাঞ্চনপুর গ্রামে খেলা দেখাতে এসে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শিশু কন্যা চুরি করে পালিয়ে যায়। হুমরা তাকে লালন পালন করে। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী হওয়ায় তার নাম রাখে 'মহুয়া'। হুমরা তাকে নাচ-গান শেখায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সে খেলা দেখাতে শুরু করে এবং বাজিখেলায় ক্রমে পারদর্শী হয়ে ওঠে। মহুয়ার সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হয়। বেদে দলের উপার্জনের পথ বিস্তৃত হয়। একবার হুমরা তার দলবল নিয়ে বামনকান্দা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। তরুণ ব্রাহ্মনপুত্র নদের চাঁদ সে গ্রামের তালুকদার। নদের চাঁদ মহুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়। মহুয়াও নদের চাঁদকে দেখে আকৃষ্ট হয়। নদের চাঁদ বেদের দলকে সে গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিল। এক পর্যায়ে নদের চাঁদ ও মহুয়া পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদন করে। হুমরা তা জানতে পেরে .... মহুয়াকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। নদের চাঁদ মহুয়ার খোঁজে গৃহ ত্যাগ করে এবং বহু অনুসন্ধানের পর তার সাক্ষাৎ পায়। হুমরা তাকে দেখে পেয়ে মহুয়াকে তার প্রাণবধ করতে বলে। কিন্তু তার পরিবর্তে মহুয়া নদের চাঁদকে নিয়ে বেদের দল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পথিমধ্যে এক সওদাগর নদের চাঁদের প্রাণবধ করার চেষ্টা করে মহুয়াকে লাভ করতে চায়। মহুয়া কৌশলে সওদাগরেরই প্রাণনাশ করে পালিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর মহুয়া মৃতপ্রায় নদের চাঁদের সন্ধান পায়; মহুয়া পুনরায় এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর কবলে পড়ে। কোনমতে রুগ্ন নদের চাঁদকে কাঁধে নিয়ে সন্ন্যাসীর আশ্রয় হতে মহুয়া পালিয়ে যায়। কিছু দূর গিয়ে তারা একস্থানে সুখে বসবাস করতে থাকে। এমন সময় তাদের অনুসন্ধানে বেদের দল সেখানে হাজির হয়। হুমরা নদের চাঁদকে বধ করার জন্য মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দিলে মহুয়া সেই ছুরি নিজের বক্ষে বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে। সেই মুহূর্তে বেদের দল নদের চাঁদের প্রাণনাশ করল। হুমরা দল ভেঙ্গে দিয়ে বনের পথে চলে যায়। কেবল পালং সই উভয়ের কবরের পাশে থেকে বিলাপ করতে থাকে। মহুয়ার করুন কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি ঘটে। এতে মোট নারী চরিত্র চারটি-, মহুয়া, পালং সই, নদের চাঁদের মা এবং হুমরার বন্ধ্যা স্ত্রী।

মলুয়া

চন্দ্রাবতী রচিত 'মলুয়া' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- কাহিনীর নায়ক চাঁদ-বিনোদ বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান। অকাল বন্যায় একবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মাতা-পুত্র অতিকষ্টে দিন কাটাতে থাকে। অবশেষে একদিন চাঁদ-বিনোদ কোড়া শিকার করতে যায়। বিনোদ আড়ালিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হলে সে গ্রামের মোড়লের কন্যা মলুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়। মলুয়াও বিনোদকে দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু দারিদ্রের জন্য মলুয়ার পিতা বিনোদের কাছে কন্যাদান করতে অস্বীকার করেন। বিনোদ গৃহে ফিরে অর্থোপার্জনের উপায় সন্ধান করতে লাগল। অবশেষে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরল। এবার আর মলুয়ার পিতা তার নিকট কন্যা সম্পূর্ণ করতে আপত্তি করলেন না। বিনোদ মলুয়াকে বিয়ে করে নিজ গৃহে তুলল। একদিন কাজি মলুয়াকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হল; এক কুটনী নারী তার নিকট পাঠিয়ে তার পাপ অভিলাষ ব্যক্ত করল। মলুয়া কুটনীকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিল। মিথ্যা দেনার দায়ে কাজি এবার বিনোদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে নিল, ফলে বিনোদের সংসারে পুনরায় দারিদ্র্য দেখা দিল। শাশুড়ীকে নিয়ে সূতা কেটে ও পরের বাড়ীতে ধান ভেনে মলুয়ার দিন কাটতে লাগল। কাজি এবার এক নতুন বিপদের সৃষ্টি করল-- বিনোদের উপর এক

Dhaka University Institutional Repository

পরওয়ানা জারি করে নির্দেশ দিল- সাতদিনের মধ্যে বিনোদ তার স্ত্রীকে দেওয়ান সাহেবের হাউলিতে নিয়ে উপস্থিত না হলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হবে। বিনোদ আদেশ অমান্য করল। কাজির পাইক পেয়াদা বিনোদকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং মলুয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেওয়ানের অন্তঃপুরে হাজির করল। মলুয়ার পাঁচ ভাই বিনোদকে উদ্ধার করল বটে কিন্তু মলুয়াকে উদ্ধার করতে পারল না। কৌশলে নিজের নারীধর্ম রক্ষা করে মলুয়া তিন মাস পর দেওয়ানের হাত থেকে নিস্কৃতি পেল। কিন্তু বিনোদের আত্মীয় স্বজন মলুয়াকে গৃহে নিতে অস্বীকার করল। বিনোদ আত্মীয় স্বজনের কথায় মলুয়াকে পরিত্যাগ করে পুনরায় বিয়ে করল। মলুয়া স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করল না, সেখানেই দাসীবৃত্তি করতে লাগল। একদিন বিনোদকে সর্প দংশন করলে বাঁচার কোন আশা থাকে না। মলুয়া তার পাঁচ ভাইর সহায়তায় তাকে বাঁচাল। তবুও আত্মীয় স্বজন তাকে গৃহে নিতে নিষেধ করল। বেঁচে থাকলে স্বামীর কলঙ্ক ঘুচবে না মনে করে মলুয়া নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করল। মলুয়ার কাহিনীও বিয়োগান্তক। এতে নারী চরিত্র আছে চারটি- মলুয়া, বিনোদের মা, কুট্টিনী ও সতীন।

চন্দ্রাবতী

'চন্দ্রাবতী' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- চন্দ্রাবতী পিতার শিবপূজার জন্য প্রতিদিন ফুল তুলতে নির্জ্জন পুকুরের ধারে যায়, একদিন জয়ানন্দের সঙ্গে তার সেখানেই দেখা হল। ক্রমে তাদের ঘনিষ্টতা বাড়তে থাকে। উভয়ের মধ্যে মিলনে কোন বাঁধা ছিল না। বিবাহের প্রস্তাবও হ'ল। চন্দ্রাবতীর পিতা প্রস্তাব গ্রহণ করে বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেললেন। এমন সময় শুনা যায় জয়ানন্দ এক মুসলিম কন্যার প্রতি আসক্ত। তখন বিবাহে বাধা পড়ে যায়। চন্দ্রাবতী প্রেমে প্রতারিত হয়ে আশ্রয় নেয় এবং শিবপূজায় বাকি জীবনযাপন করার সংকল্প করে। পিতা তার উপর রামায়ণ রচনার আদেশ দেন। এদিকে জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত চিত্তে একদিন চন্দ্রাবতীর নিকট শেষ দর্শন প্রার্থনা করে, কিন্তু রুদ্ধ দেবালয়ের মধ্যে চন্দ্রাবতী তার হৃদয়কে পাষাণ করে ফেলে। জয়ানন্দের প্রার্থনা ব্যর্থ হয়। সে মালতীর ফুল দিয়ে তার শেষ কথা রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে লিখে রেখে গেল। সেদিনই চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে গিয়ে দেখতে পায় জয়ানন্দের প্রাণহীন দেহ জলে ভেসে আছে। চন্দ্রাবতীর কাহিনী বিয়োগান্তক। এতে নারী চরিত্র তিনটি- চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবতীর মা ও মুসলমানি কন্যা।

কমলা

মানিক চাকলাদারের কন্যা 'কমলা সুন্দরী'। মানিক চাকলাদারের এক কারকুন (হিসাব রক্ষক কর্মচারী) তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে প্রথমে সে চিকন গোয়ালিনীর সাহায্যে কমলাকে বশীভূত করার চেষ্টা করে। চিকন গোয়ালিনী মন্ত্রগুণী-কুটনী চরিত্র। কমলা তাকে প্রহার করে বিদায় দেয়। এতে কারকুনের ক্রোধ বেড়ে যায় এবং সে রাজার নিকট চাকলাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে। কারকুন প্রভাব খাটিয়ে কমলার পিতার সম্পত্তি হরণ এবং পুত্রসহ তাকে বন্দী করে। বিপন্ন কমলা বাস্তুচ্যুত হয়ে প্রথমে মাতুলালয়ে ও পরে মইষালের গৃহে আশ্রয় লাভ করে। এখানেই জমিদার পুত্র প্রদীপ কুমারের সাথে কমলার পরিচয় হয়; প্রদীপ কুমার প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়ের পূর্বে কৌশলে কমলা কারকুন, চিকন গোয়ালিনী ও মাতুলকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় এবং শাস্তির বিধান দেয়। জমিদার গৃহে বন্দী পিতা ও ভ্রাতাকে মুক্ত করে। অতঃপর রাজপুত্রের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়। কমলার কাহিনী মিলনাত্মক। এখানে নারী চরিত্র দুটি- কমলা, চিকন গোয়ালিনী।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান ভাবনা

চন্দ্রবতী রচিত 'দেওয়ান ভাবনা' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- দশ বছর বয়সে পিতৃহীন সুনাই জননীকে সঙ্গে নিয়ে দরিদ্র মাতুলের গলগ্রহ হয়। মাতুল নিঃসন্তান, সেজন্য ভগিনী ও ভাগ্নেয়কে অনাদর করল না। যথাসাধ্য ভরণ-পোষণ করতে লাগল। সুনাইর বিয়ের বয়স উপস্থিত হল। তাই পাত্র অনুসন্ধান করতে লাগল। এদিকে সুনাই মাধব নামে এক যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়। মাধবও তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেওয়ান ভাবনার নিকট সুনাইর রূপ-যৌবনের সংবাদ পৌঁছে যায়। দেওয়ান ভাবনা দরিদ্র মাতুলকে অর্থ ও জমির প্রলোভন দেখিয়ে সুনাইকে তার নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে। মাতুল এতে আশ্বস্ত হয়। সুনাই মাধবের নিকট তাকে ভাবনার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য সংবাদ পাঠালে পরদিন যখন সুনাই জল আনতে যায়, তখন দেওয়ানের লোক তাকে জলের ঘাট থেকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু দেওয়ানের নিকট তাকে নিয়ে পৌঁছার পূর্বেই মাধব তাকে উদ্ধার করে নিজের ঘরে নিয়ে বিয়ে করে। দেওয়ান ভাবনা মাধবের পিতাকে বন্দী করে। পিতার উদ্ধারের বিনিময়ে মাধব নিজে ভাবনার কারাগারে প্রবেশ করে। ভাবনা মাধবের পিতাকে জানায়- সুনাইকে পেলে সে মাধবকে ছেড়ে দিবে। মাধবের পিতা গৃহে ফিরে সুনাইকে একথা জানায়। সুনাই প্রিয়তমকে উদ্ধারের জন্য ভাবনার নিকট যেতে প্রতিশ্রুত হ'ল। তারপর সঙ্গে বিষবড়ি নিয়ে যাত্রা করল। মাধব কিছুই জানতে পারল না। সুনাই পৌঁছামাত্র মাধব কারামুক্ত হ'ল। কিন্তু ভাবনা সুনাইর কাছে এসে দেখতে পায় তার প্রাণহীন দেহ পালঙ্কের উপর পড়ে আছে। 'দেওয়ান ভাবনা' করুণ রসের গীতিকা। এতে নারী চরিত্র- সুনাই।

কঙ্ক ও লীলা

'কঙ্ক ও লীলা' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- ছয় মাস বয়সে শিশু কঙ্ক পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়ে। সংসারে দেখার কেউ নেই। অবশেষে এক নিঃসন্তান চণ্ডাল দম্পতি ব্রাহ্মণ শিশুটিকে লালন-পালন করতে থাকে। তার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন চণ্ডাল দম্পতিও পরলোক গমন করে। কঙ্ক দ্বিতীয়বার নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। এবার গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে তার আশ্রয় জুটে। গর্গের লীলা নামে এক কন্যা ছিল; আট বছর বয়সে লীলা মাতৃহারা হয়। গর্গ কঙ্ক ও লীলা উভয়েরই মাতা-পিতার স্থান পূর্ণ করলেন। লীলা যৌবনে পদার্পণ করলে কঙ্কের প্রতি তার অনুরাগ সে আর গোপন রাখতে পারেনি। ইতিমধ্যে গ্রামে এক পীরের অবির্ভাব হয়, কঙ্ক তার নিকট যাতায়াত করে অবশেষে গোপনে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তার আদেশে কঙ্ক 'সত্য পীরের পাঁচালী' রচনা করে। এদিকে কঙ্কের কবিখ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চণ্ডালের গৃহে পালিত হওয়ার কারণে কঙ্ককে বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে গর্গ সমাজে তুলে নিলেন। এতে ব্রাহ্মণ সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কঙ্কের নামে নানা কুৎসা রটনা করতে থাকে। এ সূত্রেই গর্গ জানতে পারে যে, কঙ্ক মুসলমান পীরের নিকট দীক্ষা নিয়েছে এবং লীলার প্রতি সুগভীর প্রণয়াসক্ত হয়েছে। শুনতে পেয়ে গর্গ ক্রোধান্ধ হয়ে উভয়ের প্রাণ বধ করার সংকল্প করলেন। একদিন কঙ্কের খাবারে তিনি বিষ মিশিয়ে রাখলেন। লীলা তা দেখতে পেয়ে কঙ্ককে তার পিতার আশ্রয় থেকে পালিয়ে যেতে বলে। কঙ্ক লীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। দিন যেতে থাকে, কঙ্কের বিরহ লীলার ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠতে লাগল। গর্গ নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। কঙ্ককে খুঁজে আনতে দু'জন শিষ্য পাঠালেন। ছয়মাস অনুসন্ধান শেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে তারা গৃহে ফিরে আসে। দুঃখে বেদনায় লীলা শয্যাগ্রহণ করে, অবশেষে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। কঙ্ক যখন ফিরে আসে, তখন শ্মশানে লীলার দেহ ভস্মীভূত হচ্ছিল। গর্গকে নিয়ে কঙ্ক পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

তীর্থযাত্রা করে। কঙ্ক ও লীলার কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র-লীলা। কঙ্ক ও লীলার কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র- লীলা ও গর্গের স্ত্রী গায়ত্রী দেবী।

কাজলরেখা

'কাজলরেখা' রূপকথা ভিত্তিক রচনা, এর কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- সাধু ধনেশ্বরের অপরূপ সুন্দরী কন্যা কাজলরেখা । জুয়াড়ী ধনেশ্বরের বিবাহযোগ্যা একমাত্র কন্যা কাজলরেখাকে কেউই বিয়ে করতে রাজী হয়নি। সওদাগরের দুঃখের কথা শুনে এক সন্ন্যাসী তাকে একটি শুকপাখী ও একটি মন্ত্রপূত আংটি দিলেন। শুকপাখীর পরামর্শে ঐ আংটি বিক্রি করে ক্রমে ক্রমে হারান সম্পত্তি সাধু ফিরে পেলেন, কিন্তু কন্যার বিয়ে দেয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নিরুপায় সাধু শুকপাখীর কাছে পরামর্শ চাইলে শুকপাখী কাজলরেখাকে বনবাসে দিতে বলল। সেখানেই মৃত এক রাজপুত্রের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে ধার্য করা আছে। শুকপাখীর কথামত কাজলরেখাকে সওদাগর গভীর বনে এক পোড়ো মন্দিরের দরজায় বসিয়ে রেখে গোপনে গৃহে ফিরে গেল। কাজলরেখা কিছু বুঝতে না পেরে মন্দিরের বন্ধ দরদায় হাত রাখতে কপাট খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করতেই দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। সেখানে সর্বাঙ্গে সূঁচবিদ্ধ অবস্থায় এক মৃত রাজপুত্রকে দেখে কাজলরেখা অবাক হ'ল। এমন সময় সেখানে এক সন্ন্যাসী উপস্থিত হলেন। কাজলরেখাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই মৃত রাজকুমার তার স্বামী। এর সর্বাঙ্গ থেকে একটি একটি করে সূঁচ তুলে ফেলে রক্ষিত পাতার রস দুটি চোখে দিলে তার স্বামী জীবন ফিরে পাবে এবং তাদের মিলন হবে। কিন্তু শর্ত থাকবে স্বামীর কাছে কখনো তার নিজের পরিচয় দেয়া যাবে না। যদি সে কখনো নিজের পরিচয় নিজে দেয় তাহলে তার ভাগ্যে বৈধব্যদশা অবধারিত। সময় হলে শুকপাখী তার পরিচয় রাজপুত্রের নিকট জানাবে।

এদিকে কাজলরেখা সাতদিন সাতরাত ধরে রাজপুত্রের দেহের সমস্ত সূঁচ অতি যত্নে তুলে দুটি চোখের সূঁচ খোলা বাকী রেখে স্নান করার উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি ১৩/১৪ বছরের একটি কন্যা দাসী হিসেবে বিক্রি করার জন্য তার কাছে এসে বলল, একজন সন্ন্যাসী আমাকে এই বনের পথ দেখিয়ে বলল যে, এই বনে এক রাজকন্যা বাস করে তার দাসীর প্রয়োজন আছে। আমার বোধ হয় তুমি সেই রাজকন্যা। তখন কাজলরেখা দয়াপরবস হয়ে হাতের কঙ্কন দিয়ে ঐ কন্যাটিকে কিনে নিল এবং তার নাম দিল কঙ্কন দাসী। এই দাসীই পরে কাজলরেখাকে প্রতারিত করে পাটরানী হয়ে বসে। রাজপুত্র জানতেও পারে না প্রকৃত রাণী কে ? কারণ কাজলরেখা স্নান করে ফিরে আসার পূর্বেই কঙ্কন মৃত রাজপুত্রের চোখের সূঁচ খুলে পাতার রস দেয়ার পর চোখ খুলে প্রথমে দাসীকে সামনে দেখে কৃতজ্ঞতাবশতঃ তাকেই নিজের পাটরাণী করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এমন সময় কাজলরেখা স্নান শেষে ফিরে এলে কঙ্কন তাকে দাসী হিসেবে পরিচয় করাল। এরপর দীর্ঘ বারো বৎসর কাজলরেখা সন্ন্যাসীর নির্দেশ অমান্য না করে নীরবে বহু যন্ত্রণা ভোগ করে শুকপাখীর দ্বারা তার প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হওয়ার পর মুক্তি পেল। আর কঙ্কন দাসীকে রাজপুত্র জীবন্ত কবর দিয়ে তার ছলনার শাস্তি প্রদান করল। শেষ পর্যন্ত কাজলরেখা তারা স্বামীকে ফিরে পেল। গীতিকাটি মিলনাত্মক। এর প্রধান নারী চরিত্র দুটি- কাজলরেখা ও কঙ্কন দাসী। এখানে কঙ্কন দাসী প্রতিনায়িকার ভূমিকা পালন করেছে।

দেওয়ানা মদিনা

'দেওয়ানা মদিনা' গীতিকায়--- আলাল ও দুলাল নামে দুই পুত্রকে সংসারে রেখে বান্যাচঙ্গ শহরের দেওয়ান সোনাফরের পত্নীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় আলাল ও দুলালকে দেওয়ানের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর পত্নী পুনরায় তাঁকে বিয়ে করতে বারণ করে গেলেন। কারণ তার আশঙ্কা সৎমা সংসারে

Dhaka University Institutional Repository

এলে তার পুত্র দুটির লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। দেওয়ান মৃত স্ত্রীর স্মরণে পুনরায় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ছেলে দুটিকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন সর্বক্ষণ। পরে উজীর-নাজীরের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধ্য হন। তিনি পুত্রদের আগের মতই আদর-যত্ন করতে লাগলেন এবং সৎমা থেকে আগলে রাখলেন। এতে সৎমা আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে এবং তাদের সংসার থেকে বিতাড়িত করার সংকল্প করে। পিতার অজ্ঞাতে গোপনে বিমাতা অর্থের দ্বারা জল্লাদকে বশীভূত করে ছেলে দুটিকে নদীর মাঝ গাঙে ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনা করে। ছল করে তাই একদিন 'নৌকা বাইচ' দেখার জন্য পরিকল্পিত মাঝিরূপী জল্লাদের সঙ্গে পাঠাল আড়ং মেলায়। কিন্তু ফুটফুটে বাচ্চা দুটির কান্নায় তার মায়া জাগে এবং এক সাধুর কাছে তাদের সঁপে দিয়ে ফিরে যায়। সাধু ইরাধর নামে এক কৃষকের কাছে ছেলে দুটিকে বিক্রি করে সেই টাকায় ধান ক্রয় করে বাড়ী ফেরে। ইরাধর ছেলে দুটিকে কিনে গরুর রাখাল হিসেবে নিযুক্ত করল। দেওয়ানের পুত্র হয়ে এ কাজ তারা সহ্য করতে পারল না। কিছু দিন পর আলাল সেখান থেকে মনের দুঃখে পালিয়ে গেল। শিকার করতে এসে সেকেন্দার দেওয়ান একটি গাছের নীচে ঘুমন্ত আলালকে দেখে অবাক হয় এবং তাকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যায়। আলালের ব্যবহারে দেওয়ানের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আলাল উচ্চ বংশজাত সন্তান।

বারো বছর অতিক্রম হওয়ার পর আলাল দেওয়ানের সাহায্য নিয়ে বান্যাচঙ্গের দেওয়ানী ফিরে পেল। মমিনা ও আমিনা নামে দেওয়ানের দুই কন্যা ছিল। দেওয়ান তার এক কন্যার সঙ্গে আলালের বিয়ের প্রস্তাব দিলে আলাল জানাল তার ছোট ভাই দুলালকে সন্ধান করে এনে তারা দু'ভাই দেওয়ানের দুই মেয়েকে বিয়ে করবে। আলাল দুলালের সন্ধানে বের হয় এবং অনেক খোঁজা-খুঁজির পর দুলালকে কাছে পেয়ে যখন জানতে পারল- দুলাল এক কৃষককন্যাকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। তার স্ত্রীর নাম মদিনা। সুরুজ নামে একটি পুত্র সন্তানও আছে তার। তখন আলাল তাকে পরামর্শ দিল স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়ার। দেওয়ান পরিবারের সন্তান হয়ে কৃষককন্যা বিয়ে ও কৃষিকাজ করা নিন্দনীয়। একদিকে প্রেম, অন্যদিকে পারিবারিক আভিজাত্যের আকর্ষণে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল দুলালের মনে। আলালের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত মদিনার ভাইএর হাতে 'তালাকনামা' পাঠিয়ে দুই ভাই ফিরে গেল নিজেদের গৃহে। মদিনা বিনা দোষে স্বামী কর্তৃক 'তালাকনামা' হাতে পেয়ে প্রথমে অবিশ্বাস পরে স্থির নিশ্চিত জেনে শয্যা গ্রহণ করে। বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও যখন দুলাল ফিরে এল না তখন পুত্র সুরুজ জামালকে ভাই এর সঙ্গে পাঠাল দেওয়ান বাড়ীতে। পথিমধ্যে দুলাল তাদের চিনতে পেরে ফিরিয়ে দিল। মদিনাও সুরুজ জামালের মুখে স্বামীর আচরণ সম্পর্কে-- জ্ঞাত হয়ে 'তালাক' এর ঘটনা সত্য বলে মেনে নিল। এভাবে আরো কিছুদিন কষ্ট ভোগ করার পর বিচ্ছেদ বেদনায় এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অবশেষে অনুতপ্ত দুলাল ফিরে আসে এবং দেখতে পায় তার গৃহ শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সুরুজ জননীর কবরের উপর কেঁদে দিন কাটায়। আর দুলাল ফকির সেজে মদিনার কবরের উপর একটি কুটির নির্ম্মাণ করে বাস করতে থাকে। দেওয়ানা মদিনা কাহিনী বিয়োগান্তক। এতে একাধিক নারী চরিত্র আছে- মদিনা, আলাল-দুলালের মা, সৎমা, মমিনা ও আমিনা।

রূপবতী

'রূপবতী' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- রামপুরের রাজার নাম রাজচন্দ্র। তাঁর একমাত্র কন্যা, নাম রূপবতী। বালিকা কন্যা গৃহে রেখে রাজা কার্য্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদ গেলেন। দিন কেটে যেতে থাকে। তিন বছর পার হয়ে যাওয়ার পর রাণী চিন্তিত হয়ে রাজাকে চিঠি লিখলেন--- "তিন বছর যায় রাজা আছত বিদেশে / ঘরেতে তোমার কন্যা আছে কোন বেশে / পরথম যৌবন

Dhaka University Institutional Repository

কন্যার লোকে কানাকানি / তা শুন্যা কেমনে সহে মায়ের পরানি / বিবাহের কাল গেলে উচিত না হয় / এমন কন্যা ঘরে রাখলে ধর্ম্মনাশ হয়।" চিঠি পাওয়ার পর রাজচন্দ্র নবাবের কাছে কন্যার বিয়ের কারণে দেশে ফেরার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবাব প্রত্যুত্তরে বললেন--- "শুন্যাছি তোমার কন্যা ছুরৎ জামালী / আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরাণী।" দেশে ফিরে রাজা রাণীর কাছে সব খুলে বললেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, মুসলমানের ঘরে কন্যার বিয়ে দিয়ে জাতিনাশ করার চেয়ে ভোরে যার মুখ প্রথমে দেখবেন-- মালী, ডোম, হাজং যেই হোক না কেন তার হাতেই কন্যা সমর্পণ করবেন। তবুও মুসলমানের সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে সম্ভব নয়। এই সংবাদ শুনামাত্র রাণী ভীষণ বিচলিত হলেন। অনোন্যপায় হয়ে পরদিন তিনি প্রভাতে রাজার শয়নগৃহের দরজায় মদন নামে এক কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে বললেন। রাজা ঘুম থেকে উঠে দরজার সামনে মদনকে দেখে তার হাতেই কন্যাকে সঁপে দিলেন। রূপবতী গীতিকার কাহিনী মিলনাত্মক। এতে নারী চরিত্র আছে তিনটি- রূপবতী, রাণী ও জেলেনী-পুনাই।

মাণিকতারা ডাকাইত

'মাণিকতারা ডাকাইত' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- কেন্দ্রিয় চরিত্র বাসু সঙ্গ দোষে ডাকাতিবৃত্তি গ্রহণ করে। পিতা ও চার ভাইকে হারিয়ে মাতৃ আদরে লালিত বাসু মায়ের সইয়ের পুত্র কানুর সংসর্গে লুণ্ঠনবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে ডাকাত সুলভ হিংস্রতা কিংবা নির্মমতা তার চরিত্রে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ হত্যার পর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে মায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে ধর্মপ্রাণা মা পুত্র কর্তৃক ব্রাহ্মণ হত্যার সংবাদ শুনে যে আঘাত অনুভব করেন, তার ফল হয় মৃত্যু। মাতৃশোকে বাসু কিছুটা আঘাত পেলেও তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। পুনরায় সে কানুর চেলা হয়ে ডাকাতি করতে শুরু করল। কানুর মা কানুর বিয়ে দিয়ে বাসুকে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। বাসু বের হয় কন্যার সন্ধানে। অবশেষে সে বিয়ে করল সাধু শীলের কন্যা পরমা সুন্দরী মাণিকতারাকে। বিয়ের কাজ সমাধা হলেও বাসুর মনে শান্তি ছিল না। সে তার জীবিকার কথা মাণিকতারাকে খুলে বলতে পারে না। পাছে মাণিকতারার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। একদিন সে সবকথা খুলে বলে মানিকতারাকে "চুরি কইরা খাইছি কত কইরাছি কত খেলা / বয়েস বাইড়ল ডাঙ্গর হইলাম শিখলাম ডাকাতি / পরের ধন লুইট্যা আইনা কইরাছি বেসাতি"। মাণিকতারা সব শুনে প্রসন্ন মনে জানাল যে, সে পতির সমস্ত ক্রিয়াকর্মের সহায়ক হবে। তখন বাসু মানিককে তার পরম শত্রু কালুচোরার কথা জানাল। সে জানাল, সে যাচ্ছে নবাব সরকারের খাজনার টাকা ডাকাতি করতে, রাখাল রাজার দীঘির পাড়ে। তার অবর্তমানে পাছে কালুচোরার কারণে মানিকের কোন বিপদ হয় এই আশঙ্কা তার। কিন্তু মাণিকতারা বিপদাশঙ্কা উড়িয়ে দিল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

একদিন বাসু ও কানু সর্দার কুড়িজন জোয়ানসহ ডাকাতি করতে গেল। বাসু টাকার থলি নিয়ে পালালেও কানু ধরা পড়ে গেল কালুর দলের হাতে। বাসু গেল কানুকে উদ্ধার করতে। মাণিকতারাও চিন্তিত হয়ে পড়ে কানুর উদ্ধারের ব্যাপারে। কানুকে বাঁচানোর জন্য সে বিধবা বোনঝি পঞ্চুকে নর্তকী সাজিয়ে আর নিজে গায়িকা হয়ে যাত্রা করল। কালুর পুত্র দুলুকে আকৃষ্ট করে নৌকায় তুলে নিল। তারপর তাকে মদ্যপান করিয়ে বেহুঁস করে বেঁধে ফেলল। এভাবে মাণিকতারা শর্ত আরোপ করল যে কালু যদি কানুকে মারে তবে তার দুলুরও মৃত্যু ঘটবে। কালু এই শর্তের কথা অবগত হয়ে বাসুর বাড়ী আক্রমণ করে। সবাই পালিয়ে গেলেও মাণিকতারা পালালো না। সে সমানে প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। কানু মারা পড়ল কিন্তু তার হাতে বাসুর পা ভাঙল। মাণিকতারা স্বামীর যত্ন করল। পরবর্তীতে তাকেই ডাকাত দলের নেতৃত্ব দিতে হ'ল। শেষে শিমুলতলাতে ডাকাতি করতে গিয়ে জলের ঘাটে মৃত্যু মুখে

Dhaka University Institutional Repository

পতিত হ'ল। বেচারা বাসু ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। মাণিকতারা গীতিকার কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে কয়েকটি নারী চরিত্র আছে- মাণিকতারা, বাসুর মা, বাসুর মায়ের সই এবং মাণিকতারার বোনঝি পঞ্চু।

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান বা সখিনা বিবি

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' বা সখিনা বিবি গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- কেল্লা তাজপুরের দেওয়ান উমর খাঁর সুন্দরী কন্যা সখিনার ছবি দেখে জঙ্গলবাড়ীর ফিরোজ খাঁ দেওয়ান উজিরের মাধ্যমে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছিল। একথা শোনামাত্র উমর খাঁ ঘৃণাভরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ ঈশা খাঁর বংশ ছিল অসবর্ণ বিয়ে দ্বারা কলঙ্কিত। হিন্দু নারী বিয়ে করার কারণে উমর খাঁর আভিজাত্যের মূলে ঘৃণা জন্মেছিল। তাই জাতিবিদ্বেষী মনোভাবের কারণে এবং সামাজিক সম্ভ্রম বিনষ্টির আতঙ্কে এই বিয়ের প্রস্তাবকে তিনি অবমাননা করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো অত্যন্ত স্পর্ধার ব্যাপার। এই স্পর্ধার সমুচিত জবাব দেবার জন্য উমর খাঁ দিল্লীর বাদশাহের দরবারে গিয়ে ফিরোজ খাঁ সম্পর্কে নালিশ জানিয়ে উচিত শাস্তি প্রদানের জন্য বাদশাহের সাহায্য প্রার্থণা করলেন। এদিকে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সংবাদ ফিরোজ খাঁর আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। ফলে একদিন আকসিকভাবে উমর খাঁর অন্দর মহলে হানা দিয়ে সখিনাকে লুট করে নিয়ে বিয়ে করে ফেলে উমর খাঁর আত্মাভিমানে কলঙ্ক লেপন করল। এই সংবাদ বাদশাহর কাছে পৌছার পর বাদশাহ ফিরোজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিলেন। সখিনার রূপের খ্যাতি বাদশাহর মনে মোহ সৃষ্টি করেছিল। তার কন্যার উপর ফিরোজ খাঁর দৃষ্টি পড়ায় বাদশাহর ক্রোধ বৃদ্ধি পায় এবং তা যুদ্ধের অনিবার্যতার দিকে ধাবিত হয়।

একদিকে উমর খাঁ প্রদত্ত অপমানের প্রতিশোধকল্পে ফিরোজ খাঁর পৌরুষ জেগে উঠেছিল। অন্যদিকে সখিনার প্রেমের গভীরতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের ফলে তাকে বীরের মত হরণ করে এনে বিয়ে করেছে। সখিনা স্বেচ্ছায় এই বীর প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পিতা উমর খাঁর সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে স্বামীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করে পিতার অন্যায় জেদের মোকাবেলা করতে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল। একদিকে পিতার স্নেহের আতিশর্য্য অন্যদিকে পতি প্রেমের গভীরতা উভয় সঙ্কটে সখিনা পতিপ্রাণা নারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনায় অধীর হয়ে উঠল। ধর্মীয় বিশ্বাসের আনুকূল্যে পিতার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মঙ্গল কামনাই এ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কামানের গোলার আঘাতে ফিরোজ খাঁর মারাত্মকভাবে জখম হওয়ার সংবাদ শোনামাত্র ঈশা খাঁর বংশের বধূ হিসেবে বংশের সম্মান রক্ষার্থে নিজেই রণসাজে সজ্জিত হল পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য। সখিনার সমগ্র অন্তর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে স্বামীর কুলমান রক্ষার্থে জঙ্গী পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে রণক্ষেত্রের পথে বীর সেনানীর মত অগ্রসর হয়েছে। তার প্রচন্ড আক্রমণের মুখে বাদশাহর ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেল্লাতাজপুর যে মুহূর্তে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হতে যাচ্ছিল ঠিক সে মুহূর্তে সংবাদ এল সখিনাকে ফিরোজ খাঁ 'তালাক' প্রদান করেছে। স্বামীর আকস্মিক ও অকল্পনীয় চির বিচ্ছেদলিপি পাঠ করে যুদ্ধসজ্জারত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ভুলুণ্ঠিত হয় সখিনা.... "তালাকনামা পড়ে বিবি ঘোড়ার উপরে / সাপেতে ডংশিল যেমন বিবির যে শিরে / ঘোড়ার পিঠ হইতে বিবি ঢলিয়া পড়িল / সিপাই লস্করে যত চৌদিকে ঘিরিল"। ...অথচ এই সখিনা ই স্বামীর বন্দীত্বের সংবাদ শুনে বীরত্বসূচক উক্তি করেছিল--- "আমার স্বামী বন্দী করে কেমন বুকের পাটা / জঙ্গেতে বুঝিবাম তারে

Dhaka University Institutional Repository

কেমন বাপের বেটা।" গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র আছে দুটি- সখিনা ও দরিয়া বাঁদী।

শ্যাম রায়

'শ্যাম রায়' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- রাজপুত্র শ্যামরায় এক সুন্দরী ডোম বধূর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দূতীর সাহায্যে প্রেম নিবেদন করে পাঠালে ডোমবধূ বিস্মিত হয় এবং রাজপুত্রের প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই অসবর্ণ প্রেমের সংবাদ পিতা চান্দরামের কানে পৌছামাত্র তিনি এই অনাচার প্রতিরোধকল্পে ডোমদের ঘরবাড়ী ভেঙে দিয়ে তাদের দেশত্যাগী করলেন। সেই সঙ্গে ডোমবধূর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে একত্রে তিনিও ডোম বধুকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলে। লক্ষণীয় যে, ডোমনী শ্যামরায়কে অনেক করে বুঝিয়েছে যে, তার প্রতি আসক্ত হওয়া কিংবা তার জন্য রাজ্য ত্যাগ করা উচিত হবে না। ... ... "আমি ত ডোমের নারীরে বন্ধুরে হাত দিও না গায় / ছোটর সঙ্গে বড়র পিরীত বড়র জাতি যায়রে বন্ধু। ... .

রাজার ছাওয়াল তুমি রে বন্ধু আমি ডোমের নারী / সমুদ্র সায়র থুইয়া বন্ধু শুকনায় বাইছ তরীরে বন্ধু।" কিন্তু অন্ধ প্রেম ত কোনো যুক্তি মানে না। শ্যামরায় জানিয়েছে: "তোমারে লইয়া লো কন্যা হইব দেশান্তরী / রাজ্য ছাইড়া যাইব আমি হইব দণ্ডধারী। গির করব বিরিক্ষের তল বসতি জঙ্গলা / গজমতি থুয়্যা গলায় পরব হাড়ের মালা।" বাস্তবিক প্রেমের কারণে শ্যামরায় স্বদেশ, স্বজন ছেড়েছে, অঙ্গীকার করেছে কৃচ্ছ্রসাধনকে, শ্যামরায়ের কৃচ্ছ্রসাধনে সংকুচিত হয়েছে ডোমনী। সে শ্যামরায়ের দু:খ ভোগের জন্য নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু তাদের কপালে সুখ জোটেনি। গাবুর রাজার চক্রান্তে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। গাবুর রাজা নিজেই ডোমনীকে পেতে চেয়েছে। কৌশলে সে পালিয়েছে।

ডোম বধূর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়াতে সেই 'গাবর' অসভ্য রাজা ডোম বধূকে ধরে এনে শ্যামরায়কে ডোম ভেবে শূলদণ্ড দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এই সংবাদ শোনামাত্র ডোমবধূ রাজসভায় ছুটে এসে রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলে-- "জোর কইরা বশাইতে চাও রমণীর মন। ... বলে কি করিতে চাও অন্যারে বশ । ... পুষ্প বাটিয়া খাইলে মধু কোথায় পাও।" অর্থাৎ শক্তি দিয়ে নারীর দেহ পেলেও মন পাওয়া যায় না। নারীর মন প্রেমের সাথেই পাওয়া সম্ভব, অন্য কোন পথে নয়। এ কথা শুনে ডোম রাজা শ্যামরায়কে মুক্তি দিলেন। যথারীতি গাবর রাজার বিয়ের আয়োজন শুরু হল। এদিকে শ্যামরায় রাজার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে দেশে ফিরে পিতা চান্দরায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। পিতাও একমাত্র পুত্রের ভুল ক্ষমার চোখে দেখেন। পরবর্তীতে শ্যামরায় গাবর রাজার ঘটনা জানিয়ে পিতার কাছে যুদ্ধ যাত্রার অনুমতি চাইল।

অনুমতি পেয়ে শ্যামরায় ছয়শত লাঠিয়াল নিয়ে গাবর রাজাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল। প্রচন্ড যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ একটি বিষাক্ত তীর শ্যামরায়কে বিদ্ধ করল। বিষক্রিয়ায় শ্যামরায় নিস্তেজ হয়ে গেল। এই সংবাদ জানতে পেয়ে ডোমবধূ আত্মগোপন ত্যাগ করে ছুটে এল প্রেমিকের কাছে। শ্যামরায়কে জীবিত না পেয়ে তৎক্ষণাৎ বিষ খেয়ে নিজেও স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে শ্যামরায়ের প্রতি অকপট ভালোবাসার প্রমাণ দিল। শ্যামরায় গীতিকার কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র আছে দুটি- ডোম বধূ ও দূতী।

Dhaka University Institutional Repository

শীলা দেবী

'শীলা দেবী' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- এক জংলা মুণ্ডা অসহায় অবস্থায় এক ব্রাহ্মণ রাজগৃহে কোটালের পদে নিযুক্ত হয়। কিন্তু রাজা জংলার সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, জংলাকে বন্দী করেন। জংলা কারাগার থেকে বের হয়ে ডাকাত দল গঠন করে সুযোগ মত রাজবাড়ী আক্রমণ করে। কিন্তু তার কাঙ্খিত রাজকন্যার সন্ধান পায় না। কারণ কন্যাসহ রাজা অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আশ্রয়দাতা পরগনা রাজের রাজপুত্র রাজকন্যা শীলা দেবীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু শিলাদেবী তার পিতার শর্তের কথা জানায়। জংলাকে যে ব্রাহ্মণ রাজার কাছে বেঁধে এনে দেবে, তার সঙ্গেই তিনি তাঁর কন্যার বিয়ে দেবেন। রাজপুত্র শর্ত রক্ষার জন্য জংলার বিরুদ্ধে যাত্রা করে। জংলাকে যুদ্ধে রাজকুমার পর্যুদস্ত করে। রাজকুমারের সঙ্গে যখন রাজকন্যা শীলাদেবীর বিয়ের আয়োজন চলছে, এমন সময় আকস্মিকভাবে জংলা ব্রাহ্মণ রাজার প্রাসাদ আক্রমণ করে বসে। নিহত হয় রাজকুমার। শীলাদেবীও আত্মঘাতিনী হয়। অত:পর ত্রিপুরারাজ জংলাকে বন্দী করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে। অর্থাৎ জংলামুণ্ডার প্রতিশোধ স্পৃহার কারণে শীলাদেবী আর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পরেনি। শীলাদেবী গীতিকাটি বিয়োগান্তক। এর একমাত্র নারী চরিত্র শীলাদেবী।

কুমার বীর নারায়ন

'কুমার বীর নারায়ন' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- রাধারমনের রূপবতী ষোড়শী কন্যা সোনামণি ঘর-গৃহস্থালির কাজে মাকে সাহায্য করে। একদিন সোনামণি গাঙ্গের ঘাটে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে গাছের নীচে ঘুমন্ত বীরনারায়নকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়। সে জানে যে কুল-মর্যাদা ও অন্যান্য দিক থেকে সে জমিদার তনয়ের উপযুক্ত নয়। তবুও সোনামণি তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি- 'বামুন হয়্যা চাইছি রে আমি ঐনা আশমান ছুইতে।' কিছুদিন পর এক সাধু সোনামণিকে অসহায় অবস্থায় অপহরণ করে এবং নানা প্রলোভনে তাকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু সাধুর প্রস্তাবে সে সম্মত হয়নি। বীর নারায়নের প্রত্যক্ষ সহায়তায় প্রতিকূল অবস্থা থেকে সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। তখন প্রতিবেশীরা সোনামণির চরিত্রে কলঙ্কের অজুহাত তুলে তাকে ঘর ছাড়া করে। তখন সোনামণি বীর নারায়ণের উপর নির্ভর করে।

বীর নারায়ন বুঝতে পারে সোনামণি অন্যায়ভাবে পরিত্যক্তা হয়েছে। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় তার পিতার কাছে সুবিচারের প্রার্থী হবে। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন সোনামণি তাতে সম্মত হয়নি; কারণ সে জানে--- "ইতে বিপরীত হইব রাজসভায় যাইয়া।" সোনামণি বুঝতে পারে--- সম্পূর্ণ অকারণে বীর নারায়নকে নিয়ে তার চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপিত হয়েছে, একমাত্র মৃত্যুই তার প্রকৃত সমাধান। তাই সে আত্মঘাতিনী হবার সংকল্প করে। তার সংকল্পে বাধা দেয় বীর নারায়ন। বীর নারায়ন যখন বলে সোনামণিকে না পেলে সে চিরকুমার থেকে যাবে এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করবে, তখন সোনামণি তাকে তাদের প্রণয়ের আশুভ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে--- "আমার সঙ্গে তোমার পিরীত বাপ মায়ে না মানিব/ অপযশ দিয়া তোমারে সকলে খেদাইব।" সোনামণির একমাত্র চাওয়া ছিল--- বীর নারায়নের ভালোবাসা। সে যখন জানিয়েছে সোনামণিকে পেলে তার আর কিছুই চাওয়ার থাকবে না, অনায়সে সে বনবাসী হতে প্রস্তুত, তখনই সোনামণি বীর নারায়নের কাছে ধরা দিয়েছে এবং চন্দ্র, তারা, গাছ-পালাকে, সাক্ষী করে কুমারকে পতিত্বে বরণ করেছে। জমিদারের লোকজন কুমারকে বন্দী করে তার চক্ষু উৎপটিত করে অন্ধ করে দিল। উন্মাদিনী অবস্থায় দীর্ঘকাল পর বীর নারায়ণের বাঁশীর সুর শুনে সোনামণি তাকে চিনতে পারে। উন্মত্তের মত স্বামীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ভরা গাঙে পড়ে তার

Dhaka University Institutional Repository

সলিল সমাধি ঘটে। এর কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র আছে দুটি- সোনামণি ও সোনামণির মা।

সন্নমালা

'সন্নমালা' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- সন্নমালা পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। অপরূপ রূপের কারণে তার নাম রাখা হয়েছে 'সন্নমালা'-- অর্থাৎ স্বর্ণের মত বর্ণ তার। একবার কন্যার ভাগ্য গণনার উদ্দেশ্যে রাজা গণকের সহায়তায় জানতে পারলেন--- কন্যার জন্ম হয়েছে অলক্ষ্মীর অংশে। তাই সন্নমালার বার বৎসর বয়স হওয়ার পর রাজার দুর্ভাগ্যের সূচনা হবে। এতদসত্ত্বেও অপত্যস্নেহের কারণে তিনি তার একমাত্র কন্যাকে ত্যাগ করতে পারেননি। সত্যি সত্যিই দেখা গেল সন্নমালার বার বছর পূর্ণ হওয়ার পর শুরু হ'ল রাজার ক্ষয়-ক্ষতি। শেষে নিরুপায় হয়ে রাজা কন্যাকে নির্বাসন দিলেন। দুর্ভাগ্যের কারণে সন্নমালার অনিশ্চিত জীবনের সূত্রপাত হল। অবশ্য সন্নমালা তার দুর্ভাগ্যকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। নিজের উপর অটল আস্থা সম্পন্ন সন্নমালা নিজের দুর্দশায় ভেঙে পড়েনি বরং সে তার পিতা-মাতার জন্যই ছিল বেশি উদ্বিগ্ন। বনবাস জীবনে সন্নমালা বন্য জীব-জন্তুর সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। নিজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে একবার সওদাগর বাণিজ্য করে ফেরার পথে সন্নমালাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সওদাগর পুত্রও সন্নমালার প্রতি আসক্ত হয় এবং তার কাছে পানি প্রার্থনা করে। সওদাগর পুত্রের কাছে সন্নমালা তার দুর্ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। অবশেষে সওদাগর পুত্রের পিড়াপীড়িতে সন্নমালা তাকে বিয়ে করতে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে অপর এক রাজপুত্র তার পানি প্রার্থী হলেও সন্নমালা তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনি। রাজপুত্র এর প্রতিশোধ স্বরূপ সওদাগর পুত্রকে কৌশলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। রাজকুমারের ইচ্ছানুযায়ী সওদাগর পুত্রকে বিষাক্ত সাপের মুখে ঠেলে দেয়া হয়। সর্পাঘাতে সওদাগর পুত্রের মৃত্যু হলে সন্নমালা তার পুনর্জীবনের জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা শেষে এক চক্ষুবিশিষ্ট কানাইয়ের সহায়তায় তার মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলে। কিন্তু কানাইয়ের পরামর্শমতে সে দীর্ঘ বার বছর সওদাগর পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। স্বামীর মঙ্গল কামনায় এ বিচ্ছেদ বেদনার যন্ত্রণা সে নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নেয়। হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাকে এ শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। গীতিকাটির কাহিনী মিলনাত্মক। এ গীতিকায় নারী চরিত্র আছে দুটি- সন্নমালা ও তার মা।

রতন ঠাকুর

'রতন ঠাকুর' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- এ পালার নায়ক রাজকুমার রতন ঠাকুর আর নায়িকা এক মালিনী। মালিনীর গাঁথা ফুলের মালা দেখেই রতন ঠাকুর তার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত দুজনই গৃহত্যাগী হয়ে সজিন্তার দেশে উপস্থিত হয়। এখানে রতন ঠাকুর নিজেকে মালী বলে পরিচয় দিয়েছে। আর মালিনী তার পূর্ব পরিচয়েই পরিচিত হয়েছে। কিন্তু রতন ঠাকুরের পিতা রঙ্গিলা নাম্নী বারবিলাসিনীর সাহায্যে পুত্রকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন সজিন্তা থেকে। বেচারী মালিনী রতন ঠাকুরের বিরহে আত্মঘাতিনী হয়েছে। পরে রতন ঠাকুর সজিন্তায় ফিরে এসেছে কিন্তু তখন তার প্রেমিকা বেঁচে ছিল না। শোকে, দু:খে রতন ঠাকুর পাগল হয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র আছে দুটি- মালিনী ও রঙ্গিলা নামে বারবিলাসিনী।

Dhaka University Institutional Repository

হরিণকুমার-জিরালনী কন্যা

'হরিণকুমার জিরালনী কন্যা' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- নয়াগঞ্জের রাজা চক্রধরের দুই রাণী। ছোট রাণীর চক্রান্তে বড় রাণী বনবাসিনী হয়েছে। বড় রাণীর একমাত্র কন্যার নাম জিরালনী। জিরালনী ছোট রাণী ও তার বাবার সঙ্গে রাজ-প্রাসাদেই থাকে। একদিন চক্রধর শিকারে গিয়ে একটি হরিণের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে প্রাসাদে ধরে নিয়ে এলেন এবং জিরালনীকে তা উপহার দিলেন। প্রকৃতপক্ষে হরিণটি ছিল দণ্ডপুরের রাজা দণ্ডপতির পুত্র। বিমাতা তাকে বন্য ঔষধের সাহায্যে হরিণে রূপান্তরিত করে। দীর্ঘ বারো বছর তার বনে অতিবাহিত হয়। হরিণের মাথায় একটি কবচ বাঁধা ছিল। জিরালনী কোনক্রমে সেটি খুলে ফেললে অনিন্দ্য সুন্দর রাজকুমারকে হরিণের পরিবর্তে জিরালনী দেখতে পায়। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উভয়ে উভয়ের দু:খের শরিক হয়। হরিণকুমার দিনের বেলায় হরিণরূপে রাজকন্যার কাছে থাকলেও রাত্রে সে রাজকুমারের স্বাভাবিক আকৃতিতে জিরালনীর সঙ্গে অতিবাহিত করে। ঘটনাচক্রে হরিণকুমারের মাথার কবচটি হারিয়ে গেলে তাকে আর হরিণে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় না। রাজবাড়ীর লোকের কাছে হরিণকুমারের উপস্থিতি ধরা পড়ার সম্ভাবনায় সে চক্রধরের প্রাসাদ থেকে পলায়ন করে। তার আগেই তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়।

অন্যদিকে চক্রধরের ছোট রাণীর সন্তান দুলাই জিরালনীর প্রতি দুর্বলতাবশত তাকে বিয়ে করতে ব্যাকুল। সে জিরালনীর সঙ্গে তার বিয়ে না হলে প্রাণত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করলে আগত্যা রাজা-রাণী বিয়েতে সম্মত হয়। কিন্তু জিরালনী তা মেনে নিতে পারেনি। এরপর বাণিজ্যরত এক সওদাগর পুত্রের সঙ্গী হ'ল জিরালনী। সওদাগর পুত্রকে জিরালনী তার দু:খময় জীবনের কথা সবিস্তারে জানাল এবং হরিণকুমারের সন্ধান এনে দিতে বলল। জলপথে একদিন সওদাগর পুত্রের ডিঙ্গা ডুবে যায়। কাঠুরিয়াদের সহায়তায় সে রক্ষা পায় তাদেরই নৌকায়। এই নৌকাতেই অবস্থান করছিল হরিণকুমার। সওদাগর পুত্রের কাছ থেকে হরিণকুমার জিরালনী সম্পর্কে জানল। তারপর সওদাগর পুত্রের সঙ্গে হরিণকুমার জিরালনীর সন্ধানে বেরিয়ে ভোলা ডাকাতের লোকজনদের দ্বারা ধৃত হয়। জিরালনী ভোলা ডাকাতের আশ্রিতা ছিল। ডাকাত হরিণকুমারকে তার পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করাল। হরিণকুমারের সঙ্গে জিরালনীর বিয়ে হয়। সওদাগরপুত্র নবপরিণীতা হরিণকুমার ও জিরালনীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল বারানসী ধাম। গীতিকাটির কাহিনী মিলনাত্মক। এখানে নারী চরিত্র তিনটি- ছোট রাণী, বড় রাণী ও জিরালনী।

পীর বাতাসী

'পীর বাতাসী'র গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- নায়ক বিনাথ মাত্র সাত মাস বয়সে পিতৃহীন হয়। আর সাত বছর বয়সে হয় মাতৃহীন। গ্রামের মোড়ল চান্দের বাড়িতে সে আশ্রয় নেয় এবং রাখালির কাজ করে। কুঁড়ি বছর বয়সে বিনাথ ও চান্দ যায় বাণিজ্য যাত্রায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিনাথ জলে ভাসতে ভাসতে যেতে থাকে। এমতাবস্থায় সুমাই ওঝার পালিতা কন্যা বাতাসী তার নজরে পড়ে। বাতাসীর আগ্রহে সুমাই ওঝা ঔষধ দিয়ে বিনাথের প্রাণ রক্ষা করে। বিনাথ সুমাই ওঝার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নানা মন্ত্রতন্ত্র আয়ত্ত্ব করে ওঝা রূপে পরিচিতি লাভ করে।

বিনাথের যশে সুমাই ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে বিনাথ পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয় চান্দ মোড়লের গ্রামে। চান্দের পুত্র কুশাই সর্পাঘাতে মৃত্যুর সম্মুখীন হলে তাকে বিনাথ বাঁচিয়ে দিল। চান্দ মোড়ল তার কন্যা সুজন্তীর সঙ্গে বিনাথের বিয়ে দিল। সুজন্তী ছিল ভ্রষ্টা চরিত্রের। সুমাই ওঝার সঙ্গে চক্রান্ত করে সুজন্তী বিনাথের কাছ থেকে 'জীয়নমন্তর' জেনে নিলে বিনাথ সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সে বাতাসী কন্যার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল। বাতাসী বিনাথের বিরহে ইতিমধ্যেই কাতর

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়েছিল। বিনাথকে পেয়ে সে মহা খুশী। এরপর উভয়ে গৃহত্যাগী হয় এবং জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এদিকে সুমাই ওঝা বাতাসীর সন্ধানে বেরিয়ে বিনাথকে দেখতে পেল। সে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হ'ল। সে মন্ত্র পড়ে সর্প চালনা করল। বিনাথ সর্প দংশনে মারা গেল। বাতাসীর অনুরোধে সুমাই ওঝা চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারল না। বাতাসী বিনাথকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও আত্মঘাতিনী হ'ল। গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। এ গীতিকায় নারী চরিত্র আছে তিনটি- বাতাসী, তার মা ও সুজন্তী। সুজন্তী এখানে প্রতিনায়িকার ভূমিকায় এসেছে।

নুরন্নেহা কবরের কথা বা কবরের কান্না

'নুরন্নেহা কবরের কথা বা কবরের কান্না' গীতিকায়--- দেওগাঁর নজুমিয়া ছিল পাড়ার মাতব্বর। স্বচ্ছল ও ধর্মভীরু নজুমিয়া ধানের ব্যবসা করত। একবার ধানবোঝাই নৌকা নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাবার সময় নৌকাডুবি হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। মালেক তার একমাত্র পুত্র। পিতা-মাতাকে হারিয়ে বেচারা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। নজুমিয়ার সঙ্গে বিরোধ ছিল দেওগাঁর আজগরের। নজুমিয়ার মৃত্যুর পর সেই বিরোধের অবসান ঘটে। মালেকের জন্য আজগরের সহানুভূতি থাকায় ক্রমেই আজগরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে মালেক। আজগরের কন্যা নুরুন্নেসার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে মালেকের সঙ্গে। নুরুন্নেসার মাও মালেককে স্নেহ করত। একবার প্রচন্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে অন্যান্যদের সঙ্গে আজগর সর্বস্বান্ত হয়ে রংদিয়া চরে গিয়ে নূতন করে বসতি গড়ল। মালেকও জলোচ্ছ্বাসে দেওগাঁ ছাড়ে। দীর্ঘ সময় নানা স্থান ঘুরে মালেক রংদিয়ায় এসে উপস্থিত হয়। পূর্ব প্রণয়ী নুরুন্নেসার সঙ্গে সাক্ষাত হলে তারা পরস্পরকে দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। মালেক নুরুন্নেসাদের বাড়ীতেই থেকে যায়। আজগরের গৃহে একদিন হার্মাদরা হানা দিয়ে যথা সর্বস্ব লুট করে মালেক এবং নুরুন্নেসাকে সঙ্গে করে বেঁধে নিয়ে যায়। ঘটনাচক্রে বালুরচরে তাদের নৌকা এসে ভিড়লে জেলেদের সমবেত আক্রমনে হার্মাদরা পর্যুদস্ত হয়। মালেক এবং নুরুন্নেসা মুক্তি পেয়ে ফিরে আসে রংদিয়ায়। এদিকে মালেকের সঙ্গে নুরুন্নেসার প্রণয়ের সম্পর্ক উপলব্ধি করে একদিন আজগর মালেককে জানিয়ে দেয় যে, নুরুন্নেসাকে বিয়ে করা তার উচিত হবে না। কারণ মালেকের পিতা নজুমিয়া মালেকের মাকে তালাক দিলে আজগর তাকেই নিকা করেছে। তাই সম্পর্কে নুরুন্নেসা মালেকের এক মায়ের পেটের বোন। এ কথা শুনে মালেক মনের দুঃখে মাল্লাগিরির কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে মালেকের বিরহে মনের দুঃখে নুরুন্নেসা মুষড়ে পড়ে। এরপর বসন্ত রোগে একে একে আজগর তার স্ত্রী এবং নুরুন্নেসা মারা যায়। পাঁচ বছর পর মালেক রংদিয়ায় ফিরে এসে এসব শুনে শোকে দুঃখে ভেঙে পড়ে। তখন নুরুন্নেসার কবরের ওপর শুয়ে পড়লে মালেক শুনতে পায়- কবরের ভেতর থেকে নুরুন্নেসার আত্মা কাঁদছে। সে মালেককে দুঃখ করতে নিষেধ করে জানাল, মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য নুরুন্নেসার প্রাণ কাঁদে। এ ঘটনায় মালেক উন্মাদ হয়ে যায়। গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র আছে দুটি- নুরুন্নেসা ও মালেকের মা।

মাঞ্জুর-মা

'মাঞ্জুর-মা' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- কাণির বাড়ির মণির ওঝা তার বিদ্যায় এমনই পারদর্শী ছিল যে, মরা মানুষ পর্যন্ত তার চিকিৎসায় পুনর্জীবন লাভ করত। নির্লোভ চরিত্রের ওঝা রুগীর বাড়ীর কোন অর্থ- ভাত, এমনকি জল পর্যন্ত খেত না। বিনা পারিশ্রমিকে সে মানুষের উপকার করত। কিন্তু সে ছিল প্রচণ্ড নারী-বিদ্বেষী। তার ধারণা--- স্ত্রীরা নষ্ট জাতি, অবিশ্বাসী। ফলে তার আর বিয়ে করা হয়নি। একদিন ওঝা এক রুগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে তাকে নিরাময়ে ব্যর্থ হয়। তার ঘাড়ে চাপল মাঞ্জুর মাওয়ের দায়িত্ব। অনাথ মাঞ্জুর মাওকে আশ্রয় দিয়ে মণির ওঝা তার

Dhaka University Institutional Repository

মানবিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, অপত্যস্নেহে যে মাঞ্জুর মাওকে পতিপালন করেছে মণির ওঝা, শেষে মায়া থেকে মোহ তথা প্রেমে পড়েছে সেই মাঞ্জুর মাওয়ের। ঘোরতোর নারী বিদ্বেষী মনির ওঝাকে দিয়ে দার পরিগ্রহ করিয়ে কবি প্রকৃতির প্রতিশোধ গ্রহণ দেখিয়েছেন। মণির ওঝা নিজেও বুঝেছে তার বিশ্বাস এবং কর্মে মিল হচ্ছে না, তাই যুক্তি দেখিয়ে নিজেকেই নিজে সান্তনা দিয়েছে। মণির ওঝা মাঞ্জুর মাওয়ের প্রেমাসক্ত হলেও মাঞ্জুর মাও কিন্তু কোন মতেই মণির ওঝাকে তার স্বামী বলে মেনে নিতে পারেনি। মাঞ্জুর ছিল হাছেনের প্রেমাসক্ত। অতএব মণির ওঝার অনুপস্থিতিতে মাঞ্জুর মা-ও হাছেনের সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়েছে। মণির ওঝা মাঞ্জুর মাওকে গৃহে না পেয়েও তার চরিত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি। তার সন্দেহ---তার অনুপস্থিতিতে বলপূর্বক কেউ হয়তো মাঞ্জুর মাওকে অপহরণ করেছে। প্রিয়তমা মাঞ্জুর মাওয়ের বিরহে শেষ পর্যন্ত মণির ওঝা আত্মবির্জন দিয়েছে। গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে একমাত্র নারী চরিত্র- মাঞ্জুর মাও।

ছুরত জামাল অধুয়া সুন্দরী

'ছুরত জামাল অধুয়া সুন্দরী' পালায়--- বানিয়াচঙ্গে আলাল খাঁ এবং দুলাল খাঁ নামে দুই ভাই ছিলেন। গনক বড় ভাই দেওয়ান আলালকে জানাল, তিনি সুদর্শন এক পুত্রের অধিকারী হবেন কিন্তু সন্তানের জন্মের বিশ বছরের মধ্যে যদি পিতা তার মুখদর্শন করেন, তবে তাঁকে দু:খ ভোগ করতে হবে। দেশবাসী যদি পুত্রকে দেখতে পায়, তবে পুত্রেরই মৃত্যু হবে। একথা শুনে নাজির উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করে আলাল খাঁ তেড়ালেংড়ার সাহায্যে হাইলাবনে ফাতেমা বিবির জন্য এক প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। সেখানে বিবিকে অন্তরীন করে রাখা হল। স্থির হল ফাতেমা সন্তান প্রসব করা থেকে হাইলাবনে কুঁড়ি বৎসরকাল অবস্থান করবে। এতে আলাল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দেওয়ানির দায়িত্ব দুলালকে দিয়ে ফকির বেসে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ফাতেমা যথাসময়ে সন্তান প্রসব পরল। তার সঙ্গী বলতে এক দাসী ; এদিকে একদিন শিকারে গিয়ে দুলাল কাঠুরিয়া বালকদের সঙ্গে ছুরত জামালকে দেখতে পেল। দুলালের পরামর্শে জামালকে হত্যা করার জন্য তেড়ালেংড়া নিযুক্ত হ'ল। আলালের বৃদ্ধ উজির এতে উদ্বিগ্ন হয়ে স্বয়ং মণিব পত্নী ও মণিবপুত্রকে নিয়ে গিয়ে দুবরাজের কাছে রেখে এল। তেড়ালেংড়া দুলালের নির্দেশ মত ফাতেমা বিবির বাড়ী মাটি চাপা দিল।

জামাল কুঁড়ি বছর বয়সে লোক লস্কর নিয়ে হাইলার বনে তেড়ালেংড়াকে বন্দী করে বাইন্যাচঙ্গে হাজির হয়ে দেওয়ানী লাভ করে। সে তার মা ফাতেমাকে নিজের কাছে নিয়ে এল।

এদিকে দুবরাজ কন্যা অধুয়া সুন্দরী তাদের আশ্রিত জামালের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে যায়। জামাল যখন বাইন্যাচঙ্গের দেওয়ান, তখন তাকে সে লিখল প্রেমপত্র। তারা পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হয়। সে উজিরকে দিয়ে দুবরাজের কাছে তার সঙ্গে অধুয়ার বিয়ের প্রস্তাব দেয়। দুবরাজ বিয়েতে অসম্মতি জানায় এবং উজিরকে ভীষণ শাস্তি দেয়। এতে জামাল ক্ষিপ্ত হয়ে দুবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে।

এদিকে দেওয়ানগিরি হারিয়ে দুলাল মক্কায় উপস্থিত হয়ে জামাল সম্পর্কে নানা কথা বানিয়ে অভিযোগ করে তার বিরুদ্ধে আলালকে উত্তেজিত করে তুলে। আলাল পুত্রকে শাস্তি দিতে দেশে ফিরে পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবস্থান করলেন। জামাল পরাজিত ও কারারুদ্ধ হ'ল।

তারপর দুবরাজের পরামর্শে বন্দীপুত্র জামালকে আলাল দিল্লীতে বাদশাহের হয়ে যুদ্ধ করতে পাঠাল। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে জামাল অধুয়াকে একটি অঙ্গুরীয় এবং একটি পত্র প্রেরণ করল। কথা

Dhaka University Institutional Repository

ছিল জামাল যদি যুদ্ধ থেকে ফেরে তবে অধুয়াকে বিয়ে করবে। কিন্তু যুদ্ধে জামালের মৃত্যু হয়। আলাল খাঁ পুত্র শোকে কাতর হয়ে পড়লে বৃদ্ধ উজির তখন তাকে সব কথা খুলে বলে। আলাল খাঁ তার ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ঘোড়ার সহিসের সঙ্গে অধুয়ার বিয়ে দেবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু অধুয়া তার পূর্বেই আত্মঘাতিনী হয়। পুনরায় দুলালকে বাইন্যাচঙ্গের দেওয়ানগিরি দিয়ে আলাল মক্কায় ফিরে যায়। গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। গীতিকাটিতে নারী চরিত্র আছে তিনটি- অধুয়া সুন্দরী, ফাতেমা বিবি ও দাসী।

কাঞ্চন মালা

'কাঞ্চন মালা' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- কাঞ্চন মালা পরীর রাজসভায় নৃত্য করার সময় তার তাল ভঙ্গ হয়ে যায়। পরীর রাজা তাকে অভিশাপ দেয়--- কাঞ্চন মালা মানুষের গৃহে জন্ম নেবে। ঠিক তাই-ই হ'ল। কাঞ্চনমালা ভরাই নগরে সাধু সওদাগরের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করল। সওদাগরের কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খেয়ে সওদাগর পত্নী গর্ভবতী হ'ল। কাঞ্চনমালা দেখতে দেখতে নয় বছরে পদার্পণ করল। সওদাগর শত চেষ্টা করেও তাকে পাত্রস্থ করতে পারলনা। নয় বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র অর্ধদণ্ড বাকী। তখন সাধু প্রতিজ্ঞা করল--- "এর মধ্যে যার মুখ দেখিবাম কাছে / তার কাছে দিবাম কন্যা কপালে যা আছে।" এমন সময় এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ছয় মাসের এক অন্ধ শিশুকে নিয়ে সওদাগরের কাছে সঁপে দিল। অগত্যা এই অন্ধ শিশুর সঙ্গেই কাঞ্চন মালার বিয়ে হ'ল। পিতা হয়ে কন্যাকে নির্মমভাবে দায়িত্বভার দিয়ে সওদাগর বলল--- "আজি হইতে এই পুত্র লালন কর তুমি / কপালে আছিল তোমার অন্ধ ছাওয়াল স্বামী।" অন্ধ শিশু স্বামীকে নিয়ে কাঞ্চন মালা গৃহত্যাগিনী হয়। পথিমধ্যে তাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বনমধ্যে সে বৃক্ষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে দাড়াক বৃক্ষ থেকে এক সন্ন্যাসী বের হয়ে আসেন। তিনি কাঞ্চন মালাকে একটি ফল দিয়ে তার ছেলেকে সেটি খাওয়াতে বললেন--- কাঞ্চন মালা সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খাইয়ে শিশুটিকে চক্ষুষ্মান করে তুলল। এরপর কাঞ্চন মালা ঘুরতে ঘুরতে এক কাঠুরিয়ার গৃহে আশ্রয় পেল। এখানে তার ছয় বছর কেটে যায়। এক রাজা বনে শিকার করতে এসে কুমারের কপালে রাজটীকা দেখে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তখন কাঞ্চন মালা গিয়েছিল কাঠ আনতে। গৃহে ফিরে কুমারকে না দেখে সে আকুল হয়ে পড়ে এবং স্বামীর সন্ধানে বেরিয়ে যায়। দীর্ঘ ছয় বছর খোঁজা খুজির পর সে সুমাই নগরের রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে আসে। রাজকন্যা কুঞ্জমালার একজন দাসীর প্রয়োজন। কুঞ্জমালার স্বামীই কাঞ্চন মালার অভিলষিত কুমার। কাঞ্চন মালার স্বামী তার প্রকৃত পরিচয় জানত না। তবুও কুঞ্জমালার কাছে তার বনবাস জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতিচারণ করেছে। তখন কুঞ্জমালা কুমারকে দিয়ে কাঞ্চনমালার একটি ছবি আঁকিয়ে নেয়। ফলে কাঞ্চনমালাকে দাসী রূপে পেয়ে কুঞ্জমালা তাকে ঠিকই চিনে নিল। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল কুঞ্জমালা। কাঞ্চনমালাকে কাছে পেয়ে রাজপুত্র কুঞ্জমালাকে অবহেলা করতে শুরু করল। কুঞ্জমালার প্ররোচনায় এক সময় রাজকুমার নিরুপায় হয়ে কাঞ্চন মালাকে বনবাসে দিল। বনবাসে ছয়মাস অতিবাহিত হলে হঠাৎ কাঞ্চনমালার সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে। সন্ন্যাসী কাঞ্চন মালাকে বৃক্ষমধ্যে আশ্রয় দিলেন। মাত্র নয় দিনের মধ্যেই সন্ন্যাসী বনমধ্যে এক সমৃদ্ধ নগরী গড়ে তুললেন এবং ঘোষণা করলেন--- "নয়া নগরে কন্যা সুবর্ণ পরতিমা / যোগ্য দিনে এই কন্যা হবে স্বয়ম্বরা।" কিন্তু শর্ত হ'ল কন্যা অর্ধেক গান গাইবে, যে বাকী অর্ধাংশ পূরণ করতে পারবে, কন্যা তারই পরিগ্রহণ করবে। সাতরাজ্যের রাজপুত্ররা ফিলে গেল। শেষে এক অন্ধ ভিক্ষুক কাঞ্চনমালার গানের অর্ধাংশ পূরণ করল। দু'জনই তখন দু'জনকে চিনতে পারল। কাঞ্চন মালা অন্ধ স্বামীর পদসেবা করতে লাগল। সন্ন্যাসী জানালেন, কাঞ্চন মালা যদি চিরকালের মত তার স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারে, তবেই তার স্বামী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কাঞ্চন মালা এতে রাজী হ'ল। সন্ন্যাসীর পরামর্শে কাঞ্চন মালা

Dhaka University Institutional Repository

মায়াকাঠি নিয়ে পিতৃরাজ্যে ফিরে গেল। কিন্তু সেখানে গোল দেখা দিল কাঞ্চন মালার সতীত্ব নিয়ে, কারণ সে দীর্ঘদিন দেশত্যাগিনী ছিল। অতএব, তাকে চরিত্র পরীক্ষা দিতে হবে। স্থির হ'ল একটি মাকড়সার সূতা ধরে কাঞ্চন মালাকে শূণ্যে ঝুলতে হবে। সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কাঞ্চন মালার পরিণতি হ'ল অভাবনীয়--- কাঞ্চন মালা মাকড়সা ধরে উপরে উঠতে উঠতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এটি একটি করুণ রসের গীতিকা। এতে নারী চরিত্র আছে তিনটি- কাঞ্চনমালা, কুঞ্জমালা ও সওদাগর পত্নী। কুঞ্জমালা এখানে প্রতিনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মইষালবন্ধু-সাঁজুতী কন্যা

'মইষালবন্ধু-সাঁজুতী কন্যা' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- বলরামের গৃহে অবস্থানকালে ডিঙ্গাধরের বংশী বাজানোয় মুগ্ধ হয়ে বলরামের একমাত্র কন্যা সাঁজুতী তার প্রেমাসক্ত হয়। এদিকে কাজে গাফিলতির কারণে বলরামের সাজা হয়। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্থির হয় যদি বলরাম তার সুন্দরী কন্যা সাঁজুতীকে এনে দেয়, তবে তার জরিমানা মওকুফ করা হবে। জমিদারের কাছে মহিষ, মইষাল, চাকর জামিন রেখে বলরাম মুক্তি পেল। বলরাম আষাঢ় মন্ডলের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ করে জরিমানা মেটায়। মুক্তি পায় ডিঙ্গাধর। কিন্তু সে আর বলরামের গৃহে ফিরে আসে না। বলরামের কন্যা সাঁজুতী ডিঙ্গাধরের বিরহে উন্মাদিনী হয়ে পড়ে।

বণিক মারা গেলে ডিঙ্গাধরের অবস্থা ফিরে যায়। ডিঙ্গাধর সাতডিঙ্গা ধন লাভ করল। দীর্ঘ দুই বছর পর ডিঙ্গাধর সুনাই নদীর পাড়ে বসে বাঁশী বাজালে সাঁজুতী তা শুনতে পায়। ঘটকের মাধ্যমে যখন সাঁজুতীর সঙ্গে ডিঙ্গাধরের বিয়ের কথাবার্তা চলছে এমন সময় মঘুয়া নামে এক ধূর্ত বণিকের সঙ্গে ডিঙ্গাধরের পরিচয় হল। মঘুয়ার পরামর্শে ডিঙ্গাধর তার দেশে ফিরে এল এবং সাঁজুতীর সন্ধানে বলরামের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। শুনল বলরাম মারা গেছে। সাঁজুতী ও তার মায়ের চরম আর্থিক অবস্থা। ডিঙ্গাধর সাঁজুতীর বিয়ের ব্যাপারে এক ঘটক প্রেরণ করল। সাঁজুতীর মা জানাল আষাঢ়ের পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ না করতে পারার জন্য তার পুত্রের সঙ্গে সাঁজুতীর বিয়ে দিতে হবে। টাকা পরিশোধের আর মাত্র সাতদিন বাকী। আষাঢ় মণ্ডলের সমস্ত ঋণ ডিঙ্গাধর শোধ করে দেয়। তার সঙ্গে সাঁজুতীর বিয়ে হয়। একদিন মঘুয়া সাঁজুতীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সাঁজুতীকে করায়ত্ব করার চক্রান্ত করে। মঘুয়া ডিঙ্গাধরকে বাণিজ্য যাত্রায় প্রলুব্ধ করে। উভয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে দীর্ঘ ছয় বছরেও মঘুয়া গৃহে ফিরে না আসায় মইষাল মঘুয়ার ভাগিনী ময়নাকে বিয়ে করে। ছয় বছর পর মঘুয়া ফিরে এসে সব দেখেশুনে ক্ষুব্ধ হয় এবং চট্টগ্রামের কাঙ্গুরাজার কাছে ডিঙ্গাধরের বিরুদ্ধে নালিশ করে। কাঙ্গুরাজাকে সে সাঁজুতীর অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পর্কে ও অবহিত করে। কাঙ্গুরাজা তখন মইষালকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দেয়। ময়না কাঙ্গুরাজের পাইকদের হাতে ধরা দিল। সাঁজুতী তার একমাত্র সন্তানকে ডিঙ্গাধরের হাতে তুলে দিয়ে ভৃত্যের বেশে ঘাটে রাখা নৌকার সাহায্যে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার পরামর্শ দিয়ে নিজের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে আত্মহনন করল। এটি বিয়োগান্তক গীতিকা। এ গীতিকায় নারী চরিত্র তিনটি- সাঁজুতী, সাঁজুতীর মা, ময়না। এখানে ময়না প্রতিনায়িকা হিসেবে এসেছে।

শান্তি কন্যার হাঁহলা

'শান্তি কন্যার হাঁহলা' গীতিকায়--- গুণধর বণিকের কন্যা শান্তির সঙ্গে আরেক বণিকের পুত্র সুন্দরের বিয়ে হয়। বিয়ের পরই সুন্দর তার পিতার সঙ্গে বাণিজ্যে যায়। দীর্ঘ সময় ব্যবধানে সুন্দর ফিরে আসে। তারা দুজনই তখন যৌবনে পদার্পন করেছে। সুন্দর আত্মগোপন করে দীর্ঘ এক

Dhaka University Institutional Repository

বৎসরব্যাপী শান্তিকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছে। কিন্তু শান্তি তার সতীত্ব অটুট রেখে পরিচিত সুন্দরের কোন প্রস্তাবেই সম্মতি দেয়নি। ছদ্মবেশী সুন্দরের মিলনের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে। শেষ পর্যন্ত শান্তি তার কঠিন চরিত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সুন্দর তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করল। তখন উভয়ের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সুন্দর যখন শান্তিকে বলেছে যে বৈশাখেও সে তার নবযৌবন কাউকে দান করল না, শান্তি তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়--- "ক্ষেতের তরমুজ নয় রে সাধু / আমি কাইট্যা বিলাইব / কোলের পোলা নয় রে আমি / এই না দুগ্ধ পিয়াইব।" শান্তির নিজের সতীত্বের উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সে তা ঠিকই জানতে পারত বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই সুন্দর যখন মিথ্যা করে বলেছে যে, কাঞ্চনপুরের ভাটিতে শান্তির স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, তখন শান্তি অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে বলে--- "রাম লক্ষণ দুইডা শঙ্খ / আমার ভাইঙ্গা হইত চুর / আস্তে আস্তে মৈলাক হইত / আমার সিন্থার সিন্দুর ॥" শেষ পর্যন্ত যখন সুন্দর তার পরিচয় দিয়েছে, তখনও শান্তি তা বিশ্বাস করেনি। সে গৃহে ফিরে এসে মা-বাবাকে সব জানিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চেয়েছে সত্যিই অপরিচিত যুবকটি তার স্বামী কিনা সে বিষয়ে। দীর্ঘ এক বছর যাবৎ সুন্দর যেভাবে তার স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করেছে, তাতে তার অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে শান্তিকে সে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। এটি একটি মিলনাত্মক গীতিকা। এখানে নারী চরিত্র আছে দুটি- শান্তি ও শান্তির মা।

আমিনাবিবি ও নছরমালুম

'আমিনাবিবি ও নছরমালুম' গীতিকায়--- গরীব ঘরামী (ঘর মেরামতকারী) হায়দর তার একমাত্র কন্যা আমিনাকে পিতৃ-মাতৃহীন ভাগিনা নছরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের কাছেই রেখেছিল। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর নছর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ কেউ নছরের সাক্ষাৎ পেল না। এদিকে আমিনার সৌন্দর্য দেখে দুশ্চরিত্র এছাক তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠে। নানা রকম প্রলোভন ও তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েও আমিনাকে বশীভূত করতে না পেরে আমিনার পিতার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিল। আমিনা যখন বুঝল এছাকের সঙ্গে তার পিতারও যোগ রয়েছে তখন সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ইলসাখালির দয়ালু গফুর মিয়ার বাড়ি আশ্রয় নিল। আশি বছরের বৃদ্ধ গফুর ছিল নিঃসন্তান। তার স্ত্রীও ছিল অন্ধ। আমিনার দুঃখের বিবরণ শুনে তাকে সন্তান স্নেহে গ্রহণ করে গফুর। পরিবর্তে সংসারের সব দায়িত্ব আমিনা একে একে নিজের হাতে তুলে নিল। এদিকে দীর্ঘ সাত বছরের নিখোঁজ নছরের সন্ধান মেলে এভাবে--- নছর প্রথমে ছিল জাহাজের লস্কর (জাহাজের খালাসী) পরে লস্কর থেকে হল মালুম (বাতাসের গতি নির্ধারক) অঙ্গী শহরে মাফো নামে এক মাতব্বরের সুন্দরী কন্যা এখিনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে সংসারী হয়। কিছুদিন পর 'লাউখ্যা' নামের শুটকি মাছ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ সাগরের চরে অবস্থিত করীদিয়ায় উপস্থিত হয়। এখান থেকে সে হাজির হয় হায়দরের বাড়ী। ততদিনে তার শ্বশুর হায়দরের মৃত্যু হয়েছে। আমিনার মা ভিক্ষা করে। আমিনার দেখা পেল না নছর। সকলের কাছে আমিনার দোষ শুনতে পেল। নছর আবার মোকামে ফিরে যেতে চাইল। গোবধ্যার চরে হার্মাদদের হাতে তার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। এরপর হার্মাদরা নছরকে বিক্রি করে দেয়। নছর তার মালিকের নৌকা নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিপদে পড়লে জেলেরা উদ্ধার করে। বছর খানেক পর অঙ্গী শহরে ফিরে এখিনের অন্যত্র সাদী হয়ে সাওয়ার সংবাদ শুনে আমিনার খোঁজে ফিরে গেল নিজের দেশে। এদিকে বৃদ্ধ গফুরের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসায় আমিনাকে পুনরায় বিয়ে দেয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু আমিনা কিছুতেই রাজী না হওয়াতে বৃদ্ধ গফুর নিজের সব সম্পত্তি তাকে দিয়ে মারা

Dhaka University Institutional Repository

গেল। এই সংবাদ এছাক জানতে পেরে আমিনার মাকে ভুলিয়ে মেয়ের কাছে পাঠাল। মাকে আমিনা নিজের কাছেই রাখল। আমিনার মায়ের সঙ্গে চক্রান্ত করে এছাক আমিনাকে গভীর রাতে নিদ্রিত অবস্থায় মুখ বেঁধে চুরি করে। এছাক যখন বলপূর্বক আমিনার সতীত্ব হরণে উদ্যত ঠিক তখনই সেখানে উপস্থিত হ'ল নছর। সে এছাককে আহত করে আমিনার সতীত্ব রক্ষা করল। দীর্ঘ দশবছর পর আবার উভয়ের মিলন হ'ল। এটি একটি মিলনাত্মক গীতিকা। এখানে নারী চরিত্র আছে চারটি- আমিনা, আমিনার মা, গফুরের স্ত্রী ও এখিন। এখিন প্রতিনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ভেলুয়া সুন্দরী ও আমীর সাধু

'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমীর সাধু' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- শাফ্‌লা বন্দরের মালিক মানিক সওদাগরের পুত্র আমীর সাধু শিকার করতে গিয়ে তেলেন্যা নগরের মনুহর সওদাগরের একমাত্র সুন্দরী কন্যা ভেলুয়াকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এল। সাত ভাইএর একমাত্র বোন ভেলুয়া দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। এই সৌন্দর্যের প্রতিহিংসা বিভলার মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারণ আমীর সাধুর বড় বোন বিভলা দেখতে খুব কুৎসিত ছিল। পাণ্ডুবর্ণ, দেহখানি রক্ত নাহি তায় / পুরুষের মত কেশ হাত আর পায়।" বিশ বছর বয়সেও কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। অত্যন্ত নির্মম স্বভাবের বিভলা ভেলুয়ার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। "খুশী হইল সওদাগরের পাড়াপড়শী জন/ রিষেতে জ্বলিল হায়া রে বিভলার মন।" তাই কারণে-অকারণে, দোষ-ত্রুটি ধরে মানসিক ভাবে জ্বালা-যন্ত্রণা ও আক্রোশের ফলে ভেলুয়া বিভলার নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। এক সময় বাণিজ্যের কারণে আমীর সাধু বিদেশের পথে যাত্রা করে। কিন্তু ভাগ্য চক্রে চারদিন পর দিকভ্রষ্ট নৌকা যখন পুনরায় ঘাটেই ফিরে আসে তখন আমীর স্বীয় লজ্জা গোপন করতে কাউকে না জানিয়ে ভেলুয়ার ঘরে রাত্রি-যাপন করে পরদিন ভোর না হতেই সবার অলক্ষ্যে গন্তব্যের দিকে যাত্রা করে। দিক ভুল করে আমীর সাধু ঘাটে ফিরে আসে এবং ভোর না হতে ভুল করে ভেলুয়ার ঘরের দরজা অজান্তে খোলা রেখে চলে যাওয়ার মাশুল দিতে হল ভেলুয়াকে। ভেলুয়ার আত্মচিৎকার এবং ক্রন্দনে তার প্রতি কারও বিশ্বাস জন্মাল না বরং অপবাদ, অবিশ্বাস আর সন্দেহের বোঝা কাঁধে তুলে দিল। "ভেলুয়া কহিল কান্দি মাথা নোয়াইয়া / সোয়ামী মোর আইসাছিল কালুকা রাতুয়া / কোরান দেও কিতাব দেও খোদার নামে কই / এক সোয়ামী বিনে আমি ন' জানম দুই ॥" এরপর সামাজিক ও পারিবারিকভাবে তাকে অপদস্ত করা হয়। "ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন শাশুড়ী মোনাই, ভেলুয়ারে রাখাল বাহির কামুলী বানাই ॥"। পরবর্তীতে একদিন নদীর ঘাটে সুন্দরী ভেলুয়াকে দেখে ভোলা সওদাগরের মন্দ বাসনা জাগ্রত হয়। ভেলুয়ার রূপলাবণ্য আরেক বার তাকে অন্য পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত করে। ভেলুয়া প্রথমে ননদিনী বিভলার যন্ত্রণার শিকার হয়। পরে ভোলা সওদাগরের লালসার ফাঁদে পড়ে মুক্তির পথ খুঁজে। অবশেষে বৃদ্ধ মুনাফ কাজির লোভাতুর দৃষ্টির যন্ত্রণা এড়াতে গিয়ে আমরণ অনশনের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করেছে। ভেলুয়া সুন্দরী গীতিকাটি বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র আছে তিনটি- ভেলুয়া সুন্দরী, বিভলা ও শাশুড়ী মোনাই।

আন্ধা বন্ধু

'আন্ধাবন্ধু' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- এক নি:সন্তান রাজার অধিক বয়সে এক পুত্র সন্তান জন্মে। রাজার কণিষ্ঠ ভ্রাতার আশা ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর সেই সিংহাসনে বসবে। কিন্তু ভ্রাতুস্পুত্র হওয়ায় স্বভাবতই কণিষ্ঠ রাজভ্রাতা নিরাশ হয়। রাজকুমারের যখন মাত্র দু'বছর বয়স, তখন দস্যুদের দ্বারা সে অপহৃত হয়। রাজা যখন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন সন্তানের উদ্ধারের আশায়, দস্যুরা তখন বহুদূর পালিয়ে যায়। এবং শিশুর দু'টি চোখ নষ্ট করে দেয়। তখন এক ব্যাধ বনে

Dhaka University Institutional Repository

শিকার করতে এসে শিশুটির কান্নায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে তোলে। ব্যাধ জানতে পারে, এই শিশুটি অপহৃত রাজকুমার। কিন্তু তার ভয় হ'ল, রাজকুমারের চক্ষু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে যদি রাজা তাকেই দায়ী করেন এই ভয়ে একদিন ব্যাধ শিকার করতে গিয়ে আর ফিরে এল না। তখন রাজকুমারের বয়স বারো বৎসর। এদিকে ব্যাধ পত্নী স্বামীর সন্ধানে গিয়ে সেও আর ফিরল না। এভাবে রাজকুমার 'আন্ধাবন্ধু' নামে পরিচিতি লাভ করে। অপূর্ব বাঁশী বাজিয়ে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে। রাজকুমারের বাঁশী শুনে এক রাজকন্যা তার প্রেমাসক্ত হয়েছে। রাজাও সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে প্রাসাদের সমস্ত রাজৈশ্বর্য ভোগের অধিকার দিয়েছেন। দায়িত্ব দিয়েছেন বাঁশী বাজিয়ে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করবে এবং রাজকন্যাকে বাঁশী বাজানো শেখাবে। রাজকুমার প্রসন্নমনেই সে দায়িত্ব পালন করছিল। কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারল রাজকন্যা তার প্রেমে আসক্ত তখনই সে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যায়। কারণ সে চায়নি তার বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজকন্যার জীবন নষ্ট হোক। যথাসময়ে রাজকন্যার সুপাত্রে বিয়ে হলেও দীর্ঘদিন পর পুনরায় তার পরিচিত বাঁশীর শব্দ শুনে অন্ধ রাজকুমারের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাকে গৃহে ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েও যখন রাজকুমার ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে প্রথমে বাঁশীটি নদীতে ফেলে দেয়, তাতেও কন্যার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হওয়ায় সে নিজেই জলে ঝাঁপ দেয়। সেই সঙ্গে রাজকন্যাও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র দুটি- রাজকুমারী ও ব্যাধ পত্নী।

কমল সওদাগর

'কমল সওদাগর' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- বাসন্তীনগরে কমল সওদাগরের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার। স্ত্রী সুরঙ্গনা, চান্দমনি ও সূর্যমনি দুই পুত্র, বিশ্বস্ত মুহুরী গোবর্ধন আপন ভাই এর মতই পরিবারের সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করত। মইফুলা ছিল মমতাময়ী দাসী যার স্নেহ আদর সওদাগরের পুত্র দুটিকে আগলে রেখেছিল। আকস্মিক স্ত্রী বিয়োগে সওদাগরের সংসারে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শিশু দুটির ভবিষ্যৎ ভেবে সকলের অনুরোধে পুনরায় বিয়েতে সম্মতি দিলেন। কিছুদিন পর ধরমপুর গ্রামের বানিয়া ধর্ম্মমণির কন্যা সোনাইকে বিয়ে করলেন বটে। কিন্তু তার মন পাননি। সোনাই এর দু:খ--- "এতেক ফাল্গুন মাস বুকে আগুন জ্বলে / ঘরে রইছে বির্দ্ধ সোয়ামী কথা নাই সে বলে ॥" ক্রমান্বয়ে সোনাই এর মতিভ্রম হ'ল এবং সে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়। সহজ সরল কমল সওদাগর কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। একদিকে যৌবনের অতৃপ্ততা অন্যদিকে সতীন পুত্রদ্বয়ের কারণে সম্পদ হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় বিচলিত সোনাই সুদর্শন মুহুরী গোবর্ধনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করল। এক সময় গোবর্ধনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশু দুটিকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রথমে স্বামীকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করেছে। অনোন্যপায় হয়ে সওদাগর গোবর্ধন ও মইফুলার হাতে ছেলে দু'টিকে সঁপে দিয়ে বিদেশ যাত্রা করে পরিবারিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরে এসে গোবর্ধনের বিশ্বাস ঘাতকতা সোনাইয়ের অবৈধ ক্রিয়াকলাপ এবং সতীন পুত্রদের হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে গোবর্ধনকে বন্ধন করার নির্দেশ দেয় সওদাগর। অত:পর সোনাইকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে নিজে আত্মঘাতী হতে উদ্যত হলে পুত্ররা তাকে রক্ষা করে। এ গীতিকার কাহিনী বিয়োগান্তক। এখানে নারী চরিত্র আছে তিনটি- সোনাই, সুরঙ্গনা ও মইফুলা।

রঙ্গমালা সুন্দরী চৌধুরীর লড়াই

'রঙ্গমালা সুন্দরী চৌধুরীর লড়াই পালা'য়--- সিন্দুরকাইত পরগণার নায়ক রাজচন্দ্রের পিতা প্রতাপ নারায়ন চৌধুরী। পিতৃ বিয়োগের পর খুড়া রাজেন্দ্রনারায়নের তত্ত্বাবধানে রাজচন্দ্র লালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত লম্পট প্রকৃতির রাজচন্দ্রকে তার অন্যায়কর্মে সহায়তা করত রামভাড়ালী। রাজচন্দ্র এক সময় রঙ্গমালা নামে এক নর্তকীর প্রেমে পড়ে ভয়ানক জ্ঞাতি বিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন। রঙ্গমালার পিতার ইচ্ছায় বিশাল জলাশয় খনন করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের সঙ্গে রঙ্গমালার সম্পর্কের কথা জেনে দু:খিত হন রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। শেষ পর্যন্ত চাঁদভাড়ালীর কারণে রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে রাজচন্দ্রের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। রঙ্গমালার শোচনীয় মৃত্যু হ'ল। রাজতন্ত্র রঙ্গমালার ইচ্ছানুযায়ী তার শেষকৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করে। গীতিকাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। রঙ্গমালা এর একমাত্র নারী চরিত্র।

বগুলার বারমাসী

'বগুলার বারমাসী' গীতিকায়--- কৈশোরকালের সহাপাঠী সওদাগর কন্যা বগুলা ও আর এক সওদাগর পুত্রের প্রেম সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে পল্লবিত হয়। কালে বগুলা অপূর্ব শ্রীময়ী হয়ে উঠলে এক রাজপুত্র তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বগুলা তাতে সম্মত হয় না। সে ভালবাসত সহপাঠী সওদাগর পুত্রকে। পরিবারের সমর্থনে তার মনোনীত বণিক পুত্রকেই সে বিয়ে করল। কিছুকাল পর আকস্মিকভাবে তাদের সুখের দাম্পত্য জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। কৌশলে বণিকপুত্রকে বাণিজ্যে পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যত রাজপুত্র বগুলাকে নিজের কুক্ষিগত করার জন্য পত্রের মাধ্যমে আহবান জানায়। রাজপুত্রের দ্বারা স্বামীর কোন ক্ষতি যেন না হয়, সে কারণে চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় বগুলা। ব্রতানুষ্ঠানের ছুতা দেখিয়ে সে রাজকুমারের মিলনের প্রস্তাবকে এড়িয়ে যেত। তখন দ্বিমুখী মানসিক সংঘাতে পতিত হয় বগুলা। একদিকে সমাজ ও পরিবার-পরিজন, অন্যদিকে দাম্পত্য প্রেম ও প্রলোভন। একদিকে সে স্বামীর মঙ্গলকামনায় ব্রতপালন করেছে, অন্যদিকে রাজকুমারের জৈবিক লালসার হাত থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছে প্রতারণার আশ্রয়ে। এক পর্যায়ে রাজকুমার জানাল সে সওদাগর পুত্রকে বন্দী করেছে এবং তাকে সে বলী দেবে। বগুলা তার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্খায় রাজপুত্রের কাছে যাওয়ার সম্মতি জানিয়ে তাকে চৌদোলা পাঠাতে লিখে দিল। ঘটনাচক্রে সেই চিঠি পড়ে বগুলার ননদের হাতে, ননদ ও শাশুড়ী বগুলার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে গৃহে বন্দী করল। এদিকে সওদাগরপুত্র বাণিজ্য শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে বগুলার স্বহস্তে লিখিত পত্র সে দেখতে পায় এবং সেও বগুলার চরিত্রে সন্দিগ্ধ হয়। শাস্তিস্বরূপ বগুলাকে নির্বাসন দেয়া হয় এক শূণ্য নদীর চরে। এখান থেকে তাকে এক রাজকুমার বিয়ে করার অভিপ্রায়ে নিয়ে যায়। বগুলা রাজকুমারকে জানাল তাকে ব্রত উদযাপন করতে হবে এবং সেজন্য একজন সুলক্ষণ সাধুর প্রয়োজন। রূপমুগ্ধ রাজপুত্র বগুলার কথামত তার ব্রতের আয়োজন করার নির্দেশ দিল। সবকিছু পাওয়া গেলেও সাধুপুত্র কিছুতেই যোগাড় হ'ল না। সবাইকে বন্দী করে রাখা হ'ল। অবশেষে একদিন সওদাগর পুত্রও বন্দী হ'ল। অন্যান্য সাধু পুত্রদের মুক্তি দিয়ে বগুলা গভীর রাতে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেল। পালাটির কাহিনী মিলনাত্মক।। এতে নারী চরিত্র আছে তিনটি- বগুলা, তার ননদ ও শাশুড়ী।

আয়নাবিবি

'আয়নাবিবি' গীতিকার কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- আয়না ও উজ্জ্যাল মামুদের প্রেম পরিণয়ে রূপলাভ করে। স্বামীর বিদেশে দুর্ঘটনার সংবাদ জানতে পেরে আয়না বিচলিত হয় এবং সারা রাত স্বামীকে খুঁজে ফিরেছে পথে-প্রান্তরে। বাণিজ্যের কারণে উজ্জ্যাল মামুদের নিখোঁজ সংবাদ আয়নাকে একরকম ঘরছাড়া করল। উদভ্রান্তের মত তাকে নদীর আশেপাশে ঘুরতে দেখে এক বৃদ্ধ সওদাগর তাকে কন্যা সম্বোধন করে এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা জানতে পারে। তখন সে দয়াপরবশ হয়ে আয়নাকে সাথে করে গৃহে নিয়ে আসে। সুজন সওদাগর তার সাত পুত্রকে পাঠাল উজ্জ্যাল মামুদের খোঁজে। এক

Dhaka University Institutional Repository

মাস ধরে খোঁজ করে গারোদের এক গৃহে উজ্জ্যালের খোঁজ পেল। কালাজ্বরে অসুস্থ মামুদ উজ্জ্যালকে নিয়ে আয়না বাড়ী ফিরে এল। সেবা যত্নে সুস্থ হয়ে যেদিন মসজিদে নামাজ পড়তে যায় সেদিন--- "মোল্লা মৌলানা তারে কহিল ডাকিয়া / তোমার বিবি অসতী হইল রাইতে ঘরত্ ছাড়িয়ে / এই নারী না রাখবা তুমি আপন ঘরে / খেদাইয়া দেও তারে দূর দেশান্তরে।" সমাজ তাকে একঘরে করে রাখার ভয়ে উজ্জ্যাল নিরুপায় হয়ে আয়নাকে বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার নাম করে এক গভীর জঙ্গলে রেখে এল। সেখানে স্বামীর প্রতীক্ষায় সারাদিন থাকার পর নিজেই স্বামীকে খুঁজতে বের হ'ল পাছে কোন দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করে। বহু খোঁজাখুজির পর এক কুরুঞ্জিয়া নারীর সহায়তায় দুই বৎসর পর স্বামীর গৃহ চান্দের ভিটায় যায়। সেখানে গ্রামের ঘাটে আসা বধূদের কাছে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে এবং পুত্র সন্তান লাভের কথা জানতে পারে। স্বচক্ষে দেখার জন্য একদিন সে ছদ্মবেশে তার অতিচেনা গৃহে গমন করে। ছদ্মবেশে যাওয়ায় স্বামী, ননদ, শাশুড়ী কেউ তাকে চিনতে পারেনি। মনের দু:খে সেখান থেকে ফিরে এসে আয়না নিজেকে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিল। ... ... "আষাঢ়িয়া তোড়ের নদী ঢেউয়ে ভাইস্যা যায় / কাঞ্চা সোনার তনু কন্যা হায়রে জলেতে ভাসায়।" পালাটির কাহিনী বিয়োগান্তক। এতে নারী চরিত্র আছে কয়েকটি। আয়না, কুরুঞ্জিয়া নারী, ননদ, শাশুড়ী এবং গ্রামের বধূরা।

ধোপার পাট

'ধোপার পাট' গীতিকায় কাহিনী বর্ণনায় দেখা যায়--- রাজপুত্র ধোপার (গোধা) মেয়ে কাঞ্চনমালার রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করে। চতুর্দশী অপরূপ সুন্দরী কাঞ্চনমালা রাজকুমারের প্রেমে প্রথমত সাড়া না দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে বলেছে-- "তোমার না বাপ মাও রাজ্যের না রাজা / বাপের ধোপা আমার বাপ তোমার বাপের পরজা / চান্দ হইয়া কেন জমিনে বাড়াও হাত / লোকে যে বলিবে মন্দ শুনিয়া পরছাৎ।" রাজকুমারকে বাধাদানের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত নিজের অজান্তে কাঞ্চনমালা রাজপুত্রের প্রেমে ধরা দিয়েছে। এই প্রেমের আকর্ষণেই পিতা-মাতার পরিচিত পরিবেশ- ত্যাগ করে রাজপুত্রের হাত ধরে ঘর ছাড়া হয়েছে। পরবর্তীতে অন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়ে সেই রাজ্যের রাজার ধোপার মাধ্যমে ঐ রাজ্যের রাজকন্যা রুক্মিণীর সঙ্গে তারা পরিচিত হয়। রুক্মিণী কৌশলে কাঞ্চনকন্যার কাছ থেকে রাজকুমারকে নিজের আয়ত্তে এনে তাকে বিয়ে করেছে। রাজকুমারের আশায় পথ চেয়ে শেষে নিরাশ হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসে কাঞ্চনকন্যা। তার প্রেমিক রাজকুমারের বিবাহিত জীবনের কথা জানতে পেরে একদিন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে স্বচক্ষে দেখেছে রাজকুমার ও রুক্মিণীকে। এমন বিশ্বাসঘাতকতা সে সহ্য করতে পারেনি। যে রাজকুমার কথা দিয়েছিল তার যথাসর্বস্ব দিয়ে ধোপার কন্যার পানিগ্রহণ করবে--- সেই তাকেই দেখা গেল দিব্বি রুক্মিণীকে পেয়ে অবলীলাক্রমে ধোপার কন্যাকে বিস্মৃত হতে, তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে। দেখা গেল, রাজকুমার ধোপার কন্যাকে তিন মাসের জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে বলে রুক্মিণীকে বিয়ে করে নিজের দেশে ফিরে সুখে দাম্পত্য জীবন যাপনে রত হয়েছে। ফলে কাঞ্চনমালা এই অপঘাত সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে হৃদয়ের জ্বালা জুড়িয়েছে। এর কাহিনী বিয়োগান্তক। নারী চরিত্র তিনটি- ধোপাকন্যা কাঞ্চনমালা, রাজকন্যা রুক্মিণী ও ধোপানী।

পরীবানু বেগম

'পরীবানু বেগম' গীতিকায় দেখা যায় যে --- রাজহারা বিড়ম্বিত ভাগ্যের অধিকারী সুজা বাদশাহের জীবনের শেষ কয়েকটি দিন বর্ণিত হয়েছে। লড়াইয়ে পর্যুদস্ত সুজা স্ত্রী কন্যাসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হলেন। তাঁরা আশ্রয় পেলেন রোসাঙ্গের রাজার কাছে। কিন্তু কাল হ'ল সুজা পত্নী পরীবানু বেগমের রূপৈশ্বর্য। একদিন রোসাঙ্গরাজ পরীবানু বেগমকে দেখে তাকে পেতে চাইলেন। সুজা পরীবানুকে নিয়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। তারপর ছোট একটি নৌকায় চড়ে তাঁরা সমুদ্র যাত্রা করলেন। তখন দুজনেরই সমুদ্রে সলিল সমাধি ঘটে। এর কাহিনী বিয়োগান্তক। একদিকে বিড়ম্বিত অদৃষ্ট, অপর দিকে ভোগবাদী সামন্ত প্রেম পরিবানুর মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. ওয়াকিল আহমদ : লোককলা প্রবন্ধাবলী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা- ২০০১, পৃ. ২৮

২. SDFML. P-106.

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য: দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭, কলিকাতা, পৃ. ঃ ৩৫২-৩৫৫

৪. SDFML P. 107

৫. বরুণ কুমার চক্রবর্তী : গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, কলিকাতা, পৃ. ৪৩

৬. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা-১৯৮৫, পৃ. ৬২

৭. ঐ, পৃ. ৬৯

৮. মৈত্রী, কবি শেখর কালিদাস রায় : জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা- ১৯৯১, পৃ. ১৫১

৯. বরুণ কুমার চক্রবর্তী : গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা লোকগীতিকায় নারী চরিত্র

ভূমিকা

ময়মসিংহ এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকায় আমরা সমকালীন সমাজের বিচিত্র নারী চরিত্রের পরিচয় পাই। আমরা দেখতে পাই গীতিকাগুলোতে প্রেম বিরহ ব্যর্থতাজনিত হৃদয়ানুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। মানুষ তার সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় জয়-পরাজয়ে হৃদয়ের মাঝে আপন ভুবন গড়ে তোলে। তাই তার চিন্তা কখনো প্রকৃতি, কখনো মানুষ কিংবা ধর্মকেন্দ্রিক আলৌকিক বিশ্বাসের উপর ভর করে অগ্রসর হয়। বাংলা লোকগীতিকায় বিকশিত নারী চরিত্রগুলোয় তা লক্ষ্যণীয়।

গীতিকায় উদ্ভাসিত সাধারণ মানুষগুলো ছিল মূলত অসহায়। এ অসহায়ত্বের পাথরচাপা দুরবস্থা থেকে বাঙালি চিরদিন মুক্তি পেতে চেয়েছে। এ মুক্তি কামনায় তারা হয়েছে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। "পশুপাখি, গাছপালা, পাথর, মাটি, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে আত্মা বিদ্যমান। এ বিশ্বাস রয়েছে সর্বপ্রাণবাদের মূলে।" তাই গীতিকায় (মহুয়া) লোকবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চন্দ্র-সূর্য, বিরাটকায় বৃক্ষকে জীবনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে সাক্ষী মানতে দেখা গেছে। "চন্দ্র সূর্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি/ নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী"[১] (মহুয়া)। এখানে সইয়ের সখ্যতা ও বাঙালি নারীর লোকজীবনগত সমাজমনস্কতা ফুটে উঠেছে।

বাঙালির লোকজীবনে যেন দুঃখের শেষ নেই। এই দুঃখই যেন তাদের নিত্য সঙ্গী। আর যখন তারা এ দুঃখাবেগ কাটিয়ে উঠতে না পারে তখন তারা সন্ন্যাসী, বাউল, পীর-ফকিরের উদার-উপদেশ কিংবা জারি, সারি, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া গান এবং বাঙালির লোকঐতিহ্যগত বাঁশের বাঁশীতে যেন আশ্রয় খুঁজে পায়। আবার বিরহী মনের পুঞ্জিভূত কান্না যেন এ বাঁশীর সুরে বেজে উঠেই হাল্কা হয়। "ফাল্গুন মাসে চল্যা যায় রে, চৈত্র মাসে আসে / আইস্যা দেখে নদ্যার ঠাকুর বাজায় প্রেমের বাঁশী।"[২] এখানে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা পল্লী বাংলার নিসর্গ, ভূপ্রকৃতি, তরুলতা, ফুল, পাখি, নদ-নদীর বিরহকাতর পরিবেশে বাঁশীর কান্না যেন শাশ্বত বাংলার চিরবিরহী রূপ। মহুয়া পালায় আমরা আরও দেখি, "বাইদ্যার ছেড়ী কান্দে ধইর‍্যা নদ্যার ঠাকুরের গলা / আমি নারী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মালা/তিলেকমাত্র না দেখিলে হইরে পাগলিনী / পিঞ্জরায় বাইন্ধ্যা রাখছে পাগলা পক্ষিনী।"[৩] কথাগুলো যেন বাঙালি নারীর হৃদয়গত স্বাধীন ও শাশ্বত প্রেমের বাণী।

ময়মনসিংহ তথা পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মহুয়া, মদিনা, মলুয়া, সুনাই প্রভৃতি চরিত্র বাঙালি সমাজের অতি পরিচিত বাস্তব চরিত্র, তাদের সুনির্দিষ্ট দেশকাল পটভূমি আছে, আছে সামাজিক অবস্থান। তাদের মানসিক ভাবনা, দ্বন্দ্ব ও আচার-আচরণও একান্তই বাস্তব এবং পরিচিত। কোন রকম অলৌকিক ঘটনার আতিশয্য নেই তাতে। তাদের জীবন সমস্যাবলীও একটি বাস্তব সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে।

অতিথিপরায়ণতা বাঙালির-স্বাভাবিক ঐতিহ্য। তাদের অতিথি আপ্যায়নের দ্রব্য সামগ্রী অতি সাধারণ বাংলার প্রকৃতিগত। তাদের বসতবাড়ীও দারিদ্র্য ঐতিহ্যের ক্রমধারায় উদ্ভাসিত।

"আমার বাড়িত যাইওরে বন্ধু অমনি বরাবর

Dhaka University Institutional Repository

নল খাগড়ের বেড়া আছে দক্ষিণ দেয়ারিয়া ঘর

সেইখানেতে আমরা সবে বাস্যা কয়মাস থাকি

সেইখানে যাইও বন্ধু অতিথ হইয়া তুমি

আমার বাড়িত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।

জলপান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিরা

সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা

ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা।"[৪]

প্রিয়জনকে নিমন্ত্রণ ও আদর আপ্যায়নের এই চিত্র বাঙালির হৃদয়গত, মজ্জাগত। সালি ধানের চিরা, গামছা বাঁধা দই, সবরী কলা পল্লী মানুষের অতিথি আপ্যায়ণের মর্যাদাশীল দ্রব্য সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত।

আমাদের সমাজে প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় মানতের বিষয়টি প্রচলিত। মানুষের সকল নির্ভরতার সমাপ্তি রেখায় নিয়তি, বিধাতা কিংবা শক্তিধর অলৌকিক দেব-দেবী অথবা শক্তিশালী মহাপুরুষ, সন্ন্যাসী, পীর-ফকির-দরবেশের সন্তুষ্টি বিধানে এ মানত করা হয়। আমাদের সমাজে আজো মানত বর্তমান। সাধারণ দরিদ্র মানুষ অসহায়ত্বের সংস্কারবশত: পীরের দরগায় সিন্নি মানত, মোমবাতি মানত, ফল মানত, দোয়া-দরুদ মানতও একইভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। আমরা দেখি, "নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা/ বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা।"[৫]

'মলুয়া পালায়' দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রকৃতি নির্ভর বাংলার কৃষিক্ষেতের ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায়ই বিনষ্ট হয়। এতে অভাব অনটনে বাঙালির জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাংলার সাধারণ মানুষ দরিদ্র। এখানে দরিদ্র কৃষক নিদারুন আকালে হালের গরু বিক্রি করে, জমি বন্ধক দেয় এবং সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষেতে ধান, কালাই ইত্যাদি বপন করা থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়। এমনিভাবে কৃষক তার কৃষি ঐতিহ্যের অধিকার বঞ্চিত হয়।

বাংলার ঐতিহ্য ভিত্তিক পাখি শিকারের চিত্র বর্ণিত হতে দেখা যায় গীতিকায়। খাল-বিল-বন-জঙ্গল হল এসব প্রাণীর চারণভূমি। বাংলার খাল-বিলে যেমন অসংখ্য জলজ পাখির ভিড় লক্ষণীয়, তেমনি বন-জঙ্গলে বিচিত্র পাখি বসবাস করে। এসব পাখি শিকার করেও বাংলার দরিদ্র মানুষ অনেক সময় জীবিকা নির্বাহ করে।

'কাক' লোকসমাজের অশুভ বার্তার বাহক হিসেবে চিহ্নিত। 'ইষ্টিকুটুম' পাখি যে বাড়ীর কাছে ডাকে, সে বাড়ীতে অতিথি আসার সম্ভাবনা, এরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত। 'বউকথা কও' পাখির ডাক গৃহে নববধূ আগমণের সূচক। 'এক শালিক' দেখা ভাল নয়, দুই শালিক দেখা ভাল। 'কুক্যুয়া' যাত্রা পথে পড়লে অমঙ্গল ঘটে বলে ধারণা, আবার 'নীলকণ্ঠ' মঙ্গলসূচক পাখিরূপে চিহ্নিত। এক সময় বিজয় দশমীতে এই পাখি আকাশে উড়িয়ে দেবার প্রথা ছিল। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর হাঁস। 'মলুয়া' পালায় পত্রবাহকের দায়িত্ব পালন করেছে কোড়া। এভাবেই বাংলার পাখি বাংলার লোকসংস্কৃতির ঐশ্বর্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

পান্তা ভাত, বাসি ভাত, খুদ ও জাউ ইত্যাদি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা হিসেবে বাংলা লোকসমাজ ও লোকজীবনে দৃশ্যমান। অসহায় দরিদ্রের বিশ্রাম বিনোদনে যেমন- নারকেলের

Dhaka University Institutional Repository

মালাইয়ের হুক্কার কলকেতে তামাক পাতা জ্বালিয়ে ধূমপান, তেমনি মাঠের প্রান্তে বধূ কিংবা কন্যা বাহিত মাটির থালায় বাসি ভাত, পান্তা ভাত, খুদ-জাউ ইত্যাদি আহার করাও বাঙালির আজন্ম ঐতিহ্য। কৃষি প্রধান দেশে অতিথি আপ্যায়নে কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপন্ন ফসলাদি থেকেই নানা ধরণের খাদ্য তৈরি করা হয়। বিনোদ তার বোনের বাড়ী অতিথি হয়ে গেলে তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের নাস্তা-খাদ্য দ্রব্য বেঁধে দেয়া হয়। এখানে বোনের বাড়ী বেড়ানো, চুন-খয়ের মাখা সাচিপান, উত্তম সাইলের চিড়া, সবরী কলা, তামুক, টিক্কা সবই বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের আবহমান কালের ঐতিহ্য। বিশেষ করে বোনের বাড়ী বেড়ানো কিংবা শ্বশুর বাড়ী বেড়ানোর আনন্দ-আপ্যায়নে ব্যঞ্জন, বিভিন্ন ধরণের পিঠা, মিষ্টি, আচার পরিবেশন সুজলা-সুফলা গ্রাম-বাংলার সামাজিক বন্ধনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আষাঢ় মাসে জলভরা খালে-বিলে ঘনঘন কোড়ার ডাক, আসমানে মেঘ ও বিজলী চমকের সঙ্গে গুরু-গুরু গর্জন বাংলার প্রকৃতিনিষ্ঠ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত সাধারণ মানুষের ক্লান্তি সরানোর বৃক্ষ ছায়াতল। সাধারণত পল্লী বাংলার পুকুর পাড়ে, গাছের ছায়ায় বিশ্রামের স্থান করে নেয়া হয়। পল্লীর পুকুর পাড়ের কদম তলায় কিংবা ঝাড়-জঙ্গলে গাছের ছায়ায় অথবা বটের ছায়ায় সুখ নিদ্রায় লোক ঐতিহ্যের চিত্র পরিস্ফুটিত হয়। এমনি পরিবেশে সাধারণ বাঙালির স্বাভাবিক প্রেমনিষ্ঠাও জাগ্রত হতে দেখা যায়।

বাংলা লোকগীতিকায় বর্ণিত নারী চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা বিচিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। তন্মধ্যে প্রেমনিষ্ঠা, সংযম, সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, সতীত্ব, পাতিব্রত্য, আত্মত্যাগ, ব্যক্তিত্ব ও সরলতাই প্রধান। প্রতিটি পালায় নারী চরিত্রগুলো বিশেষ করে নায়িকা চরিত্রগুলো অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। বলা যেতে পারে, বাংলা লোকগীতিকায় বিকশিত নারী চরিত্রগুলোর সবাই সহজাত হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে অনন্য, স্বাধীন প্রেমিকা, নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও তারা প্রেমের মহিমায় উদ্দীপ্ত। গীতিকার নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে যুবতী কন্যা, সখী, ভাবী, মা, মামী, শাশুড়ী, বোন, ননদিনী, পড়শী নারী, রাণী, দাসী, দূতী, পতিতা, কুটুনী, সতীন, নাপিতানী, বিমাতা, সন্তানহীনা, কাঠুরাণী, জেলেনী, ধোপানী, চণ্ডালিনী, প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। এদের আচরণে, বিশ্বাস-ভাবনায়, কল্পনায় কখনো আদিম কৌমচেতনা, কখনো কৃষিনির্ভর লোকমানস, কখনো প্রতিপত্তিশীল সামন্ত মানস, কখনো দলমত নির্বিশেষে নির্জিত মানুষের একত্বতা, কখনো বা প্রকৃতি প্রসূত স্বাভাবিক প্রেম-চেতনা কিংবা সামন্ত প্রভুদের জুলুম নির্যাতনে দৈবাশ্রয়ী অসহায় মানুষের মুক্তি কামনা অথবা প্রেম বঞ্চিতের ধর্মচিন্তায় প্রস্ফুটিত হয়েছে।

বাংলা লোকগীতিকায় প্রতিফলিত নারী চরিত্রগুলো বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যালোকে স্বাভাবিক মানসবৃত্তি লাভ করেছে। তারা আকাশ-বাতাস, বন-জঙ্গল, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-হাওরের স্নিগ্ধ শোভায় বিকশিত হয়। এসব নায়িকা ঋতু চক্রাবর্তে কখনো কোমল উচ্ছল প্রেমিকা, কখনো মমতাময়ী স্বাগ্নিক বিরহিণী, আবার কখনো বা দুঃসাহসী বুদ্ধিমতী সতী এবং প্রতিবাদী নায়িকা।[৬] এ সম্পর্কে অধ্যাপক বিমল ভূষণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই কাব্যের নায়ক-নায়িকারা এই অঞ্চলের হাওড়, অরণ্যের মানব-মানবী মূর্তি। ময়মনসিংহের বিশিষ্ট অঞ্চলটি নারী চরিত্রগুলোর ভিতর দিয়ে কথা বলে উঠেছে। চরিত্রগুলো ঐ বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে; তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ঘাত-সংঘাতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঐ বিশেষ অঞ্চলের স্বাভাবিক ফসল। চরিত্রগুলোর ভিতরে Elemental Forceকে অনুভব করা যায়। দুর্বার প্রাণাবেগ ময়মনসিংহের প্রকৃতিকতার ভিতর থেকে চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। একে বলা যেতে পারে "The enevitable outcome of a special

Dhaka University Institutional Repository

envioronment" আঞ্চলিকতার দ্বারা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও রসাবেদনে তা স্থানিকতাকে অতিক্রম করে গেছে। কারণ, এর ভিতরে মানুষের আদিম জীবন-পিপাসার অভিব্যক্তি ঘটেছে।"[৭]

বাংলা লোকগীতিকাগুলোতে মধ্যযুগের বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ গাঁথার প্রেমকথা নিস্তরঙ্গ বিলাসভোগ্য উচ্চমার্গীয় বিষয় নয়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, আশা-হতাশা মিশ্রিত ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ সে সংসার জীবন তার সাথে একাত্ম হয়ে মিশে আছে। প্রেমকে সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। আবার এটাও ঠিক যে গাঁথার সব প্রেম সমাজের শাসন ও সমাজপতির রক্ত চক্ষুকে ভয় করেনি। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন,

> "এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি। আত্মমর্যাদার অলংঘ্য পরিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারী প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্ত করিয়া বড় হয় নাই, চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে।"[৮]

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার মোট ৪ খণ্ডে ৪৩টি গীতিকার মধ্যে অধিকাংশ গীতিকার বিষয়বস্তু প্রেম। প্রেমের প্রকাশে, প্রেমের রক্ষায় এবং পরিণতিতে নারীর ভূমিকা মুখ্য, পুরুষের ভূমিকা গৌণ। এসব গীতিকার নায়িকা, প্রতিনায়িকা, পার্শ্বনারীচরিত্র অনেক- মহুয়া, মলুয়া, কমলা, মদিনা, সখিনা, কাজলরেখা, চন্দ্রাবতী, রূপবতী, সুনাই লীলা, মাণিকতারা, অধুয়াসুন্দরী, কাঞ্চনমালা, রঙ্গমালা, শান্তি, সাঁজুতী, ভেলুয়া, আমিনা, আয়নাবিবি, বাতাসী, জিরালনী, সন্নমালা, সোনামণি, শিলাদেবী প্রভৃতি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের নায়িকাদের মত এরা একে অন্যের মধ্যে হারিয়ে যায় না। পদ্মাবতীর সাথে মধুমালতী-মৃগাবতীর তফাৎ আছে। রূপে-প্রেমে-আবেগে-ভোগে তারা অভিন্ন। কিন্তু মহুয়ার সাথে মদিনা, মহুয়ার সাথে কমলা, চন্দ্রাবতীর সাথে সাঁজুতী অভিন্ন চরিত্র নয়। তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র কৃতিত্ব আছে। লায়লী- মজনু ছাড়া অন্য প্রণয়োপাখ্যানের কাহিনী মিলনাত্মক। পালাগানের ব্যতিক্রম ছাড়া সব কাহিনী বিয়োগাত্মক। সুতরাং উভয়ে কাহিনী কাব্য হলেও তাদের মধ্যে গুণগত ও রসগত তফাৎ আছে। প্রণয়োপাখ্যানের নায়িকারা 'পুতুল' হলে পালাগানের নায়িকারা 'প্রতিমা' হবে। দীনেশচন্দ্র সেন 'প্রতিমা' বলেই এদেরকে আখ্যাত করেছেন। প্রতিমাও এক ধরণের পুতুল। তবে পুতুল ভোগ্যপণ্য, আর প্রতিমা পূজ্যমূর্তি। পুরোহিতের মন্ত্রে পুতুল প্রতিমা দেবী প্রতিমায় পরিণত হয়। পল্লী কবির হাতে গাথার নায়িকারা মানবী প্রতিমায় পরিণত হয়েছে।[৯]

বাংলা লোকগীতিকায় বর্ণিত নারী চরিত্রগুলোর যে আদর্শ ফুটে উঠেছে, তা যেন আধুনিক কালের কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ব্যালাডরূপ বলে মনে হয়। একনিষ্ঠ প্রেম, যার প্রভাবে জাতি-সম্প্রদায়-আভিজাত্য ধুলায় মলিন হয়ে যায়--- তা-ই মহুয়া, মলুয়া, মইষালবন্ধু প্রভৃতি পালায় বিকাশ লাভ করেছে। পবিত্র প্রেমের অপূর্ব লিপিচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে পল্লী কবিরা পুঁথিপত্রের আশ্রয় নেননি। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। এই প্রেমে প্রতারণা আছে, আঘাত আছে, বিরহের পীড়ন আছে- আর তার সঙ্গে আছে নারীর সর্বসমর্পণমূলক আত্মনিবেদন, প্রিয়মতের জন্য জাতিকূল খোয়ানোর অবিস্মরণীয় কাহিনী।

বাংলা লোকগীতিকায় নারীর জীবন যন্ত্রণার অন্তরালে সমাজের অন্যায় অবিচারের যেসব চিত্র ফুটে উঠেছে তার মধ্যে সামাজিক অনুশাসন দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি সমাজের বিশেষ কিছু তথ্য নির্ভর বাস্তব সম্পর্কিত কাহিনীর আলেখ্য দেখা যায়। মূলতঃ বাংলার গীতিকার আবেদনের তাৎপর্য নির্ণয়ে যে সত্য রচয়িতার রচনার গুণে প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠছে- সেটি হচ্ছে জীবনভিত্তিক বাস্তব প্রেম। এই প্রেম

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অনুশাসন দ্বারা বিপর্যস্ত। সামাজিক অনুশাসনগুলো যেহেতু নারীকেই বেশি মেনে চলতে হয় সেহেতু নারীর প্রেম প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘটে প্রচণ্ড সংঘাত। পরিণামে আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই বেশি চোখে পড়ে। গীতিকাগুলোর মূল আবেদন যেহেতু প্রেমজাত আত্মত্যাগকেন্দ্রিক, সেহেতু রচয়িতারা স্বাভাবিকভাবে নারী চরিত্রকেই উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন।

বাংলা লোকগীতিকায় বর্ণিত নারীরা একদিকে স্ত্রী, প্রেমিকা, ভোগের পাত্রী, অন্য দিকে কন্যা, জায়া ও জননীরূপে চিত্রিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে নারীর একমাত্রিকরূপ প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু লোকগীতিকায় নারীকে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। সে কারণে এখানে নারী প্রাধান্য এত প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। তাই গীতিকাগুলোতে প্রতিষ্ঠিত নারী চরিত্রগুলোর সামগ্রিক আলোচনা প্রয়োজন।

আমি আমার অভিন্দর্ভের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে যেসব নারী চরিত্রগুলো নির্বাচন করেছি সেগুলো বাংলা লোকগীতিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মধ্যে প্রথমত এসেছে নায়িকা চরিত্রগুলো। এ পর্যায়ে নায়িকা চরিত্রের পাশাপাশি প্রতিনায়িকার চরিত্রগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতঃপর মাতৃচরিত্র বা বিমাতা চরিত্র বা মাতৃস্থানীয় চরিত্রগুলোর উল্লেখ করা যায়। সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে গীতিকায় সখী চরিত্রগুলোর অবতারণা করা হয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক চরিত্র হিসেবে দূতী, কুটনী, ঘটকী, গণিকা, বারবণিতা ও ডাইনী চরিত্রগুলো লক্ষণীয়। এছাড়াও আছে স্ত্রী চরিত্র বা সতীন চরিত্র, আত্মীয়তার সম্পর্কের কিছু চরিত্র ও বিবিধ চরিত্র। বাংলা লোকগীতিকায় বর্ণিত এ সমস্ত নারী চরিত্রের আলোচনায় নারী চরিত্রের স্বরূপ, সামাজিক অবস্থান এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মূল্যায়ন স্পষ্টতর হবে।

বাংলা লোকগীতিকাগুলোর মৌলিক বিষয় নর-নারীর প্রেম--- বিবাহপূর্ব প্রেম, বিবাহোত্তর দাম্পত্য প্রেম, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ প্রেম ইত্যাদি। প্রেম মানবহৃদয়ের সার্বজনীন অনুভূতি। এর শক্তি অপরিমেয়। প্রেমের জন্য প্রাণ তুচ্ছ বিবেচিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নারীকেই সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। তাকেই মাথা পেতে নিতে হয় যত বিড়ম্বনা। নারী জীবনের এই ট্রাজিক পরিণতির স্বীকার হয়ে মহুয়া, মলুয়া, ভেলুয়া, সোনাই প্রভৃতি চরিত্র সামাজিক গীতিকার আবেদনকে করে তুলেছে মর্মস্পর্শী।

বিবাহপূর্ব প্রেমের দূর্বার আবেগকে কার্যে পরিণত করার সংকল্পে দৃঢ়চিত্ততা, অপরিসীম সাহস, অদম্য মনোবল এবং পরিণামে আত্মোৎসর্গের সার্থক চিত্ররূপ মহুয়া। মহুয়ার আত্মত্যাগ প্রেমের অমোঘতাকে বরণ করেছে। অন্যদিকে মলুয়ার বুদ্ধিদীপ্ত ধীশক্তি, সহনশীলতা এবং স্বামীর মঙ্গলার্থে স্বার্থত্যাগ বাঙালি নারীর স্বরূপকে আরো উজ্জ্বল মহিমায় ভূষিত করেছে। সুনাই স্বামীর কল্যাণ ও মুক্তি কামনায় বিষপানে আত্মহত্যা করে সতী নারীর প্রতীকরূপে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১. নায়িকা চরিত্র

১). মহুয়া

বাংলা লোকগীতিকায় বিচিত্র ধরণের নারী চরিত্র থাকায় সেগুলোকে একত্রে বিচার করা যায় না। আলাদা আলাদাভাবে তাদের সৌন্দর্য-মাধুর্য বিচার করতে হয়। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, মদিনা, সখিনা, লীলা, কাজলরেখা প্রভৃতি নারী চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মহুয়ার রূপ- সৌন্দর্য ও চরিত্র মাধুর্য চিত্রে অঙ্কন করার মতো। এ সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন,

> "মহুয়ার প্রেম কি নির্ভীক, কি আনন্দপূর্ণ। এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মহুয়া চিরবিজয়ী। মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে।"(১০)

একই গ্রন্থে তিনি আরো বলেন-

> "প্রেম ভিন্ন ইহাদের ধর্ম নাই, পরস্পরের সাহচর্য ভিন্ন ইহারা কোন গৃহসুখ কল্পনা করেন নাই।"

দীনেশচন্দ্র সেন প্রেম দিয়েই মহুয়া ও অন্যান্য চরিত্রের মূল্যায়ন করেছেন। চিরায়ত বাঙালি নারীর মত কন্যা-জায়া-জননীরূপে মহুয়াকে দেখা যায় না। মহুয়া এ ধারার ব্যতিক্রম ছিল। মহুয়া কেবল প্রেমের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি নয়, তার রূপের মাধুর্য আমাদের কম আকৃষ্ট করে না। কবির বর্ণনায় ষোড়শী-রূপসী মহুয়ার দৈহিক সৌন্দর্য-

১. "আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা।"

২. "হাট্টিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পড়ে চুল
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল।"

৩. "আগল ডাগল আঁখিরে তার আসমানের তারা।"

লক্ষণীয়, মহুয়া রূপে অতুল, গুণেও অনন্যা। সে ভাল 'খেলা কছরত' দেখিয়ে জমিদার পুত্র নদের চাঁদের দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং হৃদয়-মন জয় করতে সক্ষম হয়। অবশেষে বাজি খেলার মতো প্রেমের খেলাতেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

সামাজিক গীতিকা পর্বে খাঁটি প্রেমমূলক কাহিনী ভিত্তিক রচনা মহুয়া। কৃষক সমাজভুক্ত জোতদার এবং বেদে সম্প্রদায়ের অসম প্রেমের মর্মান্তিক পরিণতি মহুয়া পালায় বিধৃত। তৎকালীন সমাজের সাম্প্রদায়িক চেতনা ও আর্থ-সামাজিক এবং দলীয় স্বার্থকেন্দ্রিক মূল্যবোধ মহুয়া ও নদের চাঁদের মিলনের পথে যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে মূলতঃ সামাজিক জীবনের সমস্যা।

মহুয়া চরিত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকার অন্তরালে নারীর অসহায়ত্ব জয় করার এক অদম্য আবেগ কাজ করেছে। যুগে যুগে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর মর্মবেদনার মূল্য নিরুপণ করা হয় কড়া প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে। আত্মহননেই যাদের নিষ্কৃতি তাদেরই একজন মহুয়া। আপন শক্তি ও সত্তার প্রতিভূ হয়ে নির্দ্বিধায় সব ধরণের বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। প্রচণ্ড বাঁধা বিপত্তি ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে আরাধ্যকে জয় করেছে। লক্ষ্য স্থির রেখে নারীর এ ধরণের সাহস, শক্তি এবং নিবেদিত রূপ বাংলাদেশের তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অচিন্ত্যনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখতে পাই, হুমরা তার দলবল নিয়ে খেলা দেখাতে যখন বামনকান্দা গ্রামে আসে তখন খেলা দেখানোর সময় মহুয়ার সৌন্দর্য জমিদারপুত্র নদের চাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমে উভয়ের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। একে অপরকে নিবিড় করে পেতে চাইলে হুমরার দিক থেকে আসে প্রচণ্ড বাধা। ঘটনার আকস্মিকতায় হুমরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ একদিকে বিত্তবান জমিদার পুত্রের সম্মুখ বিরোধিতা করা হুমরার পক্ষে যেমন বিপদজনক অন্যদিকে মহুয়াকে হারানো দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী। মহুয়ার অনুপম সৌন্দর্যের সঙ্গে অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য ছিল দর্শক সমাগমের প্রধান হাতিয়ার। মহুয়াকে ছাড়া বেদের দলের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া এক রকম অসম্ভব- তাই ভেবে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে হুমরা মহুয়াকে নিয়ে বামনকান্দা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ বেদে সমাজের একটি নিজস্ব রীতি আছে। গোত্রের বাইরে বিয়ে দেয়ার প্রথা তাদে নেই। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কারণে মহুয়াকে হাতছাড়া করা দলগত হিসেবে হুমরার প্রতি ছিল প্রচণ্ড হুমকিস্বরূপ। পুরো দলটির দায় দায়িত্ব নির্ভর করছে যে ক্ষেত্রে হুমরার উপর, সেক্ষেত্রে এ ধরণের অসম বিয়ের প্রতিবাদে হুমরা ছিল অনড়। বেদে দলের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে মহুয়া বলে--

আমি সে অবলা নারীরে বন্ধু
আমার আছে কূল মান।
বাপের সঙ্গে না যাইলে
না রইব জাতি মান ॥ (মহুয়া)

বেদে দলের বংশ, পেশা এবং গোষ্ঠীগত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক এই বেদে সমাজ। অন্যদিকে ব্রহ্মণ সন্তান নদের চাঁদ বংশ এবং পেশাগত ধারায় বাঙালি সমাজের শীর্ষে অবস্থিত। সামাজিক সংস্কৃতির আবর্তে উভয়ের মিলন দুরুত্ব সৃষ্টি করল। ফলে বেদের দল মহুয়াকে নিয়ে জৈতার পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও স্বস্তি পেল না। এখানেও তাদেরকে একত্রে দেখার পর হুমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তাই একদিন গভীর রাতে মহুয়াকে ডেকে তার হাতে বিষ মাখান ছুরি দিয়ে নদের চাঁদকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। মহুয়া প্রথমতঃ অপ্রস্তুত হলেও পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ছুরি হাতে নদের চাঁদের কাছে যায়। কিন্তু তাকে হত্যা করার পরিবর্তে ঘোড়ায় চড়ে নদের চাঁদকে নিয়ে বেদেদের নাগালের বাইরে পালিয়ে যায়।

মহুয়ার এ ধরণের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ বাঙালি নারীর পক্ষে অবিশ্বাস্য মনে হলেও মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা মহুয়ার আচরণে একদিকে প্রকৃতি আবার অন্যদিকে নদ-নদী, হাওর, জলাঞ্চলের প্রভাবে তাকে ভাবপ্রবণ ও কল্পনাশ্রয়ী হতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এসব আঞ্চলিক গীতিকা বিধৃত নারীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন--

> "প্রকৃতি জগতের সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে যেমন একটি ভয়াবহ শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন থাকে গীতিকার নারী চরিত্রগুলোর উপরিস্থিত সেই সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে তাহাদের এক দুর্জয় শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাদের এই শক্তি তাহাদের স্বাধীন প্রেমিকা সত্তাকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে।"(১১)

লক্ষণীয়- মহুয়ার সংস্কারমুক্ত এবং স্বাধীন প্রেমের অনুভূতিই তার অদম্য সাহস ও বেপরোয়া শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করেছে। মহুয়ার রূপের যে আকর্ষণ তা একদিকে যেমন বেদে দলের অর্থোপার্জনের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, অন্যদিকে তা আবার অভিশাপরূপে প্রতিফলিত হয়েছে তার জীবনে। কখনো সওদাগর, কখনো সন্ন্যাসী তার সতীত্বকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছে। এই

Dhaka University Institutional Repository

রূপের কারণে ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও সে বেদে কন্যার পরিচিতি লাভ করেছে। নদের চাঁদও তার রূপের মোহে জাতি-ধর্ম ত্যাগ করে বিবাদী হয়েছে। পরিশেষে নিয়তির নির্মম কষাঘাতে বিয়োগান্তক পরিণতির স্বীকার হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই সমাজে নারীর স্থান রূপের জন্য, কখনো আদৃত পরক্ষণেই তা আবার অনাদৃতা ফুলের মতই পদদলিত হয়ে পড়ে। "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী"-- এই প্রবাদের সূত্র ধরে রূপই যেন তার জন্য কাল বা অভিশাপ রূপে নেমে এসেছে। গীতিকার অধিকাংশ নারী চরিত্রের ক্ষেত্রেই আমরা এ বিষয়টি লক্ষ্য করি। মহুয়া ও এই ধরণের সংঘাত সঙ্কুল জীবনালেখ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

হুমরা বেদের নিষ্ঠুর নির্দেশে মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা না করে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা বা আত্মবিসর্জনের যে সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা ব্যতিক্রমধর্মী প্রেম সাধনায় উজ্জ্বল। নানান প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মহুয়া যেসব কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাতেই তার চরিত্রের প্রান্তটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হুমরা বেদের কঠিন নিয়ন্ত্রণব্যূহ থেকে নদের চাঁদের সাথে পলায়ন ও সওদাগরকে সদলবলে হত্যা করে নিজের উদ্ধার লাভ এবং সন্ন্যাসীর লোলুপ দৃষ্টি থেকে চলৎ শক্তিহীন নদের চাঁদকে নিয়ে পলায়ন-- সর্বত্রই মহুয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে।

মহুয়া সমাজ নির্ধারিত আবেষ্টনীর উর্ধ্বে আপন মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছে। অন্যদিকে হুমরা তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে যতই তাকে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছে ততই জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশেষে হুমরা বেদের নিষ্ঠুর নির্দেশে মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা না করে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা বা আত্মবিসর্জনের যে সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা ব্যতিক্রমধর্মী প্রেমসাধনায় উজ্জ্বল। তাইতো মহুয়া চরিত্রধর্মে গীতিকার প্রেমময়ী নারীদেরই সগোত্র। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশ তার চরিত্রে অনেকটা স্পষ্ট। তার সক্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি গীতিকার সব চরিত্রে মেলে না। তার রূপের উচ্ছ্বসিত মাদকতার সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিপদে অবিচল ধৈর্যের সহজ সম্মিলন ঘটেছে।[১২]

মানবিক ধর্মের সহজাত বৃত্তির সঙ্গে সামাজিক ধর্মের আদর্শগত সংঘাত মহুয়া পালার বিষয়বস্তুর মর্মমূলে প্রবিষ্ট হয়ে ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক আবেদনকে চিরন্তনতা দান করেছে। একইভাবে শ্যাম রায়ের পালায় বিবাহিত ডোমকন্যার সঙ্গে রাজপুত্র শ্যাম রায়ের অবৈধ প্রণয় পরিণয়ে রূপলাভ করতে পারেনি। ধোপার পাটের রাজপুত্র ও কাঞ্চনের প্রণয়ের পরিণাম আত্মঘাতী পরিণতির মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মহুয়া ছিল সমাজের শিকার। একদিকে প্রেম অন্যদিকে সমাজ এ দুয়ের সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতার পরিণাম হিসেবে মহুয়ার আত্মত্যাগ। প্রকৃত প্রেমের মধ্যে সর্বদাই প্রলয়ের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে, যেখানে বাধা আসে সেখানেই এর ধ্বংসের রূপ প্রকাশ পায়।[১৩] এক্ষেত্রে প্রেমের সার্থকতা মিলনে নয়, ত্যাগের মাধ্যমে জীবনেরই জয় ঘোষিত হয়েছে।

মৈয়মনসিংহ গীতিকায় বিকশিত নারী চরিত্রগুলোর সবাই সহজাত হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে অনন্য, স্বাধীন প্রেমিকা। শত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রেমের মহিমায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে গীতিকার নায়িকাদের অধিকাংশই তেজস্বিতা, সংযম, সহিষ্ণুতা, পাতিব্রত্য ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে-

কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি
খারা থাক বাপ তুমি আগে মরি আমি।[১৪] (মহুয়া)

Dhaka University Institutional Repository

একথা বলেই মহুয়া হুমরা বেদের আদেশ অগ্রাহ্য করে হুমরা প্রদত্ত বিষলক্ষের ছুরি নদের চাঁদের বুকে বিদ্ধ না করে বরং নিজের বুকে বিধিয়ে তার অমর প্রেমের শক্তি ও ত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই অধ্যাপক শ্রী দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ বলেন- "মৈয়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি একনিষ্ঠ প্রেম ও ত্যাগের মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সরলা পল্লীবালার স্বাভাবিক প্রণয় শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় বিলাসের মোহ নহে, ইহা প্রিয়তমের প্রেম-পূর্জায় আত্মবিসর্জন।"[১৫]

এ ধরণের বলিষ্ঠ প্রেমের কারণে আত্মবিসর্জিত হৃদয়গ্রাহী বিষাদাত্মক চরিত্রের প্রতিবিম্বগুলো হলো- মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, লীলা, সোনাই, রূপবতী, সখিনা, দেওয়ানা মদিনা প্রভৃতি।

২). মলুয়া

'মলুয়া' গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র মলুয়াকেও আমরা একনিষ্ঠ প্রেমিকা হিসেবে দেখতে পাই। তাই প্রণয়ে, বুদ্ধিমত্তায় পতিভক্তিতে, দৃঢ় আচরণে ও আত্মত্যাগের গৌরবে সে মাহাত্ম্য অর্জন করেছে। তার চরিত্রে পতিভক্তি ও সতীত্ব ভাবনার যে প্রকাশ আমরা দেখি, তা তার ব্যক্তিত্বকেই সংহত রূপ দান করেছে। মলুয়া যেভাবে তিন মাসের সময় চেয়ে নিয়ে দেওয়ানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করল, কাজির প্রাণদণ্ড বিধান করল ও দেওয়ানকে কুড়া শিকারে যেতে প্ররোচিত করে শেষ পর্যন্ত তার কবল থেকে রক্ষা পেল, তাতে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এ ধরণের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে মহুয়া, ভেলুয়া, কমলা প্রভৃতি নায়িকা।

মলুয়ার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং তাৎক্ষণিক চিন্তার ক্ষমতার দ্বারা নিজের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে সমগ্র পরিবারের বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার কৌশল আমাদের চমৎকৃত করে। আবার অন্যদিকে সমাজের নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, হীনমন্যতার কারণে মলুয়ার মানসিক নির্যাতনে আমরা কষ্ট অনুভব করি।

কাজির অন্যায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে, সর্বহারা চাঁদবিনোদের পরিবারে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন-যাপনে এবং সর্পদংশিত স্বামীর জীবন প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় তার পতিভক্তি যেমন প্রবল, তেমনি কাজি কর্তৃক স্বামী চান্দবিনোদের প্রাণ সংহারের আয়োজন চলাকালে পাঁচ ভাইকে খবর পাঠিয়ে এনে তার উদ্ধার প্রচেষ্টায় কিংবা ব্রত পালনের কথা বলে দেওয়ান গৃহে সতীত্ব রক্ষা ও পলায়নের সুযোগ সন্ধান, কাজিকে শূলে চড়ানো প্রভৃতি ঘটনায় তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু মলুয়ার সমস্ত বুদ্ধি, কৌশল, মানসিক শক্তি, আন্তরিকতা শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের নিকট পরাজিত হয়েছে। সর্পদংশিত মৃত্যুন্মুখ স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সে যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, তাতে সমগ্র সমাজ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে স্বামীগৃহে তার সামাজিক পুনর্বাসন কামনা করলেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়নি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্য সমাজের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও নির্দয় অমানবিক আচরণই অবশেষে মলুয়াকে নদীতে আত্মবিসর্জনে বাধ্য করে।

লক্ষণীয়, মলুয়া ও চাঁদবিনোদের প্রেম, বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনে কালো ছায়া ফেলেছে কাজির ষড়যন্ত্র, দেওয়ানের অর্থলোভ এবং সমাজের সংস্কারচেতনা। স্বামীর কারণেই মলুয়া দেওয়ানের ঘরে অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু সতীত্ব বজায় রাখে এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে মুক্তি পায়। সমাজের ঐ একই কথা- দেওয়ানের ঘরে বন্দী ছিল। অতএব বিনোদ তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারে না, করলে সমাজচ্যুত হবে। পুরুষ স্বামীত্বের দাবী করে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়ে তাকে ত্যাগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সমাজে পুরুষতন্ত্রের কারণেই এমনটি ঘটে থাকে। পুরুষতন্ত্রের কারণে স্ত্রী স্বামীর চিতায় সহমরণে যায় কিন্তু স্বামী স্ত্রীর চিতায় সহমরণ বরণ করে না। পুরুষতন্ত্রের কারণে স্বামীর

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুতে স্ত্রী চির বৈধব্য জীবন পালন করে। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুতে পুরুষ পুনর্বিবাহের ছাড়পত্র পেয়ে যায়। পুরুষের জন্য কোন বৈধব্যজীবন নেই। মলুয়া বেঁচে থাকার জন্য কম চেষ্টা করেনি। যে ঘরের সর্বময় কর্ত্রী ছিল মলুয়া, সেই ঘরেই সে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করেছে, সর্পদংশনে মৃত স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও মলুয়া দাম্পত্য জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ঘরে দাসীরূপে থাকার অধিকার চেয়েও সে পায়নি। সে সেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে সকল জ্বালা-অপমানের অবসান ঘটিয়েছে। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসে মহিমের বিবাহিত স্ত্রী অচলা পদস্খলনের পর মহিমের গৃহে আশ্রয় পেলেও স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি।[১৬] বলা যায় মলুয়ার জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য সামন্ত অপশক্তির উদগ্র লালসা এবং মধ্যযুগীয় সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার পাশাপাশি নায়ক চাঁদবিনোদের নিশ্চেষ্টতাও দায়ী।[১৭]

চাঁদবিনোদ মানবিক দিক থেকে মলুয়াকে গ্রহণ করলেও সমাজ শক্তির বিরুদ্ধাচারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি; যেমন হয়নি রামের পক্ষে সীতাকে গ্রহণ করা। সংস্কারজাত প্রথার কাছে চাঁদবিনোদ পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সে যুগে পরমতসহিষ্ণুতা থাকলেও হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতাবোধের কাঠিন্য প্রবল ছিল বলেই মলুয়া সতীনের হাতে সর্বস্ব তুলে দিয়ে 'বাইর কামুলী' হয়ে ঘরের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। স্বামী প্রেমের একনিষ্ঠতা তাকে আপন ঘর থেকে পুরোপুরি নির্বাসিত করতে পারেনি। এর পরও আত্মীয় পরিজন মলুয়ার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে--

বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সর্দ্দার
ঘরে যেই তুইল্যা লইব জাতি যাইব তার।
বিনোদের পিসা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া
ঘরেতে না লইব কন্যা জাতি ধর্ম ছাড়িয়া ॥ (মলুয়া)

মলুয়া নানাভাবে নির্যাতিত হয়েও নিস্কৃতি পায়নি। সীতার মত বার বার আপন সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ঘর ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছে। রামায়ণের যুগের নির্যাতনের ধরণ বদল হলেও সমাজের গঠন প্রকৃতি একই থেকে গেছে।

'দুর্বলের উপর সবলের পীড়ন' মানব সমাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নারীকে যুগ যুগ ধরে নির্বিচারে দণ্ড প্রদান করে চলেছে। মলুয়ার ক্ষেত্রে সমাজের সেই আদিম ক্রুর বিধান বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। তাই মলুয়া অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়-

আপনি থাকিতে সোয়ামীর দুঃখ না যাইব
কতকাল এমত দুঃখে দিন গোয়াইব
বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়ামীর
পরাণ ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল থির। (মলুয়া)

সমাজ ও স্বামীর প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমানবোধ পরিণামে মলুয়াকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। মালুয়ার জীবনের সংঘাত তার সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে যে সংকট সৃষ্টি করেছিল তার মূলে ছিল নারীলোলুপ ব্যক্তি বিশেষের পাপ কামনা চরিতার্থতার অভিশাপ এবং সংস্কারগত অন্ধ অনুশাসনের নির্মমতা। ফলে মলুয়ার 'শাশ্বত নারীর চিরন্তর সত্তা' অসহনীয় যন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে সবার অগোচরে। তবুও মলুয়ার প্রতিবাদী চেতনা প্রেমের মহার্ঘতায় অপরূপ মহিমায় বিমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে নারী চরিত্রের অন্তর্মুখী শাশ্বত সংস্কার ও হিন্দু সমাজের বহির্মুখী অনুশাসনের মধ্যে সংঘাতের দ্বারা নারীর সুপ্ত চেতনার স্ফুরণ এক নতুন অধ্যায়ের জয় ঘোষণা করেছে।

৩). চন্দ্রাবতী

চন্দ্রাবতী গাঁথায় ব্রাহ্মণকন্যা চন্দ্রাবতী ও ব্রাহ্মণপুত্র জয়ানন্দের বাল্য প্রণয় ছিল। জয়ানন্দ এক মুসলমান সুন্দরী রমণীর প্রেমাসক্ত হয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। পরে জয়ানন্দ অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলেও চন্দ্রাবতীকে ফিরে পায়নি। কারণ পবিত্র প্রেমের এই অবমাননা চন্দ্রাবতীর হৃদয়কে রক্তাক্ত করে তোলে। "না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী। আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী ॥"[১৬] (চন্দ্রাবতী)। জয়ানন্দ মুসলমান রমণীর সঙ্গে ঘর করেছে। এতে পিতা বংশীদাশ কন্যার মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে অন্যত্র বিয়ে স্থির করলেন। চন্দ্রাবতীর তীব্র প্রতিবাদের কারণে বিয়ে সম্পর্কিত চিন্তা বন্ধ রেখে চন্দ্রাবতীকে শিবপূজা ও রামায়ণ লেখায় মনোনিবেশ করার উপদেশ দিলেন। ব্যর্থ প্রেমের কারণে চন্দ্রাবতী ভীষ্মের মতই কঠিন প্রতিজ্ঞা করে অনূঢ়া থাকার সংকল্প করে এবং শিবপূজায় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা বিস্মৃত হতে সচেষ্ট হয়। ক্রমে স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন চন্দ্রাবতীর অস্থিরতা ও পার্থিব চিন্তা দূর হয়ে আত্মসমাহিত ভাবের গভীরে নিমজ্জিত হতে শুরু করে-

নির্ম্মাইয়া পাষাণ শিলা বানাইলা মন্দির,
শিবপূজা করে কন্যা মন করি স্থির।[১৯] (চন্দ্রবতী)

বাস্তবিকই প্রেমের জন্য চন্দ্রাবতী যে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে তার তুলনা মেলা ভার। বিশেষত জয়ানন্দ তাকে আঘাত দেয়া সত্ত্বেও জয়ানন্দের প্রতি তার হৃদয়ের দৌর্বল্য শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন : "আহত প্রেম নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়ে এক নিরন্ধ্র কঠোর অভিমানের রূপ লাভ করে কিরূপে Sublimity স্পর্শ করতে পারে চন্দ্রাবতী তার উজ্জ্বল নিদর্শন। জীবন বিসর্জন না দিয়েও চন্দ্রাবতী তাহার প্রেমের নিষ্ঠার জন্য যে গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছে, হতভাগ্য চঞ্চলমতি জয়ানন্দ মৃত্যুর মধ্যেও তাহার একাংশেরও অধিকারী হইতে পারে নাই।"[২০]

চন্দ্রাবতীর মানসিক অস্থিরতা যখন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে আসে তখন চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে জয়ানন্দ একটি চিঠি পাঠাল। চিঠি পেয়ে চন্দ্রাবতী প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। একদিকে প্রেমের ফল্গুধারা পুরোপুরি নিঃশেষিত হওয়ার আগেই জয়ানন্দের এ আহ্বান চন্দ্রাবতীর সমগ্র চৈতন্যকে আলোড়িত করে দেয়। তখন অবুঝ হৃদয় যেন ছুটে যেতে চায় দয়িতের কাছে।

অন্যদিকে পিতার কঠোর আদেশ অমান্য করে সমাজ ও সংস্কারের বন্ধন মুক্ত হওয়া সে যুগে সহজ ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ছাপিয়ে মানবিক চেতনা বড় হয়ে উঠেছে। ফলে সুষ্ঠু সমাধান প্রত্যাশায় পিতার শরণাপন্ন হয়ে শুধু দেখা করার অনুমতি পায়। কিন্তু পিতার কঠোর নির্দেশ-

যা লইয়া আছ তুমি সেই কাজ কর-
অন্য চিন্তা মনে স্থান নাই সে দিবা আর। (চন্দ্রাবতী)

পিতার অমতে দেখা করা সম্ভব নয়- জানিয়ে চন্দ্রাবতী চিঠির উত্তর পাঠায়। এই সংবাদ অবগত হয়ে জয়ানন্দ নিজেই চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়-

জয়ানন্দে ভূইল্যা কন্যা পূজয়ে শঙ্করে।
এক মনে ভাবে কন্যা দেব বিশ্বেশ্বরে।[২১] (চন্দ্রাবতী)

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যানমগ্না চন্দ্রাবতীর কাছে ব্যক্তি প্রেম তুচ্ছ হয়ে যেন বিশ্বপ্রেমের সারতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। ক্ষণিকের দুর্বলতা কাটিয়ে নিজেকে স্থিতধী করে তুলেছে। জয়চন্দ্রের আকুল আহ্বান তাই চন্দ্রাবতীর কানে পৌছাতে পারেনি।

প্রেমের পরিধি যেখানে ব্যাপক, সেখানে দেহের আধারে তার সীমা নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। চিরকুমারী জীবন-যাপনের মাধ্যমে এই সত্যই চন্দ্রাবতী প্রমাণ করেছে যে- প্রেম শাশ্বত ও চিরঞ্জীব, ভোগে নয় ত্যাগে যার মহিমাকে আরো শাণিত ও উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব।

চন্দ্রাবতীর প্রেমের ঐকান্তিকতা গভীর থাকায় জয়ানন্দের প্রতারণায় আঘাতপ্রাপ্ত হলেও মানুষ হিসাবে বিচার করেছে পাপকে ঘৃণা করা যায়, পাপীকে নয়। জন্মগত সংস্কারবোধ চন্দ্রাবতীর চেতনায় প্রোথিত ছিল বলেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখার অনুভূতিকে লালিত করেছে। যার ফলে জয়ানন্দের মৃতদেহ নদীর জলে ভাসতে দেখেও আত্মহত্যার কল্পনা তাকে আচ্ছন্ন করেনি বরং ধ্যানী সাধী রমণীতে রূপান্তরিত করেছে।

চন্দ্রাবতীর প্রেমের দৃঢ়তা ও গভীরতা প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ উন্মোচণে সহায়তা করেছে। গীতিকার অন্যান্য নারী চরিত্রগুলো আত্মহত্যার মাধ্যমে যে ক্ষেত্রে জীবনের ব্যর্থতার জ্বালা নিবৃত্ত করেছেন চন্দ্রাবতী সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ধারা অনুসরণ করে প্রকৃত ট্রাজিক চরিত্রের প্রতীক হয়েছে। চন্দ্রাবতীর এই আত্মশক্তি দুর্লঙ্ঘ-অপরাজেয়। এখানে প্রেম পার্থিব বাসনা-কামনার-উর্ধ্বে দেহাতীত পর্যায়ে চেতনার উত্তরণ ঘটিয়ে প্রেমের সার্বজনীন আবেদনকে পরিস্ফুট করেছে। একদিকে ধর্ম অন্যদিকে জীবন এই দু'য়ের সমন্বয়ে চন্দ্রাবতীর হৃদয়ে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তারই ফলে পালাটি হয়েছে জীবনভিত্তিক।

প্রকৃতপক্ষে জীবন থেকে প্রেম বড়-- চন্দ্রাবতী সে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুমার-কুমারী প্রেম করতে পারে এবং বিবাহ না করে বাপের ঘরে আইবুড়ো হয়ে থাকতেও পারে, তা-ও প্রমাণিত হয়েছে চন্দ্রাবতী গীতিকায়।[২২] একদিকে জয়ানন্দের প্রতি অস্তিত্বমূলীভূত প্রণয়, অন্যদিকে কুমারী ব্রত পালন এবং শিবপূজায় মনস্থির করার সংকল্পজনিত অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে চন্দ্রাবতীর জীবনের ট্রাজেডি নিহিত।[২৩]

৪). কমলা

'কমলা' গাথার কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলার মধ্যে সামাজিক অবস্থানসচেতনতা, আত্মসম্মানবোধ এবং বুদ্ধিমত্তা, আত্মপ্রত্যয়ী মনোবৃত্তি, সহনশীলতা ও মানবিক দায়িত্ববোধের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সংগ্রাম কঠোর জীবনে তার চরিত্রে দেখা দেয় দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্বময়তা, প্রত্যয়শীলতা, সহিষ্ণুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহসিকতা প্রভৃতি গৌরবদীপ্ত উপাদান। কমলা চরিত্র সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্তের বিবেচনা প্রণিধানযোগ্য ঃ

> "দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান, দৃঢ়তর সংযম ও নিষ্ঠা এবং দৈবের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের দুঃসাহসী অটলতায় কমলা চরিত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।"[২৪]

নিদানের প্রণয়বাসনা প্রত্যাখ্যানে প্রথমে কমলার সংকীর্ণ মনের নেতিবাচক রূপ পরিস্ফুটিত হলেও পরবর্তী সময়ে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ উজ্জ্বল হয়ে উঠে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

এই কথা শুনিয়া কমলা কয় কারকুনেরে।
শুনছ নি কেউ করে বিয়া নরপিশাচেরে ॥
আমার বাপের লুন খাইয়া বাচিলা পরানে।
তার গলায় দিতে দড়ি না বাঝিল প্রাণে ॥
পরানের দোসর ভাইয়ে দুঃখ যেই দিল।
মুখে মারি ঝাটা তার পিঠে লাথি কিল ॥
বনে জঙ্গলায় থাকবাম নাহি ইতে ডর
তবু নাই সে করবাম এমন রাক্ষসার ঘর ॥[২৫] (কমলা)

নিদানের লালসার অগ্নিতে স্বেচ্ছায় দগ্ধ হয়নি কমলা। বরং ধনৈশ্বর্য ও প্রতিপত্তির লোভ ত্যাগ করে মাকে নিয়ে কমলা পথবাসী হয়েছে। মামার বাড়ীতে আশ্রয় লাভের পর নিদানের প্রচারিত মিথ্যা কলঙ্কের দায়ে মামা যখন তাদের বিতাড়িত করার নির্দেশ দেয়, তখনও তার মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মামার প্রেরিত পত্র পাঠে কমলার হৃদয় মধ্যে জাগ্রত অভিমানাহত ব্যক্তিত্বময় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়-

বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদি হই সতী।
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গাভগবতী ॥
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দেই কাতি।
মামার বাড়ি না থাকিব দণ্ড দিবা রাতি ॥ [২৬] (কমলা)

কমলার গৃহত্যাগে আত্মমর্যাদাবোধের চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে নিম্নের চরণগুলিতে-

একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে / একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে ॥
একবার না ভাবিল কন্যা জাতিকুলমান / একবার না ভাবিল কন্যা পথের আঙ্কান ॥
একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি / একলা পন্থেতে পড়ি কি হবে দুর্গতি ॥
একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কে বা দিবে / সন্ধ্যাবেলা তারা ফুটে সূর্য্য ডুবে ডুবে ॥
এমন সময় কন্যা কোন কাম করে / বনদুর্গা স্মরি কন্যা পন্থে মেলা করে ॥ [২৭] (কমলা)

মামার অন্যায় অভিযোগ ও অপমানকর পত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়ায় কমলার পক্ষে সন্ধ্যার অন্ধকারে অজানা পথে গৃহত্যাগ করা সম্ভব হয়েছিল। পিতা ও ভ্রাতাকে কারাবাস দান এবং মা ও তাকে গৃহচ্যুত করেও ভৃত্য নিদান কমলার মনকে যতটুকু না ব্যথিত করে, তার চেয়েও মামার একটি চিঠির আঘাতের তীব্রতা ছিল অনেক বেশি। ধনাঢ্য পরিবেশে লালিত হয়েও মৈষাল বন্ধুর নিম্নবিত্ত গৃহে কমলার স্বাধীন অথচ কঠোর জীবন-যাপনে কোন ক্লান্তি ছিল না।

কমলা যৌবনময়ী প্রণয়িনী। কিন্তু তার প্রণয়-বাসনা মুক্তপ্রেমের আদর্শে পল্লবিত কিংবা দায়িত্বজ্ঞান বর্জিত নয়। পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে তার প্রণয়বাসনা সংযত ও যুক্তিশাসিত। জমিদার পুত্রের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বৈবাহিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতাকে বিলম্বিত করার পেছনে তার মর্যাদাপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাই সক্রিয় ছিল। কমলার

Dhaka University Institutional Repository

দেহসৌন্দর্য ও আত্মমর্যাদাবোধ যেমন তার নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রেও এ দুই উপাদানই সমানভাবে সক্রিয় থেকেছে। শেষ পর্যন্ত কমলার বুদ্ধিমত্তাই হয়ত তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারে এবং আনন্দময় জীবনে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করেছে।

কমলার জীবনে দুঃখ-বেদনা আছে; সাফল্যও আছে। প্রকৃতপক্ষে কমলার জীবনে দুঃখের জন্য দায়ী ছিল সমাজ। সমাজের প্রবল শক্তি হল পুরুষ; সমাজকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নারীকে সুন্দরী হতে হয়, পুরুষরা তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। পুরুষের এই নিষ্ঠুর খেলায় কেউ বাঁচে, কেউ মরে, মহুয়া, মলুয়া মরে; কমলা মরতে মরতে বেঁচে যায়।

৫). লীলা

ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়গত দৌর্বল্যের সংঘাত 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় বর্ণিত হতে দেখা যায়। নর-নারীর পার্থিব প্রেম-ভালবাসার উর্ধ্বে মানবপ্রীতি সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম তারই বর্ণনাত্মক কাহিনী আলোচ্য পালাটির বিষয়বস্তু। তাইতো মানবিক অনুভূতিতে উজ্জ্বল চরিত্র লীলা নিজে মাতৃহীন হয়ে মাতৃহারা কঙ্কের হৃদয়-বেদনাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে প্রণয়িনী সত্তার বিকাশ ঘটে এবং সহানুভূতিজাত মাতৃত্বও সক্রিয় হয়ে ওঠে। কঙ্কের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ লীলা, কৈশোর ও যৌবনে তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত হতে দেখা যায়। কঙ্কের প্রতি মুগ্ধতা রূপান্তরিত হয় প্রেমে। তখন এক মুহূর্তের বিরহও তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে-

নয়নের কাজলরে বন্ধু আরে তুমি গলার মালা
একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা ॥ (কঙ্ক ও লীলা)

কঙ্ক সম্পর্কে লীলার হৃদয় দৌর্বল্যের পরিচয় পাওয়া যায় তারই জবানীতে-

তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইরা রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইব কোথা ॥ (কঙ্ক ও লীলা)

*　　*　　*

তুমিরে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতি-কূল ॥
ধেনু বৎস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে।
বন্দের লাইগা থাকি চাইয়া পথ পানে ॥
পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুরে আখি-জলে।
পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে ॥ (কঙ্ক ও লীলা)

পরবর্তীকালে বিভ্রান্ত পিতার হত্যা পরিকল্পনা থেকে উদ্ধারের জন্য কঙ্ককে বিদেশ গমনের পরামর্শ দান এবং বিদেশ যাত্রার পর বিরহকাতর লীলার অস্বাভাবিক বিচলিত অবস্থা এবং কঙ্কের মৃত্যু সংবাদ শুনে নিজেও মৃত্যুযাত্রী হওয়ার মধ্যে একজন অসহায় বাঙালি নারীর বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়েছে। তার প্রণয়ে একনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও প্রণয়ীর কল্যাণ কামনায়ই তার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টচার্য লীলা চরিত্রটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"লীলার চরিত্রটি ভুলুণ্ঠিতা একটি লতার মত- বাল্যে জননীর এবং যৌবনে প্রণয়াস্পদের আশ্রয়চ্যুতা।"[২৮]

শত দুঃখেও লীলার আশা ছিল মাধব কঙ্কের সন্ধান পেয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে আশা তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক পর্যায়ে লীলার কানে যায় কঙ্কের মৃত্যু সংবাদ। লীলা কঙ্কের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তার জীবনের প্রতি যেন আর কোন আকর্ষণ থাকে না। আশাহত হয়ে তিলে তিলে তাকে মৃত্যুপথযাত্রী হতে দেখা যায়।

বাচিয়া নাহিক কঙ্ক রইব কোন আশে।
সে দেশ গিয়াছ বন্ধু যাইব সেই দেশে ॥ (কঙ্ক ও লীলা)

লীলা মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে বিচ্ছেদ বেদনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। এভাবেই হতভাগিনী লীলা অতৃপ্ত প্রেম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় জীবনবিচ্ছিন্ন, শাস্ত্র-শাসিত ও সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্য সমাজের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি হিসেবে তাদের পরিচয় পরিস্ফুট না হলেও গোষ্ঠী হিসেবে কঠোর মনোভঙ্গি, অন্ধ শাস্ত্র-প্রীতি, অমানবিকতা, এমনকি কুৎসা প্রচারের মতো নীচতা-হীনতার প্রকাশও তাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। 'মহুয়া' পালায় হুমরা মহুয়ার হাতে 'বিষলক্ষ্মের ছুরি' তুলে দিয়েছিল নদের চাঁদকে হত্যা করার জন্য। 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় গর্গ বিষমিশ্রিত ভাত তুলে রাখে কঙ্ককে হত্যা করার জন্য। হুমরা বেদে ও গর্গ পণ্ডিতের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কোন স্খলন সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে ক্ষমা পায় না।

৬). সুনাই

'দেওয়ান ভাবনা' পালায় সুন্দরী রূপসীকন্যা সুনাই-এর আত্মবিসর্জন মলুয়া পালাটির মতই সামাজিক অবিচারের আর একটি চিত্র। তার রূপ তার বৈরী। প্রবল দেওয়ান দুর্বল প্রজাকে বন্দী করে হীন অভিলাষ চরিতার্থ করতে চায়। নিজে বন্দীত্ব বরণ করে বন্দী স্বামীকে মুক্ত করেছে সুনাই। শ্বশুর জেনে শুনে এ পথে তাকে ঠেলে দিয়েছে। পতিপরায়ণা সতী সুনাই এর আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সমাজে পুরুষ স্ত্রীকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। আবার পুরুষের নিরাপত্তার কারণে স্ত্রীকে জীবন দিতে হয়।[২৯] সুনাই ও মাধবের সুখী দাম্পত্য জীবনে দেওয়ান ভাবনার আবির্ভাব দুষ্ট গ্রহের মত। ক্ষমতার দম্ভ সমাজের গভীরে দুষ্ট ক্ষতের মতই ক্রমবর্ধমান। যার ফলে বহু নারীর জীবন দুর্বিসহ পরিণতিতে পর্যবসিত হয়েছে। দেওয়ানভাবনা সুনাই ও মাধবের জীবনকে আবিলতার পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে।

সক্রিয়তায়, সাহসিকতায়, একনিষ্ঠ প্রণয়ে, আন্তরিকতায় ও আত্মত্যাগের মহিমায় সুনাই চরিত্রটি দেওয়ান ভাবনা গাথায় উজ্জ্বলত চরিত্র। সুনাইর আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ-মাতুলের হীন বিষয়লোভী মানসিকতার ফলে তার জীবনে ঘটে বিপর্যয়। শাসনশক্তির উচ্ছিষ্টভোগী, গ্রামীণ জীবনের আবহে লালিত ও ক্ষুদ্র নীচ মানসিকতা সম্পন্ন বাঘরা নামক ব্যক্তির মাধ্যমে সুনাইয়ের দেহসৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে দেওয়ান তাকে অপহরণে উদ্যত হয়। মাতুল ব্রাহ্মণ ভাটুক-ঠাকুর দেওয়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে বরং তাতে সম্মতি দেয়। অপহরণের পূর্বে তাকে উদ্ধারের জন্য মাধবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে সুনাই সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। তার চরিত্রের গৌরবময়তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে তার আত্মবিসর্জনের ঘটনায়। পতি ও প্রণয়ী মাধবের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই সে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়। পতির প্রাণ রক্ষায় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বাঙালি নারী চরিত্রে প্রায় ঐতিহ্যগত হলেও, সুনাইয়ের আত্মদান ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্বে উজ্জ্বল। স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য সে অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার সাহস দেখিয়েছে--

> "প্রেমিককে বাঁচাতে সে মূর্তিমান কামের নিকট নিজেকে সমর্পন করেছে। বিষপানে মৃত্যু বাইরের রূপকমাত্র, না দেখালেও কাহিনীর মাহাত্ম্য কিছুমাত্র খর্ব হত না, বৃদ্ধিই পেত।"(৩০)

মাধবের সঙ্গে প্রণয়াসক্তির প্রথম পর্যায় থেকে আত্মদান পর্যন্ত সর্বত্র সুনাই চরিত্রটি সক্রিয়তায় ও একনিষ্ঠতায় উজ্জ্বল। কোন প্রকার সংকীর্ণতা তার চরিত্রে প্রবেশ করেনি। বরং ঔদার্য ও মহত্বই সর্বত্র পরিস্ফুট হয়েছে। আত্মদানের ঘটনার বাইরেও সবসময়ই সে প্রণয়ীর কল্যাণ কামনায় ছিল আন্তরিক। এমনকি দেওয়ানের বাহিনীর দ্বারা অপহৃত হওয়ার পরও তার উদ্ধারকল্পে মাধবের বিলম্বের জন্য তার প্রতি সে ক্ষুব্ধ নয়, বরং নিজ বিপদের মধ্যেও প্রণয়ীর বিপদাশঙ্কা করে সে উদ্বিগ্ন। এ মানসিকতায় সুনাইয়ের প্রণয়-মহত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঃ

> আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল কেরে।
> না জানি পরানের বন্ধু পড়িল কি ফেরে ॥
> না আইল না আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে।
> না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে ॥ (৩১) (দেওয়ান ভাবনা)

মাত্র কয়েক মণ ধানের লোভে বাঘরা সুনাইয়ের দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধে দেওয়ানকে অবহিত করে দেওয়ানের নারী লালসা চরিতার্থ করার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বাঘরার ক্ষুদ্রতাকেও অতিক্রম করে গেছে ব্রাহ্মণ ভাটুক ঠাকুরের সংকীর্ণ লোভ। সুনাইয়ের সঙ্গে ভাটুক ঠাকুরের যে কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক, তা-ই নয়, এই পিতৃহীনা অসহায় বালিকা তারই গৃহে আশ্রিতা। কিন্তু যখন সে বৈষয়িক সম্পদের বিনিময়ে ঐ বালিকাকে মুসলমান দেওয়ানের নিকট সমর্পণের প্রস্তাব পেয়েছে, তখন তার মধ্যে ধর্মনীতি, অভিভাবকের কর্তব্যচিন্তা, মানবিকতা, বিবেকবোধ কোন কিছুই জাগ্রত হয়নি। একমাত্র সম্পদের লোভে অন্ধ হয়ে ভাটুক ঠাকুর নিজ ভগিনী-কন্যাকে লোভী দেওয়ানের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছে।

সমাজ যে ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা দিতে অপারগ নারীকেই তখন খুঁজে নিতে হয় নিরাপদ আশ্রয়। সে আশ্রয় একমাত্র মৃত্যুতেই পাওয়া সম্ভব- এ সত্য গীতিকার নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বলেই তাদের প্রতিবাদী চেতনা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অবিনশ্বরত্ব লাভ করেছে।

কাহিনীর প্রেক্ষাপটে তৎকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাচারিতা, অমানবিক কার্যকলাপ দুর্বলের উপর যে নিগ্রহ সাধন করেছে সেটা ছিল মূলত পশুপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। পালাটির বিয়োগান্তক পরিণতিতে সুনাই এর জীবন-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মলুয়া, ভেলুয়া, মদিনা প্রভৃতি নারীর মতই দ্বিধাহীন আত্মশক্তি নির্ভর। আপন অস্তিত্বের মর্যাদা ও সতীত্ব রক্ষায় তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পশুশক্তির কাছে পরাজিত হওয়ার ক্ষেত্রে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আত্মবির্জন ছাড়া যেন গত্যন্তর ছিল না গীতিকার এসব নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে। ফলে আত্মা-বিক্রয়ের পরিবর্তে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে মুক্তির অনুসন্ধান পরিত্রাণ লাভের একমাত্র অবলম্বন- যা সুনাই-এর ক্ষেত্রে অম্লান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৭). মদিনা

দেওয়ানা মদিনা গাথার অত্যন্ত উজ্জ্বল চরিত্র মদিনা। একনিষ্ঠ প্রণয় বাসনার আদর্শেই তার চরিত্র মহিমান্বিত। গীতিকার অন্যান্য নারী চরিত্র আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ সৃষ্টি করে যেভাবে মহিমান্বিত হয়েছে; তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু গুণ আমরা মদিনা চরিত্রে দেখতে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

দুলালের প্রতি মদিনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা কৃষি ও কৃষক জীবনের গার্হস্থ্য পটভূমিতে বিধৃত হয়েছে। চাষাবাদ অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ধিত হয়েছে তাদের প্রণয়াবেগ-

লক্ষ্মী না আগন মাসে বাওয়ার দাওয়া মারি।
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাড়ি ॥
দুইজনে বস্যা পরে ধান দেই উনা।
টাইল ভরা ধান খাই করি বেচা কিনা ॥ (দেওয়ানা মদিনা)

প্রণয়ের এ গভীরতর ব্যঞ্জনা এবং চারিত্রিক সহজ সরলতার কারণেই মদিনা তালাকনামাকেও বিশ্বাস না করে তার বাস্তবতাকে হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছিল।

তালাকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি ॥
আমার খসম না ছাড়িব পরান থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে ॥ [৩২] (দেওয়ানা মদিনা)

পতির প্রতি তার বিশ্বাস এবং আশাবাদ গভীর প্রণয়াবেগেরই ফল। কিন্তু দুলাল কর্তৃক নিজ পুত্রকে প্রত্যাখ্যানের ঘটনায় তার আশাভঙ্গ হয়েছে। আশা ভঙ্গের এ বেদনা তার জন্য এতই অস্বাভাবিক ও মর্মান্তিক এবং এর আঘাত এতই অসহনীয় যে, এর ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। প্রণয়ে একনিষ্ঠা, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত কৃষক কন্যা মদিনা লোকসাহিত্যের সীমা অতিক্রম করে চিরায়ত সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে।[৩৩]

বিনা দোষে মদিনার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছে এবং দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছে। এতদসত্ত্বেও মদিনা স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কটূক্তি করেনি। কোন অভিযোগের আঙ্গুলি নির্দেশ করেনি। শুধু দুঃখ করেছে, অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে। ইচ্ছে করলেই সে দুলালের নিষেধ সত্ত্বেও বান্যাচঙ্গে উপস্থিত হয়ে দুলালের ভালমানুষীর মুখোশ খুলে দিতে পারত। কিন্তু পাছে তার প্রিয়তমের সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় তাই কোন প্রকার প্রতিহিংসা পরায়ণতার পরিচয় সে দেয়নি। নিজের দুঃখ নিজেই ভোগ করেছে, কাউকে তার জন্য দোষী সাব্যস্ত না করে অকালে বিদায় নিয়েছে। দেওয়ানি আভিজাত্যের শিকার হয়েছে মদিনা, সামন্ত স্বার্থের বলি হয়েছে সে।[৩৪]

ময়মনসিংহ গীতিকাগুলোর ভিতর দিয়ে নারীশক্তির বিভিন্ন দিকের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে- মদিনা চরিত্র তাদেরই যে কেবল অন্যতম তা নয়, কতগুলো দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে মনে হয়; কারণ তার এর একটি সহজ সরল গার্হস্থ্য রূপ আছে, এ রূপটি কেবলমাত্র কল্পনাশ্রিত বা আদর্শায়িত নয় বলেই বাস্তব ও জীবন্ত। সেজন্য এ রূপটি চোখের সামনে যেন সহজেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। "কেবলমাত্র অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সম্মুখ সংগ্রাম কিংবা আত্মত্যাগের ভিতর দিয়াই যে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা নহে- নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়াও যে তাহার এক অপূর্ব মহিমা প্রকাশ পাইতে পারে, মদিনার জীবনে তাহাই দেখা যায়।"[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

মদিনার সকরুণ প্রতীক্ষার মধ্যে এক শোকর্ত দৃষ্টি আছে, এক ব্যথা-বিধুর বিশ্বাস আছে, এ বিশ্বাস অনেকটাই যেন ভাবনিষ্ঠ। সমস্ত প্রাণ দিয়ে যেখানে সে একদিন তার স্বামী প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করেছে, সেখানে এ বিশ্বাস না এসে পারে না। শেষ পর্যন্ত তার এ বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা পেয়েছিল- তার প্রেমের আকর্ষণেই তার অনুতপ্ত স্বামী একদিন অলীক দেওয়ানির মোহ ত্যাগ করে তার কাছে ফিরে এসেছিল। সেদিন সে আর নিজে বেঁচে ছিল না, তার প্রেম বেঁচে ছিল। তাইতো সংসারের সকল আকর্ষণ ত্যাগ করে মদিনার কবরের উপর কুটীর নির্মাণ করে ফকির সেজে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। মদিনার নিঃস্বার্থ প্রেমই তাকে এই আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

নারীকে যুগে যুগে বিভিন্ন সামাজিক অনাচারের যূপকাষ্ঠে আত্মদান করতে হয়েছে। মদিনা তাদেরই একজন যারা সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে শুধু প্রতিকারহীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মলুয়া, ভেলুয়া, সুনাই সখিনা প্রভৃতির মত সমাজ শক্তির অসহায় শিকার হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

মদিনা পালাটির ট্রাজিক পরিণতির পিছনে দুটি অসম সমাজের নীতিহীন আচরণ মূলত দায়ী। একদিকে কৃষক সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থকেন্দ্রিক চেতনার দ্বৈত সংঘাতের ফলে মদিনাকে অস্বীকার করায় দুলালের মানসিকতা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। পরিশেষে বিবেকের তাড়নায় দুলালের সম্বিত ফিরে এলেও মদিনাকে না পাওয়ার বেদনাই তাকে করেছে সংসার-বিমুখ। এক্ষেত্রে দুলালের মধ্যে দ্বৈত সংঘাতের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক মূল্যবোধের কারণে যে আভিজাত্যের চেতনা তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে দিয়েছিল, পরবর্তী পর্যায়ে মানবিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ বাস্তব সত্যের অন্তরালে জীবন সত্যের মহিমা প্রচার করেছে।

অসার দুনিয়াই দুই দিন সুখের লাগিয়া
জান্যা বুঝ্যা লইলাম আমি দুজখ বাছিয়া ॥[৩৬] (দেওয়ানা মদিনা)

দুলালের এই মোহমুক্তি সমাজ সংসারের নিগূঢ় বন্ধন থেকে আত্মমুক্তি- যা শুধু বেদনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। মদিনার পতিপ্রেম এ কারণেই তার মৃত্যুর মাধ্যমে শাশ্বত চিরন্তনতা লাভে সমর্থ হয়েছে।

৮). কাজলরেখা

রূপকথা জাতীয় কাহিনী হয়েও নৈতিক আদর্শের মাধ্যমে 'কাজলরেখা' পালাটির বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে রেখাপাত করে। কঠোর সাধনার দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ সম্ভব- কাজলরেখা তার প্রমাণ দিয়েছে। সাধু ধনেশ্বরের বিবাহযোগ্যা অপরূপ সুন্দরী কন্যা কাজলরেখাকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হয়নি। এক সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রদত্ত শুকপক্ষী ধনেশ্বরকে জানায়, এক মরা স্বামীর সঙ্গে কাজলরেখার বিয়ে হবে। সে অনুযায়ী সওদাগর মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেও কাজলরেখাকে বনবাসে দিলেন এবং বললেন-

বাপ হইয়া মরার কাছে কন্যা দিলাম বিয়া।
গিরেতে ফিরিবাম আমি কিবা ধন লইয়া ॥
শুনলো পরানের ঝি কইয়া যাই আমি।
সামনে আছে মরা কুমার সেই তোমার স্বামী ॥ (কাজলরেখা)

নিয়তির বিশ্বাস ভারতবাসীর মজ্জাগত। কাজলরেখা তার ভবিতব্যকে মেনে নেয়। সে তার মৃত স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে-

যে হও সে হও প্রভু তুমি তো সোয়ামী
যতকাল দেহ তোমার ততকাল আমি ॥ (কাজলরেখা)

Dhaka University Institutional Repository

অসীম ধৈর্য্যশক্তি সম্পন্না কাজলরেখাকে আমরা দীর্ঘ সাতদিন ধরে মৃত স্বামীর দেহ থেকে সূঁচ তুলতে দেখি। অত্যন্ত সহজ-সরল স্বভাবের কাজলরেখার মনে ছিল না কোন জটিলতা। তাই এক পিতাকে পেটের দায়ে কন্যা বিক্রি করতে দেখে কাজলরেখা মেয়েটিকে তারই মত জনম দুঃখিনী মনে করে নিজ হাতের কঙ্কনের সাহায্যে কিনে নেয়-

কর্ম্মদোষে কাজলরেখা হইছিল বনবাসী।
কঙ্কন দিয়া কিন্‌ল ধাই নামে কঙ্কনদাসী ॥ (কাজলরেখা)

অতঃপর তার স্বামীর জীবনপ্রাপ্তির একান্ত গোপন তথ্যটি জানিয়ে দেয় এবং বলে, সে যেন মন্দিরে উপস্থিত হয়ে গাছের পাতার রস করে রাখে। কাজলরেখা স্নান সেরে গিয়ে রাজপুত্রের চোখের দুটি সূঁচ তুলে নিয়ে ঐ রস লাগিয়ে দিলেই রাজকুমার বেঁচে উঠবে। তখন কঙ্কন দাসী মন্দিরে ঢুকে মৃত রাজকুমারের চোখ থেকে সূঁচ দুটি তুলে নিয়ে তার চোখের পাতায় রস লাগিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার বেঁচে উঠল। দাসী নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে রাজকুমারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। আর হতভাগিনী কাজলরেখার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিড়ম্বনা শুরু হয়। সে স্নান সেরে মন্দিরে এসে দেখল তার পরিশ্রমলব্ধ ফল দাসী হস্তগত করে নিয়েছে। দাসী কাজলরেখাকে কঙ্কনদাসী বলে রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কাজলরেখা দাসীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও প্রতিবাদী না হয়ে নীরবতা অবলম্বন করে। ফলে-

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
কর্মদোষে কাজলরেখা জন্ম অভাগিনী ॥ (কাজলরেখা)

ভাগ্যবিধাতার নির্দেশেই যে দাসী, সে রাণী হয়। আর যে রাণী, সে দাসী হয়ে তার পদসেবা করে। রাজবাড়ীতে কাজলরেখাকে দাসীগিরি করতে হল। আর নকল রাণী দিব্বি ভোগসুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। রাজকুমার কাজলরেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। কিন্তু কাজলরেখা ধরা না দিয়ে বলে-

আমি যে কঙ্কনদাসী রে রাজা শুন দিয়া মন।
তোমার রাণী কিনল দিয়া হাতের কঙ্কন ॥ (কাজলরেখা)

ধনী পরিবারের কন্যা হয়েও কাজলরেখা ঘর গৃহস্থালীর কাজেও ছিল দক্ষ। রাজকুমারের বন্ধুকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করা হলে তার জন্য কাজলরেখা যেসব উপাদেয় খাবার তৈরি করে তা থেকেই আমরা তার রন্ধনে পারদর্শিতার পরিচয় পাই-

ভোরেত উঠিয়া কন্যা ভোরের সিনান করে / শুদ্ধ শান্তে যায় কন্যা রন্ধনশালার ঘরে ॥
উবু কইরা বান্ধ্যা কেশ আইট্যা বসন পরে / গাঙ্গের না পানি দিয়া ঘর মাজন করে ॥
মশল্লা পিটালী লইল পাটাতে বাটিয়া / মানকচু লইল কন্যা কাটিয়া কুটিয়া ॥
জোড়া কইতর রান্ধে আর মাছ নানা জাতি / পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী ॥
নানাজাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত / চন্দ্রপুলী করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত ॥
চই চপড়ি পোয়া সুরস রসাল / তা'দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল ॥
ক্ষীরপুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া / রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া ॥
উত্তম কাঠালের পিড়ি ঘরেতে পাতিল / ছিটা ছড়া দিয়া কন্যা পরিচ্চন্ন কইল ॥
সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কন সাইলের ভাত / ঘরে ছিল পাতি নেম্বু কাইট্টা দিল তাত্ ॥

Dhaka University Institutional Repository

সোনার বাটিতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর / ঘরে মজা সবজি কলা কইরা দিল চির ॥
সোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি / তাম্বুলে সাজায় কন্যা সোনার বাটাখানি ॥
কেওড়া খয়ার দিল কন্যা গন্ধের লাগিয়া / রন্ধনশালা ঘরে রইল রান্ধিয়া বাড়িয়া ॥

সূক্ষ্মভাবে আল্পনা আঁকতেও তার দক্ষতার জুড়ি নেই-

উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া / ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া ॥
পিটালী করে কন্যা পরথমে আঁকিল / বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল ॥
জোরা টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া / মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষীর পারা ॥
শিব-দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন / পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষী নারায়ণ ॥
হংসরথে আঁকে কন্যা জয়া-বিষহরী / ডরাই ডাকুনী আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী ॥

বন দেবী আঁকে কন্যা সেওরার বনে / রক্ষাকালী আঁকে কন্যা রাখিতে ভূবনে ॥
কার্ত্তিক গণেশ আঁকে কন্যা সহিত বাহনে / রাম সীতা আঁকে কন্যা সহিত লক্ষণে ॥
গঙ্গা গোদাবরী আঁকে হিমালয় পর্ব্বত / ঈন্দ্র যম আঁকে কন্যা পুষ্পকের রথ ॥
সমুদ্র সাগর আঁকে চান্দ আর সূরুযে / ভাঙ্গা মন্দির আঁকে কন্যা জঙ্গলার মাঝে ॥
শেজেতে শুইয়া আছে মরা সে কুমার / কেবল নাই সে আঁকে কন্যা ছবি আপনার ॥
সুইচ রাজার ছবি আঁকে পাত্রমিত্র লাইয়া / নিজেরে না আঁকে কন্যা রাখে ডাড়াইয়া ॥
আলিপনা আঁইক্যা কন্যা জ্বালে ঘির্তের বাতি / ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল পন্নতি ॥(কাজলরেখা)

রন্ধনকর্মের আর আলপনা অঙ্কনের মাধ্যমেই কাজলরেখা সুকৌশলে আপনার পরিচয় প্রকাশ করার সুযোগ করে নেয়। কে রাণী, কে দাসী, রাজা তা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। কাজলরেখার সাথে স্বামীর মিলন হয়।

ভাগ্যের ক্রীড়নক হিসাবে আমরা কাজলরেখাকে চিহ্নিত করতে পারি। বিধি বাম হলে সাফল্যে পৌঁছেও ভাগ্যের বিড়ম্বনা রোধ করা সম্ভবপর হয় না। কাজলরেখা ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী হিসেবে আমাদের হৃদয়ের স্থান করে নিয়েছে। শুধু রূপজমোহ নয়, কাজলরেখার সংযম, ধৈর্য, চারিত্রিক গুণাবলী ও শুচিস্নাত পবিত্রতা রাজপুত্রকে বেশি আকৃষ্ট করে। যে কন্যা তার নিজশক্তি দ্বারা মৃতকল্প স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, সেই কন্যার সত্য পরিচয় তার সেবা, ধৈর্য, সংযম ও নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে রাজপুত্রই প্রকৃত কাজলরেখাকে একদিন খুঁজে পেয়েছে। সত্যের জয় হয়েছে, নিয়তি তথা মিথ্যা পরাজিত হয়েছে।

৯). মাণিকতারা

মাণিকতারা পালার প্রধান বৈশিষ্ট্য মাণিকতারার বীরত্ব, সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধির উৎকর্ষ- বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে চারিত্রিক গুণাবলীকে প্রাধান্য দিয়েছে। কালু চোরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবেলা করতে গিয়ে যখন বাসুর জীবন এবং নিজের ইজ্জত বাঁচানোর সমস্যা দেখা দিল তখন সে প্রচণ্ড সাহস ও বুদ্ধির কৌশলে কালুকে দলবলসহ হত্যা করে বাসুকে নিষ্কন্টক করে বসল। চোরেরা মাণিকতারার ক্ষমতা এবং সাহসের পরিচয় আগেই অবগত ছিল-

মাণিকতারারে চিইন্যাছে তারা সেইনা বিষম রাইতে।
একলা মাইয়া মওরা নিল দুই কুড়ি ডাকাতে ॥
এরপর মাণিকতারা হইল সগল ডাকাইতের ছরদার।
বরমপুত্রের উজান ভাডিত্ নাম হইল তাহার ॥ (মাণিকতারা ডাকাইত)

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় কুড়ি বছর এভাবে মাণিকতারা ডাকাতদলের দলনেত্রী হিসাবে কাজ করেছে। দেশের দেওয়ান, কাজি, জামিদার প্রভৃতি তাকে ভয় করে চলত। তার খাজনা, সেলামী বরাদ্ধ ছিল। অন্যথা ঘটলে তাদের নিস্তার ছিলনা। মাণিকতারার অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা পালাটি সমৃদ্ধ হলেও মাণিকতারা চরিত্রের উপর দুটি প্রভাবের কার্যকারিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদিকে মাণিকতারার দুর্দান্ত সাহস এবং তেজস্বিতা অন্যদিকে নারীত্ববোধ। একাধারে সামাজিক ও আঞ্চলিক প্রভাবমুক্ত নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্যের আলোকে মাণিকতারা ডাকাত সর্দার হয়েও অনন্যা নারীরূপে চিত্রিত হয়েছে। যে কোনরূপ সমস্যার মোকাবিলা করতে তাকে সংশয়াবিষ্ট হতে হয়নি। উপস্থিত বুদ্ধি ও চাতুর্যের ফলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে সে ভুল করেনি। প্রণয় এবং পরিণয়ের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত হয়নি। পরিশেষে সংসার জীবনে স্বামী বাসুর জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলতে তার কষ্ট হয়নি। স্বামী সংসারের প্রতি মাণিকতারার ছিল গভীর অনুরাগ। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ডাকাতিকার্যকে সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। দলপতি হিসেবে অক্ষম স্বামীর কর্তব্য এবং দায়িত্বের বোঝা দলীয় স্বার্থে বহন করার তাগিদ অনুভব করেছে দুটি কারণে। প্রথমত দাম্পত্য প্রেমের গভীরতা, দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক প্রভাবমুক্ত মনোভাব। লক্ষণীয়, মৈমনসিংহ গীতিকার প্রায় সকল কাহিনীর নারী চরিত্রের মত মাণিকতারা সাহসী, ত্যাগী, বুদ্ধিমতী, স্বকীয় চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে আপন সত্তার প্রাধান্যকে স্বীকৃতি প্রদান করার মত আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শুধুমাত্র ধর্মীয় চেতনার সংস্পর্শে কেনারাম, নেজাম ডাকাত, মনসুর আলীর মাঝে কখনো কখনো মানবিক বোধ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মাণিকতারার ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেটি তার অহংবোধ, যার ফল একদিকে তার তেজস্বিনী দুর্ধর্ষ সাহসিকতার পাশাপাশি পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর কল্যাণীরূপ ও পরোপকারী মনোবৃত্তি, অন্যদিকে ডাকাতের দলনেত্রী হিসাবে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না রুদ্রানী রূপ। তার ছিল প্রচণ্ড মনোবল। কোনরূপ বাঁধা এলে নতি স্বীকার না করাই ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তার এই অহংবোধের পরিণাম ফল শোচনীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাসু নববিবাহিত মাণিকতারাকে গৃহে একাকিনী রেখে তার জীবিকায় ব্যস্ত থাকা প্রসঙ্গে শঙ্কা প্রকাশ করলে মাণিকতারা জানিয়েছে- সে অবলা নারী নয়-

> বিশ যোয়ানের মাথা আমি একলা খাইতে পারি। (মাণিকতারা ডাকাইত)

মাণিকতারা এক বাটুলে পাঁচটি শিকারেও সক্ষম ছিল। শুধু তাই নয়-

> শতেক দুশমন যদি সামনে হয়রে খাড়া।
> তীর ধুনকী হাতে থাইক্‌লে একলা একশ মাণিকতারা ॥ (মাণিকতারা ডাকাইত)

বাস্তবে ভীষণ প্রকৃতির কালু যখন বাসুর গৃহ আক্রমণ করেছে, তখন বীরাঙ্গনার ভঙ্গীতে মাণিক তাকে তার মোকাবেলা করছে।

প্রেমের শক্তিতে গীতিকার নারী চরিত্রগুলো অতুলনীয়। কিন্তু শৌর্যে, বীর্যে মাণিকতারার অনুরূপ নায়িকা চরিত্রের সন্ধান শুধু গীতিকাতেই নয়, বাংলা সাহিত্যেও খুব একটা দেখা যায় না। মানিকতারা চরিত্রের শৌর্য, বীর্য ছাড়া অপর যে বেশিষ্ট্য আমাদের নজর কাড়ে, তা তার প্রাতিব্রত্য। বাসুকেই সে তার ধর্ম-কর্ম-গতি বলে জেনেছে এবং সেরকম আচরণই করেছে। স্বামী বাসু কর্মক্ষমতা হারালেও মাণিকতারা তাকে কখনও অবজ্ঞা করেনি। একদিকে যেমন ডাকাতি করে সংসার প্রতিপালন করেছে, তেমনি অন্যদিকে স্বামীকে খাইয়েছে, তাকে যত্ন করেছে-

Dhaka University Institutional Repository

ঘরে আইসা মাণিতারা কোনকাম করে।
পরান ঢাইলা সেবা যতন করে সোয়ামীরে ॥
ভালা খাওন ভালা পিঁধন ভালা বিছান ঘরে।
সব্ব সুখে রাইখ্যাছে মাণিক আপন সোয়ামীরে ॥ (মাণিকতারা ডাকাইত)

১০). আয়নাবিবি

আয়নাবিবি চরিত্রটি আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। যে নিরুদ্দেশ স্বামীর কারণে আয়নাকে আমরা অনিশ্চিত পথের পথিক হতে দেখি, যে পতিপ্রেমকে সম্বল করে আয়না নির্জন পথে-প্রান্তরে, পুকুর পাড়ে, নদীর ধারে স্বামীকে খুঁজে বেড়িয়ে গৃহে ফিরিয়ে এনেছে, সেই স্বামীই সমাজ প্রদত্ত বিধান মেনে নিয়ে আয়নাবিবিকে ছেড়ে গেছে, পরিত্যাগ করেছে। আয়নার জন্য এক সময় তার যে স্বামী গৃহত্যাগী হতে চেয়েছিল, আজ সে স্বামী আয়নাকে ভুলে গিয়ে সমাজের দেয়া দুঃশাসনকে নতমস্তকে মেনে নিয়ে, সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে আত্মসর্ম্পণ করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'কুরুঞ্জিয়া' নারীর ছদ্মবেশে আয়নাবিবি স্বামীগৃহে উপস্থিত হলে উজ্জ্বালের মা-বোন তাকে সহজেই চিনতে পারে এবং গৃহে আসার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু উজ্জ্বাল তাকে বিন্দুমাত্রও আঁচ করতে পারেনি।

আয়নার চিরপরিচিত স্বামীগৃহে আজ সে অবাঞ্ছিত, অবহেলিত, অনভিপ্রেত। যে গৃহ তার দীর্ঘদিনের স্মৃতি বিজড়িত, সে-গৃহে আছে আজ সে অপরিচিত, অতিথির মত। তাই-

আস্তে আস্তে যায় কন্যা
আরে আপনার বাড়ীরে ॥
পাও নাই সে চলে কন্যার
আরে হিয়া কাঁপে থরথরিয়ে ॥ (আয়নাবিবি)

দীর্ঘদিন পরে স্বামী গৃহে উপস্থিত হয়ে আয়না উঠানের কিনারায় তার লাগানো মেন্দি গাছটি দেখতে পায়- যেটিতে সে কত না পানি দিয়েছে, যত্ন করেছে, পরিচর্যা করেছে। কিন্তু আজ আর এখানে তার যেন কোন অধিকার নেই। আয়নার মনে তখনও ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত উজ্জ্বাল তাকে ত্যাগ করলেও বিস্মৃত হবে না, তাকে পরিত্যাগ করে নূতন করে সংসার পাতার কথা আয়না কল্পনাতে স্থান দেয়নি। কিন্তু আয়না যখন নিজের চোখেই দেখল- উজ্জ্বাল দিব্বি বিবাহ করে স্ত্রী-পুত্রসহ সংসারে মত্ত হয়েছে, তখন আয়না ভাবে-

সোয়ামী তার পর হয়্যাছে
আর ত আশা নাই রে ॥
বিয়া কইর‍্যা মামুদ উজ্জ্বাল
আজ সুখে বইসা খায় ॥ (আয়নাবিবি)

আমরা দেখতে পাই, আয়নার জন্য তার ননদ-শাশুড়ীর ব্যাকুলতা কম ছিলনা। যে কথা বলা উচিত ছিল উজ্জ্বালের, তাই বলেছে তার মা-

আয়না যদি হইয়া থাকছ্লো কন্যা
আলো কন্যা, ঘরে ফিইরা আয় ॥
পান-পঞ্চাইত ছাড়বাম লো কন্যা
আমি না ছাড়বাম তোমায় ॥ (আয়নাবিবি)

Dhaka University Institutional Repository

আজ আয়নার সব থেকেও কিছুই নেই। স্বামী-সংসার-শ্বশুরালয়, ননদ-শাশুড়ী সবই আছে কিন্তু এসব কিছুরই অধিকার নেই তার। তাই আশাভঙ্গ হয়েছে আয়নাবিবির। আশাভঙ্গের এ বেদনা সহ্য হওয়ার নয়। আয়নাও স্বচক্ষে এসব দেখে এসে তা সহ্য করতে না পেরে ভরা গাঙে ডুবে আত্মবিসর্জন দেয়-

আষাঢ়িয়া তোড়ের নদী
ঢেউয়ে ভাইস্যা যায় ॥
কাঞ্চা সোনার তনু কন্যা
হায়রে জলেতে ভাসায় ॥ (আয়নাবিবি)

স্বভাবতই আয়নার জন্য আমাদের মন সিক্ত হয়ে ওঠে। আয়নাবিবির এমন পরিণতি আমরা যেন সহজে মেনে নিতে পারি না। সামাজিক অনুশাসনের নাগপাশ থেকে গীতিকার অন্যান্য নারীর মত আয়না পারিবারিক স্বার্থে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে বঙ্গরমণীর সর্বত্যাগী রূপটিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে।

১১). সখিনাবিবি

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' সখিনাবিবি গীতিকায় সখিনা-চরিত্রটি কেবল এ গাথার উৎকৃষ্ট চরিত্রই নয়, সমগ্র ময়মনসিংহের গীতিকায়ও তার মতো বীর্যবতী, সাহসী, বুদ্ধিমতী নারী চরিত্র দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। প্রথম দর্শনেই সখিনা ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের প্রতি অনুরাগ অনুভব করেছে। অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে ফিরোজ খাঁর সৈন্যবাহিনী যখন তার পিতৃগৃহ আক্রমণ করেছে, তখনও যেমন সে পিতার পক্ষাবলম্বী না হয়ে হৃদয় প্রণয়াবেগের প্রতি আন্তরিক থেকে নিজ প্রণয়ীর সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়েছে, তেমনি পিতা যখন তার স্বামীকে বন্দি করেছে, তখনও পতির বন্দিত্ব মোচনের জন্য পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, তিন দিন অশ্বপৃষ্ঠে আসীন থেকে যুদ্ধ চালনা প্রভৃতির মাধ্যমে সে এমন পক্তিভক্তি, বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, যা সমগ্র ময়মনসিংহের গীতিকায় আর কোন নারী চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে স্বাধীন প্রণয়বাসনা লক্ষ্যগোচর হলেও প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হওয়ার ঘটনা বিরল। 'মলয়ার বারমাসী' গাথায় মলয়া পিতার অসম্মতিকে উপেক্ষা করে প্রণয়ীর গৃহে গমন করেছে কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে নিয়োজিত হওয়ার কোন নজীর নেই।

সখিনার চরিত্রে বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে কোমলতার সুসমন্বয় ঘটেছে যা তার চরিত্রকে আরও মহিমামণ্ডিত করেছে। তার মনের কোমলতা এমনই যে, পুষ্পের আঘাতেও যেন তার মৃত্যু ঘটে। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো কঠোর হৃদয় যার, তার হৃদয়ের কোমলতা এমনই যে, স্বামীর আকস্মিক ও অকল্পনীয় চির-বিচ্ছেদলিপি পাঠ করে যুদ্ধসজ্জারত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয় সখিনা-

তালাকনামা পড়ে বিবি ঘোড়ার উপরে
সাপেতে ডংশিল যেমন বিবির যে শিরে
ঘোড়ার পিঠ হইতে বিবি ঢলিয়া পড়িল

Dhaka University Institutional Repository

সিপাই লস্করে যত চৌদিকে ঘিরিল ॥[৩৭] (সখিনাবিবি)

আবার, এই সখিনা চরিত্রটিই স্বামীর বন্দিত্বের সংবাদ শুনে যে বীরত্বসূচক উক্তি করেছে তা অপূর্ব-

আমার স্বামী বন্দী করে কেমন বুকের পাটা।
জঙ্গেতে বুঝিবাম তারে কেমন বাপের বেটা ॥[৩৮] (সখিনাবিবি)

স্বামীর বন্দী হওয়ার সংবাদে সখিনা শাশুড়ীর নিষেধ অমান্য করে যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং শাশুড়ীকে বলে-

মানা না করিও গো বিদায় দাও মোরে।
রণে জিত্যা স্বামী লাইয়া আইবাম আমি ঘরে ॥
নছিব যদি বোরা হয় মা রনে যদি মরি
স্বামীর লাগ্যা রনে মরতে দুঃখু নাই সে করি ॥[৩৯] (সখিনাবিবি)

তারপর সখিনা পুরুষ বেশে ঘোড়ায় চেপে সিপাই ফৌজ নিয়ে শত্রু পিতার কেল্লা তাজপুর শহরে গিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়-

আড়াইদিন হইল রন কেউ না জিতে হারে।
আগুন লাগাইল বিবি কেল্লাতাজপুর শরে ॥
বড় বড় ঘর-দরজা পুইড়া হইল ছাই
রনে হারে বাদশার ফৌজ শরমের সীমা নাই ॥
দিনের দুপুর গোঁয়াইল হালিয়া পড়ে বেলা
ঘোড়ার উপর থাক্যা বিবি লড়িছে একেলা ॥[৪০] (সখিনাবিবি)

'আয়নাবিবি' পালা, 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবি' পালা ও 'দেওয়ানা-মদিনা' পালা তিনটিতে একই ধরণের পরিণাম পরিণতির পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। আয়নার স্বামী অন্বেষণে গৃহত্যাগ করাকে সমাজ মেনে নেয়নি বলেই মামুদ তাকে 'তালাক' প্রদান করতে বাধ্য হয়। তেমনি আভিজাত্যের অহংবোধ দেওয়ানা দুলালও কৃষক কন্যা মদিনার দাম্পত্য জীবনে যে ব্যবধান রচনা করেছিল তার মূলেও ছিল সমাজ। উক্ত পালায় সেই একই অমানবিক আচরণ নারীর মর্যাদা বিনষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। যার ফলে সকিনাও আত্মাহুতির মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছে।

একদিকে উমর খাঁ প্রদত্ত অপমানের প্রতিশোধকল্পে ফিরোজ খাঁর পৌরুষ জেগে উঠেছিল। অন্যদিকে সখিনার প্রেমের ঐকান্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের ফলে তাকে বীরের মত হরণ করে এনে বিবাহ করেছে। সখিনা স্ব-ইচ্ছায় এই বীর প্রেমিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তথাপি পিতা উমর খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রাক্কালে স্বামীকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল পিতার অন্যায় জিদের মোকাবেলা করতে। একদিকে পিতার স্নেহের আতিশয্য, অন্যদিকে পতি প্রেমের গভীরতা- উভয় সঙ্কটে সকিনা পতিপ্রাণা নারীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনায় 'পঞ্চপীরের দরগার মাটি' স্বামীর মস্তকে স্পর্শ করাল। ধর্মীয় বিশ্বাসের আনুকূল্যে পিতার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মঙ্গল কামনাই এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মদিনা, আয়না ও সখিনা প্রভৃতি নারীদের জীবন যন্ত্রণার একটি বিশেষ দিক 'তালাক প্রথা'। ইসলামের নামে 'তালাক প্রদান' আবহমানকাল ধরে মুসলমান নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে দিয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিরঙ্কুশ অধিকারের দাবীতে নারীর মর্যাদা রক্ষা করার চেয়ে তাকে অরক্ষিত, নিঃসহায়, অবলম্বনহীন করে তোলাই যেন স্বামীত্বের দাবীতে অগ্রাধিকার লাভ করে চলেছে। মুসলমানী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বামীর, স্ত্রীর কোন অধিকার নাই, এমনকি স্ত্রীর মতামতের অপেক্ষাও করা হয় না। বীরাঙ্গনা সুন্দরী সখিনার মৃত্যু। সখিনা পুরুষবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে তালাকনামা পেয়ে প্রাণত্যাগ করে। আর 'আয়নাবিবি' পালা ও 'দেওয়ানা মাদনা' পালায় আমরা একই প্রকার ঘটনাই দেখতে পাই। উভয়েই সাধারণ গৃহস্থকন্যা।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী 'তালাক' শব্দটির যথাযথ প্রয়োগ না করে বরং খেয়াল খুশীমত অপপ্রয়োগ করা হয়। যার ফলে সমাজ-সৃষ্ট অনুশাসনের আওতায় নারীর নারীত্ব অবমূল্যায়িত করে চলেছে সব ক্ষেত্রে। সমাজ ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতির নামে অপব্যাখ্যা প্রদান করে নারীকে অসম্মান দেখিয়েছে।

উক্ত পালাগুলোতে সমাজে এই আসুরিক শক্তির কাছে নারীর মর্যাদা মূল্যায়িত হয়নি। উপরন্তু সখিনা পালাটির মধ্য দিয়ে শ্রেণী চেতনার দম্ভ মানবিক মূল্যবোধকে অবমূল্যায়িত করেছে। ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অনিবার্যতা হৃদয়বিদারী আবেদন সৃষ্টি করেছে একটি প্রেমময়ী নারীর অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে ফিরোজ খাঁর স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাব সখিনার প্রেমকে অমর্যাদা করে প্রমাণ করেছে- পুরুষ প্রয়োজনে সব পারে, নারী পারে না। নারীকে বাধ্য করা হয় মাত্র। ফলে যে সমাজে ভোগ্য পণ্যের মত বিবাহিত স্ত্রীকে রাখা না রাখা প্রধানত পুরুষের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সেই সমাজে মদিনা, আয়না, সখিনা প্রভৃতি নারীদের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই। নীরব আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে তাদের নিঃস্বার্থ প্রেমের একনিষ্ঠতা যুগে যুগে চিরন্তনত্ব লাভ করে।

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনাবিবি' পালা, 'আয়নাবিবি' পালা ও 'দেওয়ানা-মদিনা'-এই তিনটি পালায়- তিনটি প্রেমবতী, সাধ্বী নারীর প্রণত্যাগের হেতু, বিবাহ-বিচ্ছেদে একমাত্র স্বামীর নিরঙ্কুশ অধিকার। এর কোন প্রতিকার নেই। কারণ ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ইসলামী আইন অপরিবর্তনীয়। মুসলমানী বিবাহে 'দেনমোহর চুক্তি' বলে যে আইন আছে, একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীনারীর কাছে তা ছিল মূল্যহীন।

১২). রূপবতী

'রূপবতী' পালার কাহিনী বর্ণনায় বাংলাদেশেরর তৎকালীন জাতিবিদ্বেষের ক্রমবর্ধমান বিভেদীকরণ, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবাদী স্বৈরাচারিতা সমাজ মানসে যে তিক্ততার জন্ম দিয়েছিল তারই পরিণতি উক্ত পালায় বিষয়বস্তুর মর্মে উপলব্ধি করা যায়। এই সূত্রে রূপবতী পালার ভাববস্তু সমাজকেন্দ্রিক মানসিকতা সপ্তাত ক্ষুব্ধ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। স্বাভাবিকভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে পার্থক্য তার মূলে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রাচুর্য, সবল দুর্বলের এই প্রভেদ, সবক্ষেত্রে দুর্বলের উপর সবলের শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ধরা পড়ে।

সামাজিক সংস্কারের বন্ধনীতে হিন্দু মুসলমানের বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতিগত যে বিভেদ আর্যপরবর্তী হিন্দু সমাজ বিন্যাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তার প্রধান কারণ ধর্মীয় মত পার্থক্য। ফলে সামাজিকতা রক্ষার দায়িত্ব রাজা রাজচন্দ্রের নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণার

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে মদনের নিকট কন্যা সম্প্রদান করার মধ্যে একটি সুগভীর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

রূপবতী পালাটিতে স্বাধীন প্রেমের কথা নেই তবে দৈবের কাছে আত্মসমর্পণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ গীতিকার প্রায় প্রতিটি নারী যে ক্ষেত্রে প্রেমের কারণে স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদানে বদ্ধপরিকর সে ক্ষেত্রে রূপবতীর নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পিত করার মধ্যে নারীর নারীত্বের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। পালাটিতে রূপকথার আলৌকিকতার চেয়ে জীবনের ধর্মই বেশি প্রোজ্জ্বল।

১৩). আমিনা

আমিনার সৌন্দর্য দেখে দুশ্চরিত্র এছাক মিঞা তাকে বিয়ে করতে পাগল হয়ে উঠে। নানারকম প্রলোভন ও তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় নিয়েও আমিনাকে বশীভূত করতে না পেরে আমিনার পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

ভাবিয়া চিন্তিয়া হায়দর জিজ্ঞাসে তখন।
আমিনারে রাখিবা কি বান্দীর মতন ॥
এছাক বলিল ইহা নয় কথা নয়।
নহিলে কূলের মান কেমনে করে রয় ॥

এ ধরণের আভিজাত্যবোধ এবং বহু বিবাহ দ্বারা বাঙ্গালী সমাজ ছিল আবদ্ধ। সামাজিক মূল্যবোধ নির্ণীত হয়েছে মনুষ্যত্বের অবমাননা করে। সমাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে আভিজাত্যের মাপকাঠিতে, যার ফলে মদিনা, আমিনা প্রভৃতি নারীদের জীবন মূল্যায়িত হয়েছে পণ্যবস্তুর মত। আবহমানকাল ধরে এ ধরণের আভিজাত্যের যুপকাষ্ঠে নারীর মান-সম্মান লাঞ্ছিত হয়ে চলেছে। প্রতিকারবিহীন অন্তর্বেদনার প্রতীকরূপে গীতিকার আবির্ভাব। যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলিত সমাজের এই নাগপাশ থেকে মুক্তির পথ ছিল দুর্গম-বন্ধুর। ক্রমে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার আপন সত্তার প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করল। দারিদ্র্যের অসহায়তার সুযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের লালসার ইন্ধনে যুগ যুগ ধরে যারা দগ্ধ হয়েছে আমিনা তাদেরই একজন। আপন সতীত্ব রক্ষার্থে গোপনে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। ইসলামী বিধান অনুসারে ছয় বৎসর স্বামী সাঙ্গলাভ না করলে পুনর্বিবাহই যুক্তিযুক্ত। কারণ-কাবিনের সরামতে হইয়াছে তালাক। যে ক্ষেত্রে পুনরায় বিয়ে ছাড়া অন্য পথ নেই এটা উপলব্ধি করে আমিনা অজানার পথে রওয়ানা হয়। দীর্ঘ দুই মাস ধরে পথে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে খোঁজাখুজি করেও নছরের কোন খোঁজ পায়নি। অথচ "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী / খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী।[৪১] অর্থাৎ হরিণ যেমন নিজের মাংসের কারণে সকলের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত তেমনি নারীর দেহ সৌন্দর্যের আবেদন নারীকে সারাক্ষণ বিপদগ্রস্থ করে। এক মুহূর্তের জন্য শিকারী যেমন হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করা ছাড়ে না, নারীর যৌবন কামনায় উদগ্র লালসার কারণে দেহ শিকারী মানুষও নারীর নিরাপত্তার অভাব ঘটায়। ফলে নারীর অস্তিত্ব হয় বিপন্ন। আমিনা এই দুষ্ট গ্রহের শিকারে পরিণত হয়।

১৪). মাঞ্জুর মা

কানির বাড়ির মণির ওঝা ছিলেন প্রচণ্ড নারী বিদ্বেষী। ঘটনাক্রমে তার ঘাড়ে মাঞ্জুর মাওয়ের দায়িত্ব পড়লে অনাথ মাঞ্জুর মাওকে আশ্রয় দিয়ে মণির ওঝা তার মানবিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শিশুকন্যা মাঞ্জুর মা ক্রমে শৈশব থেকে কৈশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে পাদর্পণ করে। আজীবন যে মণির নারী জাতিকে অবিশ্বাসী বলে ঘৃণা করেছে তারই ঘরে তারই স্নেহধন্য হয়ে বিকশিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

মাঞ্জুর মাও। অপত্যস্নেহে যে মাঞ্জুর মাওকে প্রতিপালন করেছে মণির ওঝা, শেষে মায়া থেকে মোহ তথা প্রেমে পড়েছে সেই মাঞ্জুর মাওয়ের। মাঞ্জুর মার আদর-যত্নে, আজীবন নারী সোহাগ বঞ্চিত বৃদ্ধ মণির ওঝার জীবন যেন নতুনভাবে স্পন্দিত হয়। মণির ওঝা মাঞ্জুর মাওয়ের প্রেমাসক্ত হলেও মাঞ্জুর মাও কিন্তু মণির ওঝাকে কোন ভাবেই তার স্বামী হিসেবে দেখতে চায়নি। ফলে পরবর্তীকালে বৃদ্ধ মণিরের অবর্তমানে যখন হাছেনের সঙ্গে একত্রবাসের সুযোগ আসে, তখন তার সুপ্ত যৌবন বিকশিত হয়ে ওঠে এবং মণিরের অনুপস্থিতিতে দুজন গৃহত্যাগী হয়।

মাঞ্জুর মাও এর এহেন আচরণে তার প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বা ক্ষোভ আমাদের মনে জাগ্রত হয় না। কারণ তরুণী মাঞ্জুর মাওয়ের সক্রিয় ও যৌক্তিক প্রত্যাশাকেই যেন এখানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৫). সন্নমালা

'সন্নমালা' গীতিকার কেন্দ্রীয় চরিত্র সন্নমালা ছিল অপরূপ রূপের অধিকারিণী। তার গায়ের বর্ণ ছিল স্বর্ণের মতো। তাই তার নাম রাখা হয়েছে সন্নমালা। অদৃষ্টের বিধান অনুযায়ী সন্নমালাকে নির্বাসন জীবনই মেনে নিতে হয়। এজন্য সে ভেঙ্গে পড়েনি বরং দুঃখিত মা-বাবাকে বুঝিয়েছে-

জনম দিয়াছ বাপ মাও গো,
আমার কপাল দিবা কি ?
তোমার কপালে লেখ্যাছে বিধাতা
দুষ্কিনী বনবাসী ঝি। (সন্নমালা)

নিজের উপর প্রচণ্ড আস্থাসম্পন্ন সন্নমালা বলে-

রাজার কুলে জনম রে আমার
রাজা সে মাও বাপ
বনে থাকি আর ছনে থাকিরে
মোরে না ছুইব কোনো পাপ ॥ (সন্নমালা)

বাস্তবেও আমরা সন্নমালার কথার প্রতিফলন দেখতে পাই। এক সওদাগর বাণিজ্য করে ফেরার পথে সন্নমালাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সওদাগরপুত্রও সন্নমালাকে পছন্দ করে ও প্রেম নিবেদন করে। সন্নমালা কোন কথা গোপন না করে তার দুর্ভাগ্যের সব কথা অকপটে সওদাগর পুত্রের কাছে ব্যক্ত করে-

যদি যাই রে গাছের তলায় অভাগীর কর্মদোষে
সেও গাছ জ্বইলা যায় আমার গায়ের বাতাসে
জলে গেলে শুকায় জল কেউ না দেয় থান।
সুন্দর পুরীতে না দেও অলক্ষ্মীরে থান। ...
আমারে করিলে বিয়া পড়িবা বিপাকে
গাইষ্ঠে বাইন্ধ্যা নিজের মন্দ কুমার পরে কে বা দেখে। (সন্নমালা)

অবশেষে সওদাগর পুত্রের পীড়াপীড়িতে সন্নমালা তাকে বিয়ে করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬). বাতাসী

'পীর বাতাসী' পালায় বাতাসীকে আমরা একটি সক্রিয় নারী চরিত্র হিসেবে দেখতে পাই। না পাওয়ার বেদনা অপেক্ষা লাভ করার পর তা হারানোর বেদনা যে তীব্রতর বাতাসীর ক্ষেত্রে তা দেখা যায়। সুমাই ওঝার কারণে বিনাথ বাতাসীর সান্নিধ্য ত্যাগ করলে বাতাসীর বিচ্ছেদ বেদনা, তার মানসিক যন্ত্রণা তীব্রতর হয়। বাতাসী বিনাথের মৃত্যুর পর বিধাতার উদ্দেশ্যে বলে-

শুনরে দারুণ বিধি আমার মাথা খাও।
অভাগীর পরমাই দিয়া বন্দেরে বাঁচাও।

সেই অকৃতিম প্রেমের আধার রূপিণী নারী যে তার দয়িতের বিচ্ছেদের বেদনায় কতখানি কাতর হয়েছিল- এ থেকে তা সহজেই বুঝা যায়।

পুনর্জীবন লাভের পর যখন বিনাথ বাতাসীর পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়েছে তখন আমরা বাতাসীর অন্যরূপ দেখতে পাই-

লাজে রাঙ্গা রক্তজবা কন্যা নোয়াইল মাথা
এমন মরম কন্যার আগে ছিল কোথা।

বাতাসী এক মুহূর্তের জন্যও বিনাথকে বিস্মৃত হয়নি। বিনাথের মৃত্যুতে বাতাসীর মধ্যে যে প্রিয়জন হারানোর হাহাকার ও ক্রন্দন ওঠে, সুমাই ওঝার নির্মম পাষাণ হৃদয়ও তাতে বিগলিত হয়। বাতাসী ওঝার সাহায্যে বিনাথকে প্রথমবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেও দ্বিতীয়বার সে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। শেষে বিনাথের জন্য সে নিজে আত্মঘাতিনী হয়ে বিনাথের প্রতি তার অকপট ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছে। সমালোচক যথার্থ বলেছেন, বেহুলা যে হিসাবে সতী, সে হিসাবে হয়ত বাতাসী অসতী, কিন্তু তথাপি ইহাদের উভয়ই এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য ...।

১৭). শীলা দেবী

'শীলা দেবী' রোমান্টিক ভাবস্খলিত হলেও মূলত রূপলোলুপ উপজাতীয় মুণ্ডা সর্দারের সীমাহীন স্পর্ধা, অমিত বিক্রম এবং তেজস্বিতার পরিচয় বহন করে। এতে অনার্য গোষ্ঠীর একরোখা মনোবৃত্তির পরিচয় ধরা পড়ে।

যে যুগে বামুন রাজার সুন্দরী কন্যা শীলা দেবীকে কেন্দ্র করে জটিলতার সূত্রপাত ঘটে, সে যুগ ছিল গোঁড়া ব্রাহ্ম আদর্শের। যার ফলে আশ্রিত সেবক মুণ্ডা সর্দারের রাজকন্যা শীলা দেবীকে বিবাহের স্পর্ধিত ইচ্ছা প্রকাশ করার মধ্যে এক তামসিক যুগের চিত্র ধরা পড়ে। বেতন ভোগী মুণ্ডা দলপতির স্পর্ধিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মত শক্তি ও সাহস বামুন রাজার ছিল না। যথেষ্ট সৈন্য-বলের অভাব হেতু মুণ্ডা সর্দারের বর্বরোচিত হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার আশায় 'পরগনার' রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছিল। বামুন রাজা উপায়ন্তর না দেখে যখন পরগনার রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থী হলেন, পরগনার রাজা তাকে খুশী মনে আশ্রয় দিলেন। এই পরগনার রাজপুত্রের সঙ্গে শীলাদেবীর প্রণয় পরিণয়ে রূপলাভ করার মুহূর্তে বিবাহমণ্ডপে মুণ্ডা দলের অতর্কিত আক্রমণে রাজপুত্রের মৃত্যু ঘটে এই সংবাদ শ্রবণে শীলা দেবী ছুটে এসে "কুমারের তীর উপড়াইয়া আপন বইক্ষে মাইরা তীর পড়িল ঢলিয়া।"[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

কন্যা জামাতার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি 'বামুন রাজার' ছিল না। তখন নিরুপায় হয়ে ত্রিপুরার রাজার শরণাপন্ন হলেন। ত্রিপুরাধিপতির সমর কৌশলের কাছে মুণ্ডা সর্দার দলবলসহ পরাজয় বরণ করল।

ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত কাহিনীর মূলে আছে আভিজাত্যের দম্ভ ও সংস্কার চেতনা। বিমিশ্র পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাবে জীবনের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিক্রিয়া শীলা দেবীকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে যা গীতিকার নারীদের মত সর্বংসহা চারিত্রিক মহিমাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

১৮). রাজকুমারী

'আন্ধাবন্ধু' পালাটির বিষয়বস্তু আবেগবহুল কাহিনীর মর্মস্পর্শী চিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ। কাহিনীর শুরুতে বাঁশীর সুরের মূর্চ্ছনায় রাজকন্যার হৃদয়ে যে মুগ্ধ আবেগ রচনা করেছিল তারই পরিণতি বিয়োগান্তক পরিণামের সূচনা ঘটায়।

সুলতানী আমলে সাধারণ জনজীবনের জমিদার, নায়েব, দেওয়ান প্রভৃতি উপ-শাসকদের অত্যাচার যে আর্থিক সংকটের সৃষ্টি করেছিল তার ফলে চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজের নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। এই তথ্যের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে গীতিকাগুলোর কাহিনীর মর্মমূলে সামাজিক সঙ্কটের ইতিবৃত্ত লক্ষ্য করা যায়।

'আন্ধাবন্ধু' পালায় অন্ধ ভিখারীর সুরের যাদু রাজকন্যার হৃদয়ে যে আলোড়ন তুলেছিল তার পশ্চাতে প্রেমের অমোঘ আকর্ষণই প্রধান। ফলে যথার্থ রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও রাজকন্যা অন্ধ ভিক্ষুককে কখনো ভুলতে পারেনি। দীর্ঘদিন পর সেই বাঁশীর সুর শুনে রাণী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এক আধ্যাত্মিক আকর্ষণ রাণীকে গৃহত্যাগী হতে বাধ্য করল। গীতিকা পর্যায়ে যেখানে হৃদয়বৃত্তিকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, সেখানে অপার্থিব চেতনার চেয়ে পার্থিব চাহিদার প্রকাশ বেশি। এক্ষেত্রে গীতিকার নারীদের মতই প্রণয়ীর জন্য রাণী স্বামীর অনুমতি নিয়েই অন্ধ ভিখারীকে অনুসরণ করে আত্মহারা অবস্থায় চলে গেলেন। গীতিকার নারীরা দয়িতের কারণে সর্বত্যাগী হয়; এক্ষেত্রে বিবাহিতা নারী হয়েও স্বামী পরিত্যাগ করতে পরান্মুখ হয়নি।

যে প্রেম পার্থিব চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই প্রেমই মানবিক প্রেম। উক্ত পালায় পার্থিব প্রেমের ধারায় প্রেমের অলৌকিকতার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। দেবতার চেয়ে মানুষের প্রাধান্য সামাজিক জীবনে বেশি বলেই মানবিকতার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রেমের বাস্তবতা ঘোষিত হয়েছে। এ কারণেই "আন্ধা বন্ধুর পালায় যখন রাজকুমারী স্বামীকে বলিয়া কহিয়া তাঁহার রাজপ্রাসাদের শয্যাত্যাগ করিয়া অন্ধ ভিক্ষুকের জন্য প্রেমের মাল্যহস্তে নির্ভীকভাবে চলিয়া গেলেন তখনও তাঁহার প্রতি দোষারোপ করার প্রবৃত্তি হয় না।"[৪৩] ফলে পালাটির মধ্যে সামাজিক বিধিবদ্ধতার চেয়ে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল বেশি স্পষ্ট হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতির গভীরতা যখন মানুষের হৃদয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হয় তখন যে ধরণের চৈতন্য বিলুপ্ত ঘটে এক্ষেত্রে সেই চেতনার প্রকাশ লক্ষণীয়।

১৯). ডোম-বধূ

'শ্যাম রায়ের' পালায় অসবর্ণ প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবাহিতা নারীর অবৈধ প্রেম সমাজ স্বীকৃত নয়; অন্যদিকে জাতিগত বৈষম্য বিবাহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসমার্থনযোগ্য কারণ-

Dhaka University Institutional Repository

জাতিনাশ ধরমনাশ ভাইরে এতত্ হইব দায়।
হীন ডোমের নারী ছুঁইলে মোদের জাতি যায় ॥[৪৪] (শ্যাম রায়)

যুগ যুগ ধরে নারীর সপত্নী বিদ্বেষ মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় সহজাত। স্বামীত্বের অধিকার খণ্ডিত হওয়ার অর্থ নারীত্বের অবমাননা, যা কোন নারীর কাম্য নয়। গৃহের সার্বভৌম অধিকারবোধ অর্থাৎ সর্বময় কর্তৃত্ব তার সত্তায় আজন্ম জড়িত। এ অধিকারচ্যুতি না করার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে নারী পরান্মুখ হয় না। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনা-লহনা প্রভৃতি নারীরাও সহোদরা হয়েও একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিতা হতে দেখা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রেও ঘটেছে বহু বিপর্যয়।

উক্ত পালায় শিক্ষা দীক্ষাহীন অসভ্য বর্বর জাতির মধ্যে সেই একই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। অসভ্য বর্বর, জংলী জাতির মধ্যেও নারীর প্রাতিব্রত্য লক্ষণীয়।

এত দুঃখ পাইয়া তবু ছাড়িতে না জুয়ায়
বিয়া যে হয়্যাছে তার কি করে উপায় ॥[৪৫] (শ্যাম রায়)

অর্থাৎ পতি যত দুরাচার, পাষণ্ড হোক না কেন নারী তার স্বামীত্বের অধিকার অন্য নারীর হাতে চলে যাক এটা পারতপক্ষে চায় না। আবহমানকাল ধরে বাঙালী নারীরা ঐকান্তিক প্রেমের একনিষ্ঠতা রক্ষার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। ডোম-বধূ রাণীর মনের অবস্থা উপলব্ধি করে আপন দয়িতের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় রাণীর সাহায্যে পালাতে সক্ষম হয়। সমালোচক বলেন,

প্রাতিব্রত্যই ইঁহাদের একমাত্র আদর্শ নহে, অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ্যবিধি লঙ্ঘিত এবং শ্যামরাম আন্ধা বন্ধু প্রভৃতি পালায় পাতিব্রত্যকে আড়ালে ফেলিয়া একনিষ্ঠ প্রেম তাহার বিজীয় ধ্বজা উত্তোলিত করিয়াছে। ইহারা সামাজিক নিন্দা প্রশংসা দ্বারা তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। ... এইরূপ সমাজ ভোলা সাহসিক প্রেমই ভগবানকে পাইবার একমাত্র সহজ পন্থা।[৪৬]

লক্ষণীয়, সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রেমের অবাধ গতি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর পরে আর সহজ পথে চলতে পারেনি। পদে পদে বিড়ম্বনা এবং জাতিবৈষম্যের নিগড়ে বাঁধা পড়েছিল। ফলে প্রেমের বিজয় সমাজ সংস্কারের উর্ধ্বে এই গীতিকাগুলো ত্যাগের মহিমায় অবিনশ্বরতা লাভ করেছে।

২০). কাঞ্চনমালা

বৈষ্ণব কবিতার রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আকুলতা যেভাবে সমাজ সংসারের বন্ধনকে ছিন্ন করে এগিয়েছিল সেই একই ভাবের ঐক্য 'ধোপারপাট' পালার কাঞ্চনমালার প্রেমের তীব্রতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীগত অমিল থাকা সত্ত্বেও উভয়ের প্রেম দুর্বার হয়ে ওঠে। সামাজিক ও নৈতিক বাধা উভয়ের কামনার নিকট পরাস্ত হয়।

'শ্যামরায়' এবং 'ধোপার পাটের' রচনায় সমাজ বহির্ভূত প্রেমের আলেখ্য চণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তিতে ধরা পড়ে-

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন,
কেহ না চিহ্নয়ে তারে,
প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে
সেই সে চিনিতে পারে ॥ [৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রেমের নির্মাল্য দ্বারা যে ব্যক্তি সমাজ সংসারের সব কালিমা দূর করার অপরিসীম শক্তি অর্জন করে পার্থিব কষ্ট-যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলে আরাধ্যের লক্ষ্যে। সামাজিক কলঙ্ক, নিন্দা তার চলা রোধ করতে পারে না। গীতিকার সমাজভোলা নায়িকারা তাদের নয়কদের জন্য হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে সাহস, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে নিয়তির হাতে। সমাজ শাসনের নির্মমতাকে প্রেমের ঐকান্তিকতার দ্বারা উপেক্ষা করেছে। প্রবঞ্চিত হলে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। অবলম্বনহীন উপেক্ষিত জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে ইচ্ছা-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নিস্কৃতি লাভ করেছে। প্রেমের প্রেরণাই এমন ঘরের সুখ ভুলিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রবর্তনা দেয়। একইভাবে কাঞ্চনমালাও এই প্রেমের আকর্ষণেই রাজপুত্রের হাত ধরে ঘরছাড়া হয়েছিল। ধন-সম্পদ, রাজ্য-রাজত্ব সব কিছুই তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে সর্বত্যাগী প্রেমের অনির্বাণ শিখাকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছিল। পরবর্তীতে কাঞ্চনমালাকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করে যখন রাজকন্যা রুক্মিনীকে বিয়ে করে প্রকৃত সংঘাত শুরু হয় তখনই। রাজপুত্রের চারিত্রিক দুর্বলতার এই পরিচয় গীতিকার প্রতিটি পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে সমাজের কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বাঙ্গালী সমাজ মানসিকতার একটি বড় অংশ মানবিক চেতনার চরম অপলাপ। উচ্চবর্ণের প্রভুত্ব আর নিম্নবর্ণের নিগ্রহ গ্রাম বাংলার চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। সমাজে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মাঝে ভেদাভেদ সুস্পষ্ট-

বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত হয় অঘটন।
উচা গাছে উঠলে যেমন পড়িয়া মরণ ॥
জমিন ছাইড়া পাও দিলে শূন্যে না লয় ডর।
হিয়ার মাংস ক্যাটা দিলে আপন না হয় পর।
ফুলের সঙ্গে ভোমরার পিরীত যেমন আগে বুঝা দায়।
এক ফুলে মধু খাইয়া আরেক ফুলেতে যায় ॥ (ধোপারপাট)

একারণেই কাঞ্চনমালার জীবনে সহজেই প্রেমের অপমৃত্যু সংঘটিত হয়। শেষ পর্যন্ত সমাজের দেয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে নায়িকা আত্মবিসর্জন দেয়।

২১). বগুলা

গীতিকায় বিরহিনী নারীর বৎসরব্যাপী সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কাহিনী সম্বলিত স্বগোতোক্তি হ'ল বারমাসী। গবেষকের মতে একটিমাত্র ভাবকে কেন্দ্র করে সাধারণত বারমাসী রচিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের বিস্তৃত সাহিত্যেও এই বারমাসীর বর্ণনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সূত্রেই আমরা সীতার বারমাসী, রাধার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী ইত্যাদির কথা জানতে পারি। তেমনি বগুলার বারমাসী, মহুয়ার বারমাসী প্রভৃতি লোকসাহিত্যের অঙ্গনে গড়ে ওঠা নারীর আত্মবিলাপ নির্ভর সুখ-দুঃখের কাহিনী সম্বলিত গাথা। নারী জীবনের আনন্দ, বেদনা, আশা, আকাঙ্খাই এর মূল সূর।

কৈশোরকালের সহপাঠী বগুলা বণিকপুত্রের প্রেমে পড়ে। পরিবারের সমর্থনে বগুলার মনোনীত বণিক পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিছুকাল পর আকস্মিকভাবে তাদের সুখের দাম্পত্য জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। কৌশলে বণিকপুত্রকে বাণিজ্যে পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত রাজপুত্র বগুলাকে নিজের কুক্ষিগত করার জন্য পত্রের মাধ্যমে আহবান জানায়। স্বামীর কোন ক্ষতির আশঙ্কায় চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য হয় বগুলা। তখনই দেখা দিল দ্বি-মুখী মানসিক সংঘাত। একদিকে সমাজ ও পরিবার পরিজন, অন্যদিকে দাম্পত্য প্রেম ও প্রলোভন। একদিকে স্বামীর মঙ্গল কামনায় ব্রতপালন ও পূজার্চ্চনার মধ্যে দিয়ে নারী মনের আকুলতা নিবেদিত হয়েছে। অন্যদিকে রাজকুমারের জৈবিক লালসার হাত থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছে প্রতারণার আশ্রয়ে। বাঙ্গালী বধূর ঐতিহ্য রক্ষায় প্রয়াসী বগুলা গীতিকার অন্যান্য নারীদের মতই নিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রতীকরূপে ধৈর্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় প্রদান করেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে।

স্বামী ও সংসারকে রক্ষার জন্য রাজপুত্রের আমন্ত্রণের উত্তরে ব্রত শেষে মিলনের আশ্বাস দ্বারা ছলনার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হতে পারে সে সম্পর্কে সন্দিহান ছিল বলেই দারুণ উৎকণ্ঠার প্রহর কাটিয়েছে বগুলা। স্বামীর ভালবাসার প্রতি গভীর আস্থা তাকে সাহসী করে তুলেছিল। ফলে ব্রতপালনের বর্ষপূর্তির শেষে মিলনের আশ্বাস জানিয়ে আপাত সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেছে স্বামীর প্রত্যাগমনের আশায়। স্বামীর নিরাপত্তা কামনা এবং নিজেকে রক্ষা করাই ছিল বাগুলার একমাত্র লক্ষ্য।

স্বামীর ভালবাসার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসের কারণে পরিবারের কল্যাণ চিন্তা তদুপরি স্বামীর অমঙ্গলের দুশ্চিন্তায় ব্রত পূজার আড়ালে থেকে রাজপুত্রের আক্রোশকে ঠেকিয়ে রাখার মিথ্যা আশ্বাস প্রদান যে অসহায় নারীর দুর্বল চেষ্টা তার প্রমাণ দেশে ফিরে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করল। কোন কিছু না বুঝে না শুনে ননদিনীর কথায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাধ্বী স্ত্রীকে কলঙ্কিনী হিসাবে পরিত্যাগ করার মধ্যে বাঙ্গালী নারীর সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অস্তিত্ব চিরদিন বিপন্ন হতে দেখা যায়। ফলে প্রতিক্ষেত্রে নারীকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংশয়-সন্দেহের মধ্যে আপন বুদ্ধি, মেধা ও চিন্তার দ্বারা পারিবারিক কল্যাণ কামনাই একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সমাজের পরিস্থিতির শিকার হিসাবে নিজের অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন। দুর্বল নারীর এই অসহায়তার সুযোগ তখন পুরোপুরি সমাজ গ্রহণ করে। ফলে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার গ্রামবাংলার আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মিশ্রণে বারমাসীর অবতারণা। এক্ষেত্রে পতিবিরহে কাতর বগুলার মর্মজ্বালার প্রতিধ্বনিরূপে বারমাসীর বিলাপ একটি ব্যতিক্রমী চেতনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

বগুলার মধ্যে এক প্রতিবাদী সত্তা লক্ষ্য করা যায়। ফলে গীতিকার অন্যান্য নারীর মত আত্মঘাতী না হয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা রাজপুত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনে সক্ষম হয়েছে। পালাটির মধ্যে নারীর করুণ আর্তি হৃদয়ের মর্মমূলে যে আলোড়ন তুলেছিল, সমাজশক্তির নির্মম সংস্কারের বন্ধনমুক্তির সচেষ্ট প্রয়াসে তা নতুন পথের ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

২২). ভেলুয়া সুন্দরী

ভেলুয়ার কাহিনীও মলুয়ার মত পারিবারিক সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত বাঙ্গালী সমাজচিত্রের একটি বিশেষ প্রতীক। বাঙ্গালী নারীর ভাগ্য বিড়ম্বনা যা যুগে যুগে নারীকে করেছে কলঙ্কিত-লাঞ্ছিত তারই আর এক বাস্তবধর্মী চিত্ররূপ এক্ষেত্রে বিধৃত হয়েছে। নারীকে ভোগ্যপণ্যবস্তু হিসাবে বিবেচনা করা পুরুষ শাসিত সমাজের অন্যতম বিশেষত্ব।

মলুয়ার মত ভেলুয়ার কাহিনী প্রায় একই ধরণের পারিবারিক সংকটে আবদ্ধ। বাঙ্গালী সমাজ চিত্রের একটি বিশেষ দিক বাঙ্গালী নারীর ভাগ্যবিড়ম্বনা যা সৌন্দর্যের অভিশাপ হয়ে নারীকে যুগে যুগে করেছে কলঙ্কিত। উক্ত পালাটি তারই আর এক বাস্তবধর্মী চিত্ররূপ।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে ধারণা করা চলে ষোড়শ শতাব্দীতে নারীর স্বাতন্ত্র্য এত বেশি সীমাবদ্ধ ছিল যার ফলে নারীর ব্যক্তিসত্তার কোন মূল্য ছিল না। বরং পুরুষশাষিত সমাজের অভিরুচির উপর অনেকাংশে তৎকালীন নারী নির্ভরশীল ছিল। যে কারণে ধনী পুরুষেরা বহু বিবাহ করত এবং বিবাহ বন্ধন ছেদও খুব হত।

উক্ত পালায় কেন্দ্রীয় চরিত্র ভেলুয়া ও আমীর সাধুর পারিবারিক জীবনচিত্রে তারই একটি বাস্তব আলেখ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে ভেলুয়ার ভাগ্যে যে অভিশাপ নেমে এসেছিল, তার মূলে পারিবারিক সংকট অন্যতম। একটি রূপহীনা অবিবাহিতা নারীর ঈর্ষাকাতর বিদ্বেষের ফলশ্রুতি আর একটি নারীর নববিবাহিত জীবনের সমস্ত মাধুর্যকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমীর সাধুকে বিদেশে বাণিজ্যের কারণে পাঠাবার আগ্রহ প্রকাশের অন্তরালে বিভলার দাম্পত্য জীবনের অপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ প্রতিফলিত হয়। যা অতি সূক্ষ্ম মানসিক বিভ্রান্তির পরিচয় বহন করে। পালাটির বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক এবং মানসিক দুটি দিকের পর্যালোচনা পালা রচয়িতা মনস্তাত্ত্বিক ধারায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন- অসুন্দরী নারীর ব্যর্থ জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন-

কাহিনীর ট্রাজিক পরিণতির সূত্রপাত ঘটায় আমীর সাধু। দিক ভুল করে আমীর সাধুর ঘাটে ফিরে আসা, ভোর না হতে ভুল করে ভেলুয়ার ঘরের দরজা অজান্তে খোলা রেখে চলে যাওয়ার মাশুল দিতে হয় ভেলুয়াকে। যতই-

ভেলুয়া কহিল কান্দি মাথা নোয়াইয়া।
সোয়ামী মোর আইসা ছিল কালুকা রাতুয়া ॥
কোরান দেও কিতাব দেও খোদার নামে কই।
এক সোয়ামী বিনে আমি ন' জানম দুই ॥ (ভেলুয়া সুন্দরী)

ভেলুয়ার এই ক্রন্দন অবিশ্বাস্য বলেই বিবেচিত হল সবার কাছে। ফলে সামাজিক এবং পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভেলুয়ার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পেল। ফলে বধূ ত্যাগ করা হত্যা করার মত সমাজপতিদের উপায়ন্তর না দেখে অবিচল মন্তব্যের বিপক্ষে একটি কথা বলারও কেউ থাকল না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তখন শাশুড়ী মোনাই
ভেলুয়ারে রাইখল বাহির কামুলী বানাই। (ভেলুয়া সুন্দরী)

গৃহলক্ষ্মীর সম্মানচ্যুত করে দাসীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা তৎকালীন যুগে স্বাভাবিক ছিল। মলুয়াকে নামিয়ে আনতে কারো বিবেকে বাধেনি। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সম্মান তার অস্তিত্বের মতই মূল্যহীন থাকার কারণে পরাশ্রিতা হয়ে থাকা ছাড়া কোন বিকল্প পন্থা ছিলনা। ঘরে বাইরের উভয় দিকের নির্মমতা দ্বারা নীরবে ক্ষতবিক্ষত হওয়াই যেন সে যুগের নারীদের ভাগ্যের বিধান। অন্যদিকে নৈতিক অবক্ষয়ের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ গীতিকার নারীদের চরম দুর্ভোগ, অন্য পুরুষের কামনালিপ্ত লালসার ইন্ধনরূপে নেমে এসেছে। ভেলুয়ার ভাগ্যেও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ভেলুয়ার রূপ লাবণ্যের কারণে বারংবার তাকে অন্য পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত হতে হয়েছে। নারীর সৌন্দর্যই নারীর বড় শত্রু- এই সত্যের প্রকাশ প্রায় সব গীতিকার বিষয়বস্তুর মূলে নারীর অস্তিত্বের বিপর্যয় সংঘটিত করেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে যেখানে দেব-দেবীর ছিল প্রাধান্য,

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকায় মানব-মানবীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না মিশ্রিত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন সেখানে এ কারণে বেশি বাস্তবতা প্রদান করেছে।

মলুয়ার ব্রত পালনের মত ভেলুয়ার 'ইদ্দত'[৪৮] পালনের মধ্য দিয়ে নারীর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ধর্মীয় ন্যায়-নীতির আওতায় আত্মরক্ষার চেষ্টা, অন্ধকার যুগ থেকে আলোকিত যুগের পথে উত্তরণের প্রচেষ্টা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। সমাজ যখন একজন নারীর নিরাপত্তা প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে তখন বিবাহিত নারীর স্বামীই থাকে একমাত্র রক্ষাকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর অবহেলা বা অসহযোগিতা তখন নারীকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তাহীন করে তোলে এবং সেই নারীর মুক্তির পথ রুদ্ধ থাকে। স্বামীর অক্ষমতাই সেক্ষেত্রে বড় হয়ে দেখা দেয়। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণে আবহমানকাল ধরে বাঙ্গালী নারীর মর্যাদা অবমূল্যায়িত হয়ে চলেছে। ফলে সাহিত্যে নারীর সৌন্দর্য যতই আদৃত হোক না কেন বাস্তব ক্ষেত্রে এই রূপের আকর্ষণ নারীকে যুগে যুগে নানাভাবে কলঙ্কিত করেছে। তাই বাধ্য হয়ে নারী তার সতীত্ব রক্ষাকল্পে নানা ছলা-কলার আশ্রয় গ্রহণ করে আসছে বরাবর। অবশেষে ব্যর্থতার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করেছে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে।

উক্ত পালাটির বিষয়বস্তু প্রথমত পারিবারিক ক্ষেত্রে ঈর্ষাজনিত বিদ্বেষ ফলশ্রুতিরূপে রূপায়িত হলেও নারীর রূপই প্রধান হয়ে উঠেছে। নারীর অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ মনস্তাত্ত্বিক ধারায় যে প্রতিহিংসামূলক আচরণে পরিবর্তিত হয়ে থাকে তার অন্তরালে অতৃপ্ত বাসনার অপূর্ণতার স্পষ্ট রূপায়ণ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত নারীর রূপের আকর্ষণে অজ্ঞাতে অন্য পুরুষের প্রলুব্ধ হওয়ায় বাস্তবধর্মী জীবন চেতনা পরিলক্ষিত হয়।

ভেলুয়াকে প্রথমে ননদিনী বিভলার দেয়া যন্ত্রণার শিকার হতে দেখা যায়। পরে ভোলা সওদাগরের লালসার ফাঁদে পড়ে মুক্তির পথ খুঁজতে হয়। অবশেষে বৃদ্ধ মুনাফ কাজির লোভাতুর দৃষ্টির যন্ত্রণা এড়াতে গিয়ে আমরণ অনশনের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে। এভাবে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলার জীবনাচার দেওয়ান, কাজি এবং সওদাগর শ্রেণী দ্বারা শোষিত হয়ে স্থবিরত্ব প্রাপ্তির অন্তরালে শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থগত কারণ মূলত বিদ্যমান। ফলে সে যুগে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গীতিকা রচয়িতা মঙ্গলকাব্যের মত কোন পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে গীতিকা রচনা না করে শিল্পীসুলভ সংবেদনশীল হৃদয় দিয়ে একদিকে যেমন- হতাশা, ব্যর্থতা, ক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, অন্যদিকে বাঙ্গালী নারীর দুঃখ-বেদনার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিশ্লেষণ করেছেন।

গীতিকার মর্মমূলে যুগ কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিপার্শ্বিকতার শিকার হিসাবে তাই বারংবার গীতিকার নারীরা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেছে। তাদের এই ত্যাগ, সহনশীলতা লৌকিক প্রেমের স্বরূপ হিসেবে স্মরণীয় বরণীয় নারীর স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। ভেলুয়া তাদেরই একজন আত্মোৎসর্গের দ্বারা স্বকীয় সত্তার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে সর্বত্যাগী হতে কার্পণ্য করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ প্রতিনায়িকা চরিত্র

নায়িকা চরিত্রগুলো যেমন সমাজের আলোর দিককে ইঙ্গিত করে, প্রতিনায়িকা চরিত্রগুলো তেমনি অন্ধকার দিককে সূচিত করে। তারা বিভিন্নভাবে নায়িকা চরিত্রকে অপমান করেছে, অসম্মান করেছে, এমনকি অপদস্ত করে তাদের জীবনকে করে তুলেছে তিক্ত, বিষণ্ন। এতে নায়িকাচরিত্রগুলোকে যারপরনাই কষ্ট পেতে হয়েছে, দুঃখ-ভোগ করতে হয়েছে। কেউ কেউ যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। এরা নারী হয়ে অন্য নারীর দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করে এবং বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তাদের আত্মবিসর্জন তরান্বিত করে। অত্যন্ত ক্ষুদ্র মানসিকতা সম্পন্ন এসব নারী চরিত্র অতিশয় সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর, ব্যক্তিত্বহীন, ক্রুড়, নিষ্ঠুর, ছলনাময়ী, চরিত্রহীন, স্বার্থান্ধ ও মোহান্ধ হিসেবে সমাজে চিহ্নিত হয়েছে।

১). কঙ্কনদাসী

'কাজলরেখা' গীতিকায় কঙ্কনদাসীকে আমরা প্রতিনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। অত্যন্ত শঠ, প্রতারক, স্বার্থান্ধ এই নারী চরিত্রটি লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে কাজলরেখার জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। কঙ্কনদাসীর কারণেই কাজলরেখাকে আসীম দুঃখ-ভোগ করতে হয়েছে। যে দাসীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সরল বিশ্বাসে কাজলরেখা নিজ হাতের কঙ্কনের সাহায্যে তাকে কিনে নিল, সেই দাসীই পরে কাজলরেখাকে প্রতারিত করে পাটরাণী হয়ে বসল। কাজলরেখা স্নান করে ফিরে আসার আগেই কঙ্কনদাসী মৃত রাজপুত্রের চোখের সূঁচ খুলে পাতার রস লাগিয়ে দেবার পর চোখ খুলে প্রথমে দাসীকে সামনে দেখে কৃতজ্ঞতাবশত তাকেই নিজের পাটরাণী করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এ সময় কাজলরেখা স্নান সেরে ফিরে এলে কঙ্কনদাসী কাজলরেখাকে দাসী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস- যে দাসী সে হ'ল রাণী, আর যে রাণী, সে হল দাসী, উপকারীর প্রতি আনুগত্য না থাকার কারণে সুখ-সম্পদ-লালসার বশবর্তী হয়ে কঙ্কনদাসী চাতুর্যের সঙ্গে কাজলরেখার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করেছে। অবশেষে দীর্ঘ বার বছর অপরিসীম দুঃখ ভোগ করার পর কাজলরেখা তার স্বামীকে ফিরে পায় আর কঙ্কনদাসীকে রাজপুত্র জীবন্ত কবর দিয়ে তার ছলনার শাস্তি প্রদান করে। কঙ্কনদাসী চরিত্রটিকে আমরা অকৃতজ্ঞ, ছলনাময়ী ও কৃতঘ্ন নারী চরিত্রের ভূমিকায় দেখতে পাই।

২). কুঞ্জমালা

'কাঞ্চনমালা' গীতিকায় কুঞ্জমালা প্রতিনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অন্ধ শিশু স্বামীকে নিয়ে কাঞ্চনমালাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খাইয়ে কাঞ্চনমালা শিশু স্বামীকে চক্ষুষ্মান করে তোলে। এক সময় কাঞ্চনমালা বনে কাঠ আনতে গেলে এক রাজা কুমারকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ছয় বছর স্বামীকে খোঁজার পর সে সুমাইনগরের রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে আসে। এখানে রাজকন্যা কুঞ্জমালার একজন দাসী প্রয়োজন। কুঞ্জমালার স্বামীই কাঞ্চনমালার অভিলষিত কুমার। কাঞ্চনমালার স্বামী তার প্রকৃত পরিচয় জানত না তবুও কুঞ্জমালার কাছে তার বনবাস জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতিচারণ করেছে-

এক কন্যা কাঠুরিয়ার ছিল সে সুন্দরী।
তার রূপের কথা কইতে না পারি
আমারে লালিয়া পালিয়া সেই বড় করিয়া তুলে ॥ (কুঞ্জমালা)

Dhaka University Institutional Repository

তখন কুঞ্জমালা কুমারকে দিয়ে কাঞ্চনমালার একটি ছবি আঁকিয়ে নেয়। ফলে কাঞ্চনমালাকে দাসীরূপে পেয়ে কুঞ্জমালা তাকে ঠিকিই চিনে নিল। তখন দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় কুঞ্জমালা-

দুরন্ত ভাবনায় মন উঠাপড়া করে।
খাল কাটিয়া কেন আনিলাম কুম্ভীরে ॥ (কুঞ্জমালা)

এদিকে কাঞ্চনমালাকে কাছে পেয়ে রাজপুত্র কুঞ্জমালাকে অবহেলা করতে শুরু করল। তখন কুঞ্জমালা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কাঞ্চনমালাকে বনবাসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল এবং এ ব্যাপারে রাজকুমারকে প্ররোচিত করল। অনোন্যপায় হয়ে রাজকুমার কাঞ্চনমালাকে বনবাসে দিল। কিন্তু কাঞ্চনমালা নিজের সুখ-দুঃখের কথা বিস্মৃত হয়ে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফলের সঙ্গে রাজ্যসহ স্বামীকে কুঞ্জমালার হাতে সমর্পণ করল। প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে কাঞ্চনমালাকে আর ফল ভোগ করেছে কুঞ্জমালা। এখানে প্রতিনায়িকা হিসেবে কুঞ্জমালার চরিত্রে সপত্নী বিদ্বেষের ছবি ফুটে উঠেছে।

৩). রুক্মিণী

'ধোপার পাট' গীতিকার নায়িকা চরিত্র ধোপাকন্যা কাঞ্চনমালা। আর রুক্মিণী এখানে প্রতিনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই নারী চরিত্রটি একটি কলঙ্কময় চরিত্র হিসেবে গীতিকায় এসেছে। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, অর্থ-মোহ-প্রতিপত্তি, বিষয়-গৌরবকে সে বড় করে দেখেছে। শ্রেণীগত উচ্চতর অবস্থান থেকেই সে জমিদার পুত্রকে কাঞ্চনমালার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। সে নারী হয়ে অন্য এক নারীর দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় তার চরিত্রের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছে। রাজকন্যা রুক্মিণী ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে রাজপুত্রকে আভিজাত্যের অহমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৌশলে তাকে হস্তগত করে এবং ধোপাকন্যা কাঞ্চনের জীবন থেকে রাজপুত্রকে দূরে সরিয়ে কাঞ্চনের আত্মবিসর্জন তরান্বিত করে। প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় ব্যতিরেকে কথিত জমিদার পুত্রের কাছে প্রণয় নিবেদনের ঘটনা রুক্মিণী চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতা ও ক্ষুদ্র মানসিকতারই প্রমাণ দেয়।

৪). সুজন্তী

'পীরবাতাসী' গীতিকার নায়িকা বাতাসী। সুজন্তী এখানে প্রতিনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুজন্তীকে আমরা ভ্রষ্টা চরিত্রের অধিকারিণী নারী চরিত্র হিসেবে দেখতে পাই। বিনাথ যখন নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে সর্প-ওঝা হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা করে, তখন চাঁদ মোড়ল তার কাছে সুজন্তীকে বিয়ে দেন। কিন্তু তার এ দাম্পত্য জীবন সুখী কিংবা স্থায়ী হতে পারেনি। কেননা সুজন্তী ছিল পরপুরুষগামী। সুমাই ওঝার সঙ্গে চক্রান্ত করে সুজন্তী বিনাথের কাছ থেকে 'জীয়ন-মন্তর' জেনে নিলে বিনাথ সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সুজন্তীকে আমরা এখানে একটি শিথিল, নিষ্প্রভ নারী চরিত্র হিসেবে দেখতে পাই। সুমাই ওঝার পরামর্শে নিজের বিবাহিত স্বামীকে জ্ঞান-হারা করেছে সে। অপরপক্ষে বাতাসী ওঝার সাহায্যে তাকে প্রথমবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। দ্বিতীয়বারও সে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। শেষে বিনাথের জন্য সে নিজে আত্মঘাতিনী হয়ে বিনাথের প্রতি তার অকপট ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছে। পক্ষান্তরে, সুজন্তী স্বামীর ব্যাপারে এতটাই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে যে, তাকে মনেই হয়না সে বিনাথের বিবাহিতা স্ত্রী। স্বামীর মঙ্গল কামনা না করে বরং তার প্রাণনাশের জন্য, তার জীবন বিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমন নারী চরিত্র গীতিকায় দেখা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

এমন ক্রুড়, নিষ্ঠুর, ছলনাময়ী এবং চরিত্রহীন নারী চরিত্র বাংলা লোকগীতিকায় খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়।

৫). এখিন

'আমিনা বিবি ও নছরমালুম' গীতিকায় আমিনা চরিত্রের বিপরীত নারী চরিত্র হ'ল এখিন। যেখানে আমিনাকে আমরা দীর্ঘ দশ বৎসরকাল নছরের জন্য অপেক্ষা করতে দেখি, সেখানে সামান্য সময়ের ব্যবধানেই এখিন নছরকে বিয়ে করে। আমরা দেখি, অর্থের প্রতি মোহান্ধ হয়েই সে একাজ করেছে। যথার্থ প্রেমের মর্যাদা সে দিতে পারেনি। তার কাছে প্রেমের কোন মূল্য নেই, মর্যাদা নেই। এক ব্যক্তিত্বহীন নারী চরিত্র হিসেবে এখিনের সাক্ষাৎ ঘটে গীতিকায়।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক চরিত্র

৪.৩.১. স্ত্রী চরিত্র

১). অদুনা ও পদুনা

গোপীচন্দ্র রাজার দুই স্ত্রী- অদুনা ও পদুনা, দু'জন হলেও একই সঙ্গে আলোচ্য। কারণ এরা একজন আর একজনের প্রতিরূপ। ময়নামতী চরিত্রের পটভূমিতে এদের একান্ত সহজ মানবিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। অদুনা ও পদুনা তরুণী; তারা জীবনবাদী চরিত্র হিসেবে গীতিকায় উঠে এসেছে। কারণ তারা জীবনকে ভালোবাসে। অদুনা ও পদুনা বোন- সতীন। স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণে তারা বাধা দিয়েছে, শাশুড়ীর বিরোধিতা করেছে। শাশুড়ীর সতীত্ব পরীক্ষার তারাই পরামর্শদাতা-উদ্দেশ্য স্বামীর গৃহ ত্যাগ রোধ করা। সাধারণ স্বার্থে দুই সতীন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

ময়নামতী যখন গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসে পাঠাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন সদ্য বিবাহিত এই তরুণী নারী দুটি নিজেদের জীবন-যৌবন ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠে। কিন্তু শুধু অশ্রুতে তাদের এ ব্যাকুলতা প্রকাশ পেল না। তারা সক্রিয় হয়ে উঠল এই ভবিতব্যকে রোধ করার চেষ্টায়। তাদের বুদ্ধিমত হাড়িপাকে পথের কাঁটা ভেবে সরিয়ে দেবার নানা ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি মাটির গভীরে পুঁতেও ফেলা হল। কিন্তু ময়নামতীর কাছে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে চলে যেতে হ'ল। অদুনা-পদুনার তরুণী হৃদয়ের আর্তক্রন্দন শতধারায় উৎসারিত হ'ল। কবি তার বর্ণনায় বলেছেন-

> কান্দিয়া অদুনা চলে রাজার সদনে / নারীর যৌবন প্রভু স্বামীর কারণে
> স্বামী বিনে নারী যেন নাহি জাতি কুল / পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল।
> বাতাকে মৃত্তিকা ভিন্ন গগণে উড়ি তোলে / পতি বিনে যুবতিক বাপমাত্র মন্দ বোলে
> অদুনা বোলেন স্বামী কহি তোমার স্থান / সমুখ হৈয়া কহ কথা জুড়াইক প্রাণ।
> তোমার সন্ন্যাস স্বামী দেখিয়া নয়নে / কেমনে ধরিব প্রাণ নারী চারি জন্মে
> শিশের সিন্দুর আমার নয়নের কাজল / তোমার সন্ন্যাসে প্রভু সকল বিফল।

যুবতী নারীর প্রতি বিচ্ছেদের বেদনা একান্ত মানবিকরূপে গ্রামীণ কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন।

২). পার্বতী

গোর্খবিজয়ে নারীমোহ থেকে উদ্ধার লাভের মধ্যেই যে সাধকের মুক্তির পথ, তা দেখানো হয়েছে। ফলে, এসব কাব্যে নারীকে দেখা হয়েছে সম্পূর্ণ একটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের হৃদয়ের এবং জীবনের স্বাভাবিক পরিচয় এসব কাব্যে ততটা প্রকাশ পায় না। কবিদের ধর্মীয় বোধ অনুযায়ী নারীরা ধর্ম-পথের বাধা, নরকের দ্বারস্বরূপ। তাদেরকে কামবৃত্তির প্রতিভূরূপে অঙ্কিত করেছেন কবিরা। এ কারণে গোর্খবিজয়ে যেকটি নারী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তারা একান্ত গৌরবহীন এবং অস্বাভাবিক। নারী-বিরূপতার মাত্রা এত বেশি যে অনেক নারী চরিত্রের নামই নেই। তাই শিবপত্নী পার্বতী হিন্দু দেবীরূপে, যতই মহিমার উর্ধ্বলোকে বাস করুন না কেন 'গোর্খবিজয়ে' তার লাঞ্ছনার চূড়ান্ত করা হয়েছে। তাঁর স্বভাবেও কামবৃত্তির প্রাধান্য। গোরক্ষনাথের হাতে শেষ পর্যন্ত পার্বতীকে রাক্ষসীতে রূপান্তরিত হতে হয়। শিবের কথায় দেবী অবশ্য শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান। বাংলা মঙ্গলকাব্যে অনেক সময় চণ্ডী পার্বতীর গৌরবহীন লৌকিকরূপ চিত্রিত। কিন্তু নাথকাব্যে দেবী অগৌরবে নিক্ষিপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩). গর্ভেশ্বরের কন্যা

গর্ভেশ্বর রাজার কন্যা সুকঠোর তপস্যা করেন। শিবের নির্দেশে গোরক্ষ তাঁকে গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু কোন দৈহিক সম্পর্কে যেতে রাজী হলেন না। স্ত্রীর ক্রন্দনে দয়াপরবশ হয়ে অলৌকিক উপায়ে তাঁকে একটি সন্তান দান করলেন এবং চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

৪). কদলীর রাণী

গোর্খবিজয়ের তৃতীয় নারীচরিত্র হ'ল নারী-রাজ্যের রাণী যার কোন নির্দিষ্ট নাম কবিরা দেননি। লক্ষ্য করার মতো এই কাব্যে গোরক্ষনাথের স্ত্রীরও নাম দেয়া হয়নি। নারী মাত্রই এদের কাছে কাম-ডাকিনী। স্বাভাবিক মানবী নামে এদের চিহ্নিত করারও প্রয়োজন এরা বোধ করেননি। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ মোহাবিষ্ট হয়ে স্ত্রী-রাজ্যে বাস করছিলেন, তার নাম হচ্ছে 'কদলীরাজ্য'। যোগভ্রষ্ট গুরু কদলীরাজ্যে কি ধরণের অনাচারের মধ্যে পড়েছিলেন তার কোন স্পষ্ট চিত্র এ কাব্যে পাওয়া যায় না। আভাসে ইঙ্গিতে যা দেখা যায়, তাতে মনে হয় নারী-প্রধান এই রাজ্যে মীননাথ স্ত্রী এবং সন্তান বিন্দুনাথ সহ সাধারণ গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করছিলেন। কদলী নারীদের বা মীননাথের স্ত্রী কাদলীর রাণী চরিত্রের কোন অতি কামুক ডাকিনীবৃত্তি কাহিনীমধ্যে প্রকাশ পায়নি। অবশ্য ঐ স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবনই নাথপন্থীদের কাছে পাপের জীবন। তাই কদলী নারীদের প্রতি কবিদের অতি বিরূপ মনোভাব দৃষ্ট হয়েছে। গোর্খবিজয়ের কবি সহজ দৃষ্টিতে এদের ছবি আঁকতে চাননি। তবুও বিন্দুনাথের মৃত্যুতে তাদের আত্মহারা ক্রন্দনে বাৎসল্য প্রীতির প্রকাশ ঘটেছিল। তাতেও কদলী নারীরা রেহাই পায়নি। গোরক্ষানাথের অভিশাপে রাণীসহ কদলী নারীরা বাদুড় হয়ে উড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

৫). রাজচন্দ্রের স্ত্রী

'রূপবতী' পালায় রাজচন্দ্রের স্ত্রীর মধ্যে আমরা প্রবল ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাই। রাজার অগোচরে তিনি মুসলমান নবাবের হাতে কন্যা সমর্পণ না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং গৃহভৃত্যের কাছে কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দূরদেশে প্রেরণ করেন। তার এ আচরণে ধর্মনিষ্ঠার পাশাপাশি সাহসী, বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী ও দৃঢ়চিত্ত এক নারীর পরিচয় ফুটে উঠে। ধর্মের কারণে একমাত্র কন্যাকে বনবাসে পাঠাতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

448743

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.২. মাতৃ চরিত্র

১). ময়নামতী

'গোপীচন্দ্রের গান' কাব্যে ময়নামতী রাজমাতা। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী ও নাথপন্থার যোগসিদ্ধা রমণী। মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মানবিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। স্বামী মানিকচন্দ্রের মৃত্যু আসন্ন দেখে ময়নামতী তাকে যোগপন্থায় দীক্ষিত করতে চান। কিন্তু মানিকচন্দ্র লোকসমাজে অপবাদের ভয়ে নারীর শিষ্যত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানান। স্বামীকে দীক্ষিত করতে ব্যর্থ হলেও পুত্রকে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধ্য করে ময়নামতী।

ময়নামতী চরিত্রের দুটি দিক- একদিকে তিনি জায়া, স্বামীর কল্যাণকামী, অপরদিকে তিনি স্নেহময়ী জননী। ময়নামতি জানেন তাঁর প্রিয় সন্তান গোপীচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটবে। তাই মৃত্যুকে প্রতিহত করে পুত্রকে দীর্ঘজীবী করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু তরুণ গোপীচন্দ্র রাজ্যসুখ, স্ত্রী-সংসর্গ ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণে সম্মত হয়নি। বরং পুত্র ও পুত্রবধূ তাকে গঞ্জনা দেয় এবং গুরুভাই হাড়িপার সাথে প্রণয় সম্পর্কের অভিযোগ এনে সতীত্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। তখন আমরা ময়নামতীর ক্রোধান্বিত মূর্তি দেখতে পাই- "বেটা হইয়া কলঙ্ক দিলে মায়ের বরাবরে। মাক বলে ভোমা বুড়ি বাপকে বলে শালা / দুষ্টপুত্রের কার্য নাই আটকুড়াক আপন ভালা।" এতে ময়নামতী মনোক্ষুণ্ন হলেও পুত্রের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায় সকল গঞ্জনা সহ্য করেন এবং সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণে অনিচ্ছুক গোপীচন্দ্রকে বুঝিয়েছেন সন্ন্যাস অবলম্বনের সার্থকতা, নারী-সংসর্গ ত্যাগ ও গুরু ভজনার প্রয়োজনীয়তা। বারংবার পুত্র ও পুত্রবধূদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েও ময়নামতী যে নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি, এতেই তাঁর সুগভীর অপত্যস্নেহ প্রমাণিত হয়। অবশেষে বার বছরের জন্য পুত্রকে যোগীবেশে নির্বাসনে পাঠান। এরূপ আদর্শবাদী মাতৃচরিত্র বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ময়নামতী সম্পর্কে বলেন "তাহার (ময়নামতীর) মধ্যে এক স্নেহ-সতর্ক মাতৃহৃদয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার মধ্যে সন্তানস্নেহের অভাব ছিলনা।"

২). ফিরোজা বিবি

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনাবিবি' গীতিকায় ফিরোজ খাঁর জননী চরিত্রটি উল্লেযোগ্য। তিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। আভিজাত্যবোধ ও বংশমর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা চরিত্রটিতে এক ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। ফিরোজ খাঁ যখন তাঁকে জানিয়েছেন যে তিনি উমর খাঁর কন্যার পানি গ্রহণে ইচ্ছুক, তখন প্রথমে তিনি পুত্রের এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেননি। কারণ তিনি জানতেন, পাঠান উমর ছোট জাতি বলে ফিরোজ খাঁর সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দিতে সম্মত হবেন না। বিবাহের প্রস্তাবকারীকে উমর অপমান করবেন আর সেক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। যুদ্ধে দিল্লীর ফৌজ উমরের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধে কেল্লাতাজপুর এবং জঙ্গলবাড়ী দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনায় তিনি বলে ছিলেন-

জঙ্গলবাড়ীর অপমান আমি হইতে নাই সে দিব /
এই বিয়া করাইতে গেলে লড়াই বাজিব।

Dhaka University Institutional Repository

অপত্যস্নেহবশত তিনি শেষ পর্যন্ত পুত্রের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যৎবাণীই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। উমর খাঁ বিবাহের প্রস্তাব নাকচ করে উজিরকেও চরম অপমান করেন। আর তা জানতে পেরে ফিরোজা বিবি পুত্রকে নির্দেশ দেন-

উমর খাঁর গর্দান চাই সপ্তাহ ভিতরে
তার কইন্যা সখিনারে ধরিয়া আনিয়া
দশদিনের মধ্যে তুমি করবা তারে বিয়া।
তবে'ত বুঝবাম পুত্র, দেওয়ান ঈশা খাঁর ধারা
জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানীতে হয় নাই আইজও হারা ॥

এমন তেজস্বী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না জননী আমরা অন্য কোন গীতিকায় দেখতে পাই না।

৩). আমিনা বিবির মা

'আমিনা বিবি ও নছরমালুম' গীতিকায় মাতৃচরিত্রটিতে আমরা কিছুটা ভিন্নমাত্রা যুক্ত হতে দেখি। এখানে আমিনা বিবিকে আমরা এছাকের সহযোগিতায় তার মায়ের প্ররোচনার শিকার হতে দেখি। আমিনার মা-বাবা দুজনই এছাকের প্রলোভনের শিকার হয়েছে। সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্যই তাদের কন্যার স্বার্থের পরিপন্থী কার্যে মদত দিতে প্ররোচনা যুগিয়েছে।

আমিনা সুন্দরী যখন ঘুমে অচেতন / দুয়ার খুলিয়া বুড়ী দিলরে তখন ॥

মা হয়ে আপন সন্তানকে দুশ্চরিত্র এছাকের লোকের হাতে তুলে দিয়ে দারিদ্র্যের অভিশাপ দ্বারা মাতৃত্বের মহিমাকে চরম অবমানিত করতে তার এতটুকু বাধল না। অথচ অনাত্মীয় গফুরের নিঃস্বার্থ নির্ভরতা আমিনাকে কন্যাতুল্য নিরাপত্তা প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়নি। সততার পরাকাষ্ঠার এই জ্বলন্ত নিদর্শনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত। এই নারী চরিত্রটির দ্বারা আমরা মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু তরান্বিত হতে দেখি।

৪). চাঁদ বিনোদের ও নদের চাঁদের মা

গীতিকায় মাতৃচরিত্রগুলো স্নেহ-সোহাগে-বাৎসল্যে যেন এক তাৎপর্যময় প্রতিমূর্তি। তাঁদের নিবেদিতপ্রাণা হৃদয় যেন সন্তানের হিতাহিত চিন্তায় সর্বদাই ব্যাকুল থাকে। চাঁদবিনোদের মায়ের চরিত্রটি গ্রাম্যজীবনের আবহে যেন সন্তান বৎসলতার এক চিরন্তন প্রতিমূর্তি। চাঁদবিনোদ বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। অকাল বন্যায় একবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মা-ছেলে অনেক কষ্টে দিন কাটায়। বিনোদের মা তখন সূতা কেটে, অন্যের বাড়ীতে ধান ভেনে, জমি মাজনে দিয়ে সংসার চালিয়েছে। আবার বিনোদ অসুস্থ হলে সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠেছে-

লাগিয়া কার্ত্তিকের উষ গায়ে হইল জ্বর।
বিনোদের মায়ে কান্দে হইয়া কাতর ॥
জোড়া মইষ দিয়া মায় মানসিক করে।
মায়ত কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে ॥[৪৯০] (মলুয়া)

এখানে জোড়া মইষ মানতের মধ্য দিয়ে এক সন্তান বাৎসল্যে উদ্বেলিত অসহায় মাতৃহৃদয়ের হাহাকার ফুটে উঠেছে। আবার কিছু অভিজাত সামন্ত মায়ের সন্ধানও পাওয়া যায় বাংলা লোকগীতিকায়। যাদের আচরণে সামন্তবাদী আভিজাত্যের অর্থ-অহমিকা ফুটে উঠে-

Dhaka University Institutional Repository

বাইদ্যার তামসা করাইতে কয়শ টেকা লাগে।
বাইদ্যার তামসা করাও নিয়া বাইর বাড়ির মহলে। (মহুয়া)

আবার কোন কোন গীতিকায় মা চরিত্র সন্তানকে বিমাতার নিষ্ঠুর আচরণ থেকে রক্ষার নিমিত্তে স্বামীকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ না করতে অনুরোধ করে। (দেওয়ানা-মদিনা)

বাংলা লোকগীতিকায় বাবা-মার সন্তান বাৎসল্যের পাশাপাশি সন্তানদের জনক-জননী ভক্তিও তাদের সহজাত ঐতিহ্য। মলুয়া পালায় 'কোড়া শিকারে' যাবার পূর্বে বিনোদকে তার মা থেকে বিদায় নিতে দেখা যায়। আবার 'মহুয়া' পালায়ও একইভাবে নদের চাঁদ ভিন্ন দেশে যাবার প্রাক্কালে মা থেকে অনুমতি চেয়ে বিদায় নেয় এবং মায়ের পায়ের ধূলা নিতেও দেখা যায়।

বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও আমারে
তীর্থ করিতে আমি যাইবাম দেশান্তরে।
ভাত রাইন্দো মা জননী না ফেলাইও ফেনা
আমি পুত্র বিদেশে যাইতে না করিও মানা ॥ [৫০] (মহুয়া)

প্রতি উত্তরে মা বলেন,

মায় বলে, "পুত তুমি আমার আঁখির তারা / তিলেক দণ্ড না দেখিলে হইযে পাগলপারা ॥
তোমারে না দেখলে পুত্র গলে দিবাম কাতি / তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাতি ॥
ভিক্ষা মাইগ্যা খাইয়াম আমি তোমারে লইয়া / উবের ধন দূরে দিব তবু না দিব ছাড়িয়া ॥
আধপিঠ খাইলো মায়ের গুয়ে আর মুতে / আধপিঠ খাইলো দারুণ মাঘ মাস্যা শীতে ॥
বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায়। দেশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায় ॥
পরবুধ না মানে পরান কেমনে থাকবাম ঘরে / তুমি পুত্র ছাড়্যা গেলে আমি যাইয়াম মরে॥[৫১] (মহুয়া)

সামন্ত শক্তির প্রচ্ছায়ায় শ্রেণী বৈষম্য আদিকালের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উপর পর্যায়ক্রমে আরোপিত পুরুষশাসিত সমাজচিত্র লক্ষ্যগোচর হলেও বাংলা লোকগীতিকায় বাঙালি 'মা' তার ঐতিহ্যগত সামাজিক মর্যাদা হারায়নি। এখানে আমরা তৎকালীন সমাজে মাতৃভক্তি এবং পরিবারে মাতার প্রাধান্য দেখতে পাই।

৫). ভেলুয়ার জননী

বাংলা লোকগীতিকায় ভেলুয়ার জননীও একটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র। ভেলুয়া-জননীর কারণেই আমীর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পায়। আমীরেরর সঙ্গে নিজ কন্যা ভেলুয়ার বিয়ে দিয়ে তিনি বোনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ভেলুয়ার শ্বশুরালয়ে যাত্রাকালে তিনি আমীরকে যেসব অনুরোধ উপরোধ করেছেন, তাতে শাশ্বত বাঙালি মায়ের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে-

আমার ভেলুয়ারে তুমি যওনে রাখিবা
কনো অপরাধ হইলে তাহারে ক্ষেমিবা ॥ (আমীর সাধু)

এছাড়াও অনুরোধ করেছেন যেন ভেলুয়াকে দিয়ে গোবর ফেলানো না হয়, উঠান কুড়ানো না হয়, মরিচ বাটানো না হয় এবং জল তোলানো না হয়। সন্তানের সুখের চিন্তায় বিভোর জননী কন্যার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে বলেন,

পরানের পরান আমার দিলাম তোমার হতে
দুঃখ যেন না পায় কইন্যা ভাত আর পানিতে। (আমীর সাধু)

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের মঙ্গল কামনায় চণ্ডীমঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনীর মুখেও আমরা যেন এ কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'

৬). খুড়ী-জেঠী ও পড়শী নারী

বাংলা লোকগীতিকায় মাতৃচরিত্রের সঙ্গে সম্পূরক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে খুড়ী-জেঠী ও পড়শী নারীবৃন্দ। তাঁদের সামগ্রিক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপে কখনো কখনো একটি যৌথ সামাজিক মানসিকতা ফুটে উঠে। মলুয়া শ্বশুরালয়ে যাবার প্রাক্কালে আমরা দেখি-

মায়ে কান্দে বাপে কান্দে, কান্দে মাসী-পিসী
পরের ঘর যায় ঝি কান্দে পাড়াপড়সি। (মলুয়া)

বর কনের মঙ্গল অমঙ্গল চিন্তায় তাদেরকে আবার প্রাগৈতিহাসিক কালের যুথবদ্ধ জীবনে ফিরে যেতে দেখা যায়-

মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুরিয়া
সোহাগ মাগিল মায় বাড়ী বাড়ী গিয়া ॥
জয়াদি জুকার দেয় পাড়ার যত নারী।
রাখিল মঙ্গলঘট গঙ্গাজলে ভরি ॥ (মলুয়া)

বিয়ে বাড়ির এমন অনুষ্ঠান বর-কনে উভয়ের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যেই যেন বাঙালি নারীর আজন্ম সংস্কার ফুটে উঠে।

৪.৩.৩ বিমাতা চরিত্র

১. চান্দমণি-সূর্যমণির বিমাতা (কমল সওদাগর)

এবং

২. আলাল-দুলালের বিমাতা (দেওয়ানা-মদিনা)

আবহমানকাল ধরে বাঙালি সমাজে আমরা পারিবারিক সংঘাত সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ দেখতে পাই। সতীনের সন্তানকে কেন্দ্র করেও এই জাতীয় সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এর পরিণাম ফল ভোগ করতে হয় নিষ্পাপ সন্তানদের। এ জাতীয় ঘটনা ঘটে 'কমল সওদাগর' ও 'দেওয়ানা-মদিনা' পালায়। উভয় পালাতেই বিমাতার কুটিল আচরণে পুত্রদের জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। খুন-খারাবি, বিচ্ছেদ, বিদ্রোহ পর্যন্ত সংঘটিত হয় মাতৃহীন সন্তানদের কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে দুর্বল অসহায় শিশুরাই মূলত সৎ মায়ের শক্তি ও প্রতিপত্তির কাছে হার মানে। 'কমল সওদাগর' পালায় একদিকে যৌবনের অতৃপ্ততা, অন্যদিকে সতীন পুত্রদ্বয়ের কারণে সম্পদ হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় বিচলিত সোনাই গোবর্ধনের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশু দুটিকে (চান্দমণি-সূর্যমণিকে) গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিমাতা নারীর এই আগ্রাসী মনোভাবের প্রতীকরূপে সোনাইকে দেখা যায়। 'দেওয়ানা মদিনা' পালাতেও বিমাতার কুটিল আচরণে আলাল-দুলালের জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

নারীর সপত্নী বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলোর ধ্বংস ঘটিয়ে নারীকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। ফলে স্বার্থগত কারণে সাধের সংসার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে দেওয়ানা-মদিনা গীতিকায় সপত্নী পুত্রদ্বয় আলাল-দুলাল সেই একই কারণে বিমাতার চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান সোনাফরের প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার আগে তার স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বারণ করে যান। কারণ তার আশঙ্কা, সংসারে সৎমা এলে তার শিশু দুটি বিমাতার চক্রান্তের শিকারে পরিণত হবে। কিন্তু শিশু দুটির ভবিষ্যৎ ভাবনায় আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে সোনাফর বিয়ে করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে উপযুক্ত স্বীকৃতি না পেয়ে ক্রমে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে এবং তাদের ছেলে দুটিকে সংসার থেকে বিতাড়িত করার সংকল্প করে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে সোনাফর যে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার খেদোক্তিতেই তা স্পষ্ট হয়

মর‍্যাত না গেছ আওরাত গিয়াছ মারিয়া।
তিনলা পরান মার‍্যা গেছ পলাইয়া ॥ (দেওয়ানা মদিনা)

দুরভিসন্ধি সিদ্ধিকল্পে বিমাতা অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় এবং সোনাফরকে তার প্রতি বিশ্বাসী করে তুলে। নিজের চাতুর্যের কথা সে নিজেই ব্যক্ত করেছে এভাবে-

এমন করিবাম যাইতে সর্বলোকে বলে
জান দিয়া ভালবাসি সতীপুত সগলে
নিজের হাতে ছিঁড়ি মুণ্ডু যুদি অগোচরে
তেও যেন মোর কথা কেউ বিশ্বাস না করে ॥ (দেওয়ানা মদিনা)

বিমাতা চরিত্র হয়েও সে সতীন পুত্রদের প্রতি এমন অপত্যস্নেহ প্রকাশ করত যার ফলে আলাল-দুলাল যেমন খুশী থাকত, সোনাফরও মোহিত হত। দুই সতীনপুত্রকে বুকে ধরে সে চুমু খেত, নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে দিত, খাওয়াতো পর্যন্ত। শুধু আলাল-দুলাল ও সোনাফরই নয় প্রতিবেশীরাও তার আচরণে মুগ্ধ হত। গোপনে বিমাতা অর্থের দ্বারা জল্লাদকে বশীভূত করে ছেলে দুটিকে নদীর মাঝ গাঙে ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনা করে।

সাধারণত গীতিকার নারী চরিত্রগুলোর প্রেমের পরাকাষ্ঠায় আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু বিমাতা চরিত্রে আমরা সৎমা সম্পর্কিত যে প্রতিকূল ধারণা প্রচলিত আছে তারই প্রমাণ পাই। সতীন পুত্রদ্বয়ের প্রতি আক্রোশবশত সে যে অমানবিক আচরণ করেছে তা যেমন ঘৃণ্য, তেমনি হৃদয়হীন। তা নারীত্বের কলঙ্ক ও মানবতাবোধের পরিপন্থী।

৪.৩.৪. শাশুড়ী চরিত্র

১). মলুয়ার শাশুড়ী

শাশুড়ীর সঙ্গে বধূর সম্পর্ক যে কখনো মধুর হয় না- এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে দেখা যায় মলুয়ার বেলায়। মলুয়ার সঙ্গে তার শাশুড়ীর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর। তা আমরা মলুয়ার সংসার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাই। চাঁদ-বিনোদ একসময় চরম অর্থ-সংকটে পড়লে বিনোদ মলুয়াকে বাপের বাড়ি চলে যাবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বিনোদের এই প্রস্তাব নাকোচ করে দিয়ে মলুয়া তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলে- 'বাপের বাড়ির যত সুখ বিয়া হইতেই গেল।' মলুয়া স্বচ্ছল পরিবারের কন্যা হয়েও অপরিসীম দুঃখ-কষ্টে বুক বেঁধে স্বামী-শাশুড়ীর কাছেই থেকেছে, তাদের সেবা করেছে ও তাদের দুঃখ-কষ্টের শরীক হয়েছে। চরম অর্থ-কষ্টে মলুয়া একে একে তার নাকের নথ বিক্রয় করেছে, গলার মতির মালা, পায়ের খাড়ু, বাধা দিয়েছে হাতের বাজু, বিক্রয় করেছে পরিধানের পাটের শাড়ী, কানের

Dhaka University Institutional Repository

ফুল, অঙ্গের সোণাদানা সবকিছু। পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র নিয়ে মলুয়া অন্নাভাবে উপবাস করেছে। চরম দুর্দিনে মলুয়া শাশুড়ীর সঙ্গে সূতা কেটে, ধান ভেনে জীবন নির্বাহ করেছে-

সূতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লইয়্যা
এই মতে দিন কাটে দুঃখু সে পাইয়া। (মলুয়া)

এছাড়াও পুত্রের অনুপস্থিতিতে হতভাগিনী বিনোদ-জননীর সেবায় মলুয়া নিজেকে উৎসর্গ করে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু নিজের চরম কষ্টের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তার যত দুঃখ স্বামী আর শাশুড়ীর জন্য-

দেখিয়া সোয়ামীর মুখ বুক ফাট্যা যায়
আপনি উবাস থাক্যা পরে নাহি কয় ॥
সোয়ামী-শাশুড়ীর দুঃখ আর কত সয় ॥ (মলুয়া)

মলুয়ার পিত্রালয়ের প্রাচুর্য আর শ্বশুরালয়ে তার চরম দুরবস্থার তুলনা করে মলুয়ার পাঁচ ভাই এক সঙ্গে বিলাপ করেছে। এদিকে মলুয়ার মা কন্যার অপরিমেয় দুঃখের কথা চিন্তা করে মলুয়ার পাঁচ ভাইকে *পাঠিয়েছে মলুয়াকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে*। তখন মলুয়া তার শ্বশুরবাড়ীকেই সর্ব সুখের আঁধার মনে করে বলেছে-

শ্বশুর বাড়িত থাকবাম আমি করিয়াছি মন
সেইত আমার গয়া-কাশী সেইত বৃন্দাবন ॥
মা-বাপের সেবা কর তোমরা পঞ্চ ভাই।
শাশুড়ীর সেবা কইরা ধর্ম্ম আমি চাই ॥ (মলুয়া)

২). আয়নার শাশুড়ী

'আয়না বিবি' গীতিকাতেও দেখা যায়- শাশুড়ী-বধূর সম্পর্ক ছিল অতিশয় নিবিড় ও মধুর। আয়না তার স্বামী-সংসারকে এতটাই আপন করে নিয়েছিল যে, আয়নার শাশুড়ীও তাকে মমতা পাশে আবদ্ধ করেছিল। আয়নার প্রতি তার ব্যবহারে আমরাও মুগ্ধ না হয়ে পারি না। দীর্ঘ তিন বছর পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে আয়নার অন্ধ শাশুড়ী তার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ব্যক্ত করে বলেছেন-

ভিক্ষা মাগিয়া খাইবাম তোহারে না লইয়া রে ॥
পান-পাঞ্চাইত ছারবাম তোর না লাগিয়া রে ॥ (আয়না বিবি)

আয়নার অনুপস্থিতি শাশুড়ীর অন্ধ জীবনে মারাত্মক শূন্যতা সৃষ্টি করে। আয়নাকে পেলে সমাজকে অস্বীকার করতেও তিনি প্রস্তুত। এতে আয়নার প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতার প্রমাণ মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৫. আত্মীয়তার সম্পর্কের চরিত্র

১). ভেলুয়ার ননদ (বিভলা)

নারী চরিত্র হিসেবে আত্মীয়তার সম্পর্কের চরিত্রের মধ্যে আমরা যেন আমীর সাধুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ভেলুয়ার ননদিনী বিভলা প্রদত্ত যন্ত্রণার কথা ভুলতে পারি না। ভেলুয়ার ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ স্বরূপ আমরা বিভলাকে দায়ী করতে পারি। কবি বিভলার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে--

মাংস নাই সারা অঙ্গে অস্থি বেড়াই চাম ॥
পাণ্ডুবর্ণ দেহখানি রক্ত নাহি তায় ॥
পুরুষের মত কেশ হাত আর পায় ॥
কুড়ি বচ্ছর বয়েস হইল বইলতে লজ্জা পাই ॥
যইবন-জোয়ার তবু গাঙ্গে আসে নাই ॥
ডালিম্বের গাছে হায় রে ধরে নাই ফল।
ডাঙ্গর ডাঙ্গর চোখে করে ঝলমল ॥
নারীর ছুরত নাই বিভলার অঙ্গে ॥ (আমীর সাধু)

বিভলা দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত এবং তার মুখের কথাও চিরতার পানির মত। পক্ষান্তরে সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন ভেলুয়া দেখতে ছিল অপূর্ব সুন্দরী। এই সৌন্দর্যের প্রতিহিংসা বিভলার মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশ বছর বয়সে কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। অত্যন্ত নির্মম স্বভাবের বিভলা ভেলুয়ার প্রতি অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। অন্যায়ভাবে তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে, তাকে দাসীর কর্মে নিয়োজিত করে এবং তার সমস্ত অলঙ্কারাদি সে খুলে নেয়। আমিরের অনুপস্থিতিতে সে ভেলুয়ার চরিত্রে কলঙ্ক লোপন করা ছাড়াও বিভিন্নভাবে ভেলুয়াকে অপমান-নির্যাতন করেছে। ফলে অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, মনোবেদনায় ভেলুয়া শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ভেলুয়ার মতো এমন নিষ্ঠুর ননদী নারী চরিত্র বাংলা লোকগীতিকায় দেখা যায় না।

২). মমিনা ও আমিনা

'দেওয়ানা মদিনা' গীতিকায় দেওয়ান সোনাফরের দুই কন্যা- আমিনা ও মমিনা। ঘটনাক্রমে দেওয়ান তার এক কন্যার সঙ্গে আলালের বিয়ের প্রস্তাব করলে আলাল জানায়- তার ছোট ভাই দুলালকে সন্ধান করে এনে তারা দু'ভাই দেওয়ানের দুই মেয়েকে বিয়ে করবে। অতঃপর আলাল-দুলালের সন্ধানে বের হয় এবং এক গ্রামে আলালের সন্ধান পায়। তাকে দেশে ফিরে পিতার দেওয়ানির দায়িত্ব নিতে বললে দুলাল সংকটে পড়ে। কারণ সে ইতোমধ্যে সে গ্রামের এ গৃহস্থ কন্যা মদিনাকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। তখন আলাল তার ভাই দুলালকে আশ্বস্ত করে বলে- আমরা দু'জনে দেওয়ানের দুই কন্যা বিয়ে করব। এদের ছেড়ে চল। স্ত্রীকে তালাক দিলে অধর্ম্ম নেই। শুনে দুলাল তাই করল। মদিনার ভাই-এর নিকট তালাকনামা লিখে দিয়ে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আলালের সঙ্গে চলে গেল। তারা দু'জন দেওয়ানের দু'কন্যা আমিনা ও মমিনাকে বিয়ে করে সংসারী হল।

৩). মামী চরিত্র

গীতিকায় মামী চরিত্রগুলোকে যেন সখি চরিত্রগুলোর বিপরীত অবস্থানে লক্ষ্য করা যায়। এরা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে নায়িকাকে কোনভাবে সহযোগিতা না করে বরং সংসারের ঝামেলা মনে করে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের যন্ত্রণা দিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে অনিশ্চিত জীবনের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

ঠেলে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কমলা' পালার মামী চরিত্রটির কথা বলা যায়। এখানে কারকুন প্রভাব খাটিয়ে কমলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে বিপন্ন কমলা বাস্তুচ্যুত হয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় নেয়। কারকুন কমলার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে মামাকে একটি পত্র দেয়--

এই পত্র পাইয়া মামী কি কাম করিল।
পত্র পড়িয়া তবে ভাবিতে লাগিল ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মামী কোন কাজ করে।
পত্রখানা ফেইল্যা রাখে সেজের উপরে ॥ (কমলা)

মামা-মামীর আচরণে বিপর্যস্ত কমলার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়।

বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদি হই সতী।
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী ॥
জলে ডুবি বিষ খাই- গলে দেই কাতি।
মামার বাড়ি না থাকিব দণ্ড দিবারাতি। (কমলা)

মামা-মামীর এহেন আচরণে অতীষ্ঠ কমলা সন্ধ্যার অন্ধকারে অজানা পথে গৃহত্যাগ করে।

আবার 'দেওয়ান-ভাবনা' গাথায় মামা অর্থলোভে ভাগিনীকে লম্পট দেওয়ানের হাতে তুলে দিয়েছে--

কইও কইও কইও দূতী কইও মায়ের আগে।
আমারে যে লইয়া যায় দেওয়ান-ভাবনার চরে ॥
কইও কইও কইও দূতী কইও মামীর আগে।
আমার কাখের কলসী পইড়া (রৈলা) অইনা নদীর ঘাটে।
কইও কইও কইও দূতী দুষমন মামার ঠায়।
বাউন্ন পুরা জমি লইয়া সুখে বস্যা খায় ॥ (দেওয়ান-ভাবনা)

এমন স্বার্থান্বেষী আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র আমাদের সমাজে আবহমানকাল ধরে বর্তমান।

৪). বউদি বা ভাবী চরিত্র

কোন কোন গীতিকায় সখীর সম্পূরক হিসেবে ভাবী চরিত্রগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। এরাও রম্য-রসিকতার ছলে নায়িকার প্রেম প্রবাহে দোলা দিয়ে তাদের আন্দোলিত করে তোলে। 'মলুয়া' গাথায় তার পাঁচ ভাইয়ের বউদের ননদিনী মলুয়ার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা, হাসি-ঠাট্টা করতে দেখা যায়---

পঞ্চ ভাইয়ের বৌয়ে ডাক্যা কয় ননদিনী।
সন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি ॥
না ভাড়াইও ননদিনী না করিও ছল
আইজ সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল ॥
তরে লইয়া ননদিনী আমরা যাইবাম জলে।
মনের কথা কইবাম গিয়া ঐ না জলের ঘাটে ॥
পরথম যৌবন কন্যা পরম সুন্দরী।
তরে দেখ্যা ননদিনী আমরা জ্বল্যা মরি ॥ (মলুয়া)

এখানে ভাবীদের রসিকতায় ননদ তার স্বপক্ষ সমর্থক খুঁজে পাওয়ায় অন্তর শক্তিতে যেন বলীয়ান হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক চরিত্র

৪.৪.১. দূতী-কুটনী-ঘটকী চরিত্র

১). চিকন গোয়ালিনী

'কমলা' গীতিকায় চিকন গোয়ালিনী নামক নারী চরিত্রটির উল্লেখ দেখা যায়। সে কুটনী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই নারী চরিত্রটির সঙ্গে আমরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বড়াই চরিত্রটির মিল খুঁজে পাই। কবির বর্ণনায় আমরা চিকন গোয়ালিনীর রূপ দেখতে পাই এমন--

কোন দন্ত পড়িয়াছে কোন দন্তে পোকা।
সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাখা ॥
চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল।
শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল ॥ (কমলা)

দধি-দুগ্ধ বিক্রেতা হিসেবে সে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। কারণ-

একসের দৈয়েতে দিত তিনসের পানি ॥ (কমলা)

এছাড়াও সে বিবাহিত রমণীদের ঘর-ভাঙানির কাজ করত। তার প্রদত্ত তেল পড়ার গুণে স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে যেত। এহেন পরিস্থিতিতে কমলাদের কারকুন চিকন গোয়ালিনীর শরণাপন্ন হয় এবং মনিবকন্যা কমলার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলে। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে চিকন গোয়ালিনী কমলার কাছে গিয়ে প্রহৃত হয়। এতে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়। তাতেও সে দমবার পাত্রী নয়। সে বলে-

পন্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাতে
গোয়ালিনী কহে মোরে মারিল সান্নিকে ॥ (কমলা)

যৌবনকালে গোয়ালিনী ছিল বহুগামিনী। আবার কুলবধূদের পথভ্রষ্ট করতেও সে ছিল সিদ্ধহস্ত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দক্ষতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই সে বলে--

মরিচ যতই পাকে, তত হয় ঝাল
সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস।[৫২] (কমলা)

অন্য নারীকে পথ ভ্রষ্ট করার ব্যাপারে তার অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে গ্রামে কিংবদন্তী ছিল; সে পানপড়া জানে, তেলপড়া জানে, এছাড়া কালপনা মাছ ও পেচার মাংস প্রভৃতি সহযোগে এমন এক ধরণের ঔষধ তৈরি করে যা খেলে পরিণাম ফল হয় মারাত্মক--

বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে।
সতী নারী পতি ছাড়ে ঔষধের গুণে ॥ (কমলা)

বশীকরণ মন্ত্রের উপকরণ হিসেবে এগুলির ব্যবহার আছে। সতী নারীরে অন্ধ-কূপে নিমজ্জিত করতে গোয়ালিনী ছিল সিদ্ধহস্ত। চরিত্রটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক যথার্থই বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

"অননুকরণীয় বক্র সরস বাচনভঙ্গী এবং ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চাতুর্য এই হীনমনা ঘৃণ্য নারীকে সাহিত্যিক দরবারে উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখবে।"[৫৩]

২). নেতাই কুটনী

সামাজিক চরিত্র হিসেবে কুটনী একটি জীবন্ত চরিত্র। এ ধরণের চরিত্র গ্রামজীবনের চিরায়ত কাঠামোর সঙ্গে যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। কুটনী চরিত্রটি মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যের একটি বিশেষ টাইপ চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত।

রাজা বাদশাহ্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তে অন্যতম সহযোগী চরিত্র হিসেবে গীতিকায় দূতী-কুটনী-ঘটকী চরিত্রগুলোর অবতারণা করা হয়েছে। এরা অর্থ-প্রতিপত্তি-ক্ষমতা-লিপ্সায় নারী নির্যাতনের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। মলুয়া পালায় আমরা 'নেতাই' নামে এ ধরণের এক কুটনী নারীর সাক্ষাৎ পাই। একদিন ঘাটে জল আনতে গিয়ে মলুয়া কাজির কু-নজরে পড়ে। মালুয়ার সৌন্দর্য্যে কাজি মুগ্ধ হয়। পাপ কামনা সিদ্ধির নিমিত্তে কাজি নেতাই কুটনীর সাহায্য নেয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী এক কু-প্রস্তাব নিয়ে নেতাই কুটনীকে মলুয়ার নিকট প্রেরণ করে। কুটনী মলুয়াকে ঘাটে একলা পেয়ে বলে-

তোমার রূপ দেইখ্যা কাজি হইয়াছে ফানা।
অঙ্গ ভরিয়া তোমায় দিব কাঞ্চা সোনা ॥
নিখা যদি কর তারে ভালা মত চাইয়া।
তার ঘরের যত নারী রইব বান্দী হইয়া ॥[৫৪] (মলুয়া)

নেতাই কুটনীর মাধ্যমে কাজি এ ধরণের অন্যায়, অশালীন, কুরুচিপূর্ণ ও আপত্তিকর প্রস্তাব প্রেরণ করলে মলুয়া কর্তৃক দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। মলুয়া পুকুর ঘাটে নির্জন পরিবেশে একাকী তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও বাড়ীতে ফিরে কুটনীকে শায়েস্তা করে এবং সমুচিত জবাব দেয়-

রোষিয়া কহিল মলুয়া 'শুনলো কুটুনি' ॥
স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাঁটা তর পাক্না শিরে ॥
বয়স গিয়াছে তর, মরবি আজি কালি।
লোকের দুষমন তুই দুই চক্ষের বালি ॥
কুল বেচ্যা খাইছ তুমি বয়সের কালে।
সেই মত দেখ তুমি নাগরিকা সকলে ॥ (মলুয়া)

মলুয়া কুটনীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বলে-

আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান।
না হয় দুষমন কাজি নউখের সমান ॥
অপমান্যা বুড়ি তুমি যাও নিজের বাড়ী।
কাজিরে কহিও কথা সব সবিস্তারি ॥ (মলুয়া)

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.২. গণিকা চরিত্র

১). গণিকা হীরানটী

হীরানটী চরিত্রটি একদিকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করেছে, আবার অন্যদিকে কবির ধর্মীয় মনোভাবের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সেকালের বারবনিতার ট্রিপিক্যালরূপ আমরা এই চরিত্রটির মধ্যে দেখতে পাই। সে নগরের ধনবতী নটী, রূপযৌবনে নাগরিকদের কামনার বস্তু। গুরু হাড়িপা তরুণ রাজা গোপীচন্দ্রকে নিয়ে এই নটীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। কাম-বাসনার সংযমের যে সাধনা গোপীচন্দ্রকে করতে হবে তার উপযুক্ত স্থান এই নটীর বিলাস গৃহ। সেখানে কামনার উদ্দাম আয়োজন। তার মধ্যে থেকেই তরুণ রাজাকে কামনাজয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করতে হবে, এই হ'ল গুরুর পরিকল্পনা। গুরু হাড়িপা রাজাকে এক কানাকড়ির বিনিময়ে নটীর কাছে বন্ধক রেখে চলে গেলেন। দাসরূপে বন্দী রাজার প্রতি নটী কিন্তু আকৃষ্ট হ'ল। নটীর কামবৃত্তি অর্থ-বিনিময় প্রত্যাশা করে। রাজাকে নটী তার মনোভাব জ্ঞাপন করল, রাজা কিন্তু নটীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। প্রত্যাখ্যাত নটী ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য তৎপর হল। তার এই মানস প্রতিক্রিয়া মনস্তত্ত্ব সম্মত। যেখানে নগরের তাবৎ ধনী তার কৃপা লাভের জন্য উন্মুখ, সেক্ষেত্রে দাসরূপে বন্দী গোপীচন্দ্র তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে- এতে তার সৌন্দর্যাভিমান এবং অহংকার বিশেষভাবে আহত হল। গোপীচন্দ্রের প্রতি এরপর সে যে বিরূপতা দেখাতে শুরু করল, তা এই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ রূপেই গণ্য। গোপীচন্দ্র দাসত্বের হীনকার্যে নিযুক্ত হল। হীরানটী তাকে এমন কার্যে নিযুক্ত করল, যেগুলি যে কোন পুরুষের মনে কাম বাসনা উদ্রিক্ত করতে সমর্থ। নটী গোপীচন্দ্রকে দিয়ে তার স্নানের জল আনাত, তার বুকের উপর বসে স্নান করত। এইভাবে সে শুধু যৌবন অপমানের প্রতিশোধই নিতে চাইতো না, গোপীচন্দ্রকে কাম-চেতনায় জাগ্রত করারও চেষ্টা করত।

নটীর এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং আচরণরীতি তৎকালীন বারবনিতাদের জীবন-যাত্রার একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরে। কবিদের ধর্ম-বিরূপতার ফ্রেমে চরিত্রটি অঙ্কিত হলেও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি বজায় আছে এবং সেদিক থেকে হীরানটী পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নারী চরিত্ররূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

২). গণিকা রঙিলা

'রতনঠাকুর' গীতিকায় আমরা রঙিলা নাম্নী এক বারবিলাসিনীকে দেখতে পাই। এখানে রাজকুমার রতনঠাকুর এক মালিনীর গাথা মালা দেখে তার প্রেমে পড়ে আসক্ত হয় এবং তাকে নিয়ে সজিন্তার দেশে পালিয়ে যায়। রতনঠাকুরের পিতা এ সংবাদ অবগত হলে নিজ পুত্রকে উদ্ধারের জন্য সজিন্তার দেশে রঙিলা নাম্নী এক গণিকা প্রেরণ করেন। রতনঠাকুরকে বশীভূত করতে আগত এই গণিকা রঙিলা ঢোল পিটিয়ে তার উপস্থিতির কথা প্রচার করে। এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হলে তিনিই প্রথম গ্রাহক হয়ে উপস্থিত হন রঙিলার গৃহে। যে মালার সাহায্যে রাজা গণিকাকে বরণ করে নেন, সেই মালা গ্রন্থণকারীকে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে গণিকা রঙিলা। পরদিন রঙিলা-গৃহে মালী-রূপী রতনঠাকুরের পদার্পণ ঘটে। রতনঠাকুর রঙিলার রূপে ও কথায় মুগ্ধ হয়ে মালী-কন্যাকে বিস্মৃত হয়। এরপর একদিনের মধ্যেই রতনঠাকুরসহ রঙিলা নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সজিন্তার দেশ থেকে।

রতনঠাকুরের পিতা, পুত্রের মন থেকে মালী কন্যার প্রতি প্রণয় বিস্মৃতির জন্য গণিকা নিযুক্ত করে আশ্রিত রাজ্যে প্রেরণ করে। রতনঠাকুরের আশ্রিত রাজ্যের রাজার কুপ্রবৃত্তি ভয়ংকর ও নীতিহীন।

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ্য-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের জন্য বহু গণিকার সমাবেশ হয়। রাজাকর্তৃক মালী কন্যাকে অন্তঃপুরবাসিনী করার নির্দেশ দানই তার প্রমাণ। মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রভুদের নীতিহীন, বিবেকবর্জিত দুশ্চরিত্র জীবন-যাপনের এক কুৎসিত নিদর্শন এটি।

রঙিলা নাম্নী এ ধরণের বারবিলাসিনীরা তৎকালীন রাজা-বাদশাহ্‌দের দ্বারা ব্যবহৃত হতো, তাদের দেহ-মনের খোরাক যোগাত। এই বারবিলাসিনী রঙিলার মোহে পড়েই রতনঠাকুর মালী-কন্যার জীবন থেকে দূরে সরে যায়। ফলে, মালী-কন্যা তার প্রেমিক রাজকুমার রতনঠাকুরকে হারায় এবং বিরহে, শোকে-দুঃখে আত্মবিসর্জন দেয়।

৪.৪.৩. বিবিধ নারী চরিত্র

১). ধোপানী

গীতিকার সর্বত্রই নিম্নশ্রেণীর নারী চরিত্রগুলো যেমন- জেলেনী-ধোপানী-এরা বরাবরই অসহায় নায়ক-নায়িকাকে আশ্রয় দান করেছে এবং এরা কখনোই জুলুমবাজ-লম্পট কিংবা অমানবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি।

'ধোপারপাট' গাথায় জমিদারপুত্র ও কাঞ্চনমালাকে আশ্রয়দানকারী নারী চরিত্র ধোপা-বধূ বা ধোপানীর মধ্যে সরল, নিরীহ ও শান্ত গৃহস্থ জীবনাকাঙ্খার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঞ্চনমালাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে ধোপা গৃহে রেখে জমিদার পুত্র রুক্মিনীকে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। ধোপা গৃহে অবস্থানকালে কাঞ্চনমালা আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা লাভের চিন্তা না করে বরং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাঞ্চনমালাকে গৃহে অবস্থানের অনুমতি দেয় ধোপানী। এতে তার নির্লোভ সততার পরিচয় ফুটে উঠে।

২). জেলেনী

রূপবতী গাথায় আমরা 'পুনাই' নামে এক জেলে গৃহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করি। রূপবতী ও মদনের বনবাস জীবনের ধর্মমাতা সে। মদনের অনুপস্থিতিতে বিরহ-কাতর রূপবতীর দুঃখ-মোচনকল্পে সে-ই উদ্যোগী হয়ে রাজদরবারে যায়। অতঃপর তারই সক্রিয়তা ও সাহসিকতায় মদন কারা মুক্ত ও মৃত্যুদণ্ড মুক্ত হয়ে রূপবতীর সঙ্গে পুনর্বার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন গ্রহণে সক্ষম হয়। সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আবহে লালিত এ চরিত্রটি ব্যক্তিত্বময়তা, বাৎসাল্য, সাহসিকতা ও সক্রিয়তায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শ্রমজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেই হয়ত তার পক্ষে এমন আচরণ সম্ভব হয়েছে। এরূপ নিবেদিতপ্রাণা নারী চরিত্র বাংলা লোকগীতিকার আসন অলঙ্কৃত করেছে।

৩). কুরুঞ্জিয়া নারী

'আয়নাবিবি' পালায় 'কুরুঞ্জিয়া' নামে এক ধরণের নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ ঘটে। বাণিজ্যের কারণে উজ্জ্বাল মামুদের নিখোঁজ সংবাদ আয়নাকে ঘরছাড়া করলে সে পাগলিনীর মত তাকে খুঁজে বেড়াতে থাকে এবং একসময় তার সন্ধান পেয়ে বাড়ী ফিরে আসে। কিন্তু রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অসতীর মিথ্যা অভিযোগে নির্বাসনের দণ্ড ভোগ করতে হয় আয়নাবিবিকে। অপবাদ দিয়ে তাকে গভীর জঙ্গলে রেখে আসা হল। প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হলে এক সময় আয়না কোন দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করে নিজেই স্বামীকে খুঁজতে বের হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পথিমধ্যে এক কুরুঞ্জিয়া নারীর দেখা পায় আয়না। 'কুরুঞ্জিয়া'-মগ জাতির একটি শাখা। এদের ধর্ম ইসলাম। ফেরী করে এরা পণ্য বিক্রয় করে। এই কুরুঞ্জিয়া নারীর সহায়তায় আয়না স্বামীর গৃহ খুঁজে বের করে। এমন পরোপকারী নারী চরিত্রেরও সন্নিবেশ ঘটে বাংলা লোকগীতিকায়।

৪). মইফুলা দাসী

মধ্যযুগে বাংলাদেশে মানুষ বেচা-কেনার প্রচলন ছিল। এরূপ দাস-দাসীর দ্বারা গৃহকর্মের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হত। বাংলা লোকগীতিকায় বর্ণিত নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে মইফুলা এরূপ একটি দাসী নারী চরিত্র। 'কমল সওদাগর' পালায় আমরা মইফুলাকে এক পরম মমতাময়ী দাসীরূপে দেখতে পাই, যার স্নেহ-আদর-ভালবাসা সওদাগরের দুই পুত্র চান্দমণি ও সূর্যমণিকে আগলে রেখেছে বরাবর। গৃহকর্ত্রী সুরঙ্গিণী মৃত্যুর আগে মইফুলার হাতে তার দুই পুত্রের ভার ন্যস্ত করেছিলেন। শত প্রতিকূলতার মাঝেও মইফুলা সেই অনুরোধ রক্ষা করেছে। বিমাতা কর্তৃক নির্যাতিত চান্দমণি ও সূর্যমণির জন্য সে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। সোনাই-এর দুরভিসন্ধি হঠাৎ জানতে পেরে মইফুলা মাণিক লম্পটের পায়ে মাথা কুটে শিশু দুটির প্রাণ ভিক্ষা করে বলে-

বগুকাডি লগুরে তুমি আমার কলিজা
আইজ বাপ হইয়া রইক্ষা কর দুইডা কুমার।[৫৫]

মইফুলা চান্দমণি ও সূর্যমণিকে খাইয়ে পরিয়ে আদর সোহাগে গর্ভধারিণীর মতোই অকৃত্রিম অপত্যস্নেহের পরিচয় দিয়েছে। মইফুলা দাসীর মতো এমন নির্লোভ, মমতাময়ী, সাধ্বী নারী চরিত্র সত্যিই বিরল।

৫). দরিয়াবাঁদী দাসী

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবি' গীতিকায় আমরা দরিয়াবাঁদী নামে একটি নারী চরিত্রের উল্লেখ দেখতে পাই। সে দেওয়ান পরিবারের একজন সামান্য পরিচারিকা। কিন্তু মনে মনে সে সুদর্শন যুবক ফিরোজ খাঁকে ভালবাসত। তাকে তসবিরওয়ালীর ছদ্মবেশে যখন সখিনা বিবির কাছে পাঠানো হয় তখন দরিয়া তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কিন্তু তাকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মোকাবেলা করতে হয়েছে। তার প্রেম কোনদিন সোচ্চার হতে পারেনি, অন্তরে গুমরে মরেছে। কবি তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এখানে-

পন্থে যাইতে বান্দীর দুই অক্সি ঝরে
কেউ বা জানিল তার কি আছে অন্তরে ॥
মন পরানে করে দরিয়া ফিরোজের কাম
কইরব সন্ধান
কিবান্ ছিল অন্তরে বান্দীর কে। (সখিনা বিবি)

তসবিরওয়ালীর ভূমিকাটি সার্থকভাবে পালন করে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

৬). মালিনী চরিত্র

'রতনঠাকুর' গীতিকায় আমরা মালী-কন্যা 'মালিনী' চরিত্রটির সঙ্গে পরিচিত হই। মালিনীর গাঁথা মালা দেখে রাজকুমার রতনঠাকুর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার প্রণয় প্রার্থনা করে। গুণমুগ্ধ রতনঠাকুরেরই একান্ত প্রচেষ্টায় মালিনী তার প্রণয়নিবেদনে সাড়া দিতে বাধ্য হয়। মালিনীর মনে প্রণয়-

Dhaka University Institutional Repository

বাসনা জাগ্রত হলেও, নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার ফলে তার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, রাজপুত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থায়ী হওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছার ফলেই মালিনী তার প্রণয়নিবেদনে সাড়া দেয়। এরপর পুষ্পবনে উভয়ের সাক্ষাৎ কিংবা কলা-বাগানে উভয়ের অভিসারের ঘটনাগুলোতে তাদের প্রেমঘন হৃদয়াবেগ প্রকাশ পায়-

থর থরিয়া কাঁপে অঙ্গরে বন্ধু মুখে দিল সে ঘাম।
পাড়ার দুষ্মন্ লোকে বন্ধু রটাইব বদনাম রে ॥
পরান পাগেলা বন্ধুরে- [৫৬] (রতন ঠাকুর)

শেষ পর্যন্ত দু'জনই গৃহত্যাগী হয়ে সজিন্তার দেশে উপস্থিত হয়। পলাতক-জীবনে উভয়ের দাম্পত্য জীবন আনন্দেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু গণিকার মোহে পড়ে রতনঠাকুর মালিনীর জীবনকে ওলট-পালট করে দেয়। রতনঠাকুরের অবর্তমানে রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার আত্মধিক্কারে মালিনী আত্মবিসর্জন দেয়।

মালিনী চরিত্রে ভালবাসা থাকলেও তার তীব্রতা, দৃঢ়তা বা প্রখরতা ছিল অত্যন্ত কম। কারণ, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলার জন্য আত্মবিসর্জনের ঘটনা ছাড়া তাকে কোন ধরণের ভূমিকা বা পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি, যা গীতিকার অন্যান্য নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবুও মালিনী সম্পর্কে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, রতনঠাকুর রঙিলার রূপে মোহিত হয়ে তার সঙ্গে পলায়ন না করলে হয়তো মালিনীর আত্মবিসর্জনের ঘটনা ঘটত না।

৭). সখী চরিত্র

গীতিকায় নায়িকা চরিত্রের পাশাপাশি সখী চরিত্রগুলোও যেন অপরিসীম প্রীতি, সরলতা, সহমর্মিতা- সহযোগিতা ও সহানুভূতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বলা যায়, সখীরাই নায়িকার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মহুয়া পালায় পালঙ্কসখী চরিত্রিটি বন্ধুত্বের মহিমায় গৌরবোজ্জ্বল। সে সর্বদাই মহুয়ার সঙ্গে থেকেছে, মহুয়াকে সঙ্গ দিয়ে তার একাকীত্ব দূর করেছে। সুখ-দুঃখের কথা বলে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এতে মহুয়ার মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আঁচ করে সন্ধ্যাবেলা একাকী জলের ঘাটে যাওয়াটা নিষ্কন্টক নয় মনে করে সে মাহুয়াকে বলে-

শুন শুন বইন মহুয়া আমার মাথা খাও।
একলা কেন সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে যাও ॥ (মহুয়া)

মহুয়া ও পালঙ্কসই এর সম্পর্ক এতটাই নিবিড় ও গভীর ছিল যে, নদের চাঁদের প্রেমে পড়ার পর মহুয়ার উদভ্রান্ত চেহারা, উদাস দৃষ্টিভঙ্গিও যেন তার সই-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাইতো পলঙ্কসই মাহুয়াকে বলে-

হাইম মেলিয়া চাইয়া থাক ঠাকুর বাড়ির পানে
নদ্যা ঠাকুর পাগল অইছে শুনছি তোমার গানে ॥ (মহুয়া)

পালঙ্ক সইয়ের এমন আলাপনে মহুয়ার পাথর চাপা বুকের দুঃখ যেন অনেকটা প্রশমিত হয়। তখন মহুয়াও পালঙ্কসইকে তার হৃদয়ের একান্ত নিভৃত গোপন তথ্যটি জানিয়ে দেয়। বন্ধুত্বের জন্য আত্মনিবেদনেই তার চরিত্রের মাধুর্য নিঃশেষিত নয়, বুদ্ধির দীপ্তি ও তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য হুমরাবেদে যখন দলবলসহ মহুয়া ও নদের চাঁদকে অনুসন্ধান করে, তখন পালঙ্ক সখীই বাঁশির সুরধ্বনির সাহায্যে তাদেরকে সতর্ক হওয়ার সংকেত দেয়।

সে মহুয়াকে নিজের অন্তরের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছিল। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে মহুয়ার সাথে থেকেছে। মহুয়ার মৃত্যুতে সে যারপরনাই কষ্ট পেয়েছে এবং মহুয়াকে কবর দেয়ার পর সকলে স্থান ত্যাগ করলেও পালঙ্কসই সে স্থান ছেড়ে যায়নি। বরং কবর আঁকড়ে পড়ে থেকেছে। এমন নিবেদিতপ্রাণা নারী চরিত্র সত্যিই দুর্লভ।

রইল তথা পালংসই সুখ-দুঃখের সাথী।
কান্দিয়া পোহায় কন্যা যায়রে দিনরাতি ॥
অঞ্চল ভরিয়া কন্যা বনের ফুল আনে।
মনের গান গায় কন্যা বইসা বনে বনে ॥ [৫৭] (মহুয়া)

পরিশেষে পালঙ্কসই মহুয়ার আত্মোৎসর্গের সাক্ষী হিসেবে ট্রাজেডির মর্মজ্বালা তিলে তিলে অনুভব করে মহুয়ার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে-

উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি পালংসই একবার কথা কও ॥
ফিইরা গেছে বাদ্যার দল আর না আইব তারা।
সুখেতে বাঁধিয়া ঘর কর তুমি বাসা ॥ (মহুয়া)

পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও মহুয়া চরিত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ দানে এই পালঙ্ক সখী চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই পালঙ্কসখী চরিত্র সম্পর্কে অশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন-

> "সে মহুয়ার সুখ-দুঃখভাগিনী এবং জীবন ও মৃত্যুর সহচরী। মহতের ত্যাগ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু ক্ষুদ্রের ত্যাগ সকলের দৃষ্টিপথের অন্তরালেই থাকিয়া যায়। তথাপি মহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়েরই প্রেরণা তাহাদের আত্মা হইতে আসে- আত্মায় আত্মায় ছোট বড় কোনও পার্থক্য নাই; সেই জন্য পালঙ্সই বাহিরে ক্ষুদ্র হইয়াও অন্তরে মহৎ। জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগিনী সখীর জন্য সে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার অন্তরের অসীম মহত্বের পরিচয় দিয়াছে।"[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

০১. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন : মৈমনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২
০২. ঐ, পৃ. ১৪-১৫
০৩. ঐ.
০৪. ঐ, পৃ. ১৬
০৫. ঐ পৃ. ৩৬
০৬. মোঃ শহীদুর রহমান : ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩, ৫৯, ৬০
০৭. বিমল ভূষণ চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন, কলিকাতা, পৃ. ১৩৬
০৮. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃ. ৭৯
০৯. ড. ওয়াকিল আহমদ : বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৩৩৪, ৩৩৫
১০. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন : পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮
১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৪২৭-৪২৮
১২. ক্ষেত্রগুপ্ত : প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ, কলিকাতা, পৃ. ১৬৯
১৩. মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯
১৪. ঐ, পৃ. ৩৫
১৫. দীনেশ চন্দ্র বসু : প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৩১৪
১৬. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ. ৩৩৬
১৭. সৈয়দ আজিজুল হক : ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য, ঢাকা- ১৯৯০, পৃ. ১৮৭
১৮. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃ. ১১৩
১৯. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃ. ১১৪
২০. বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড (৩য় সংস্করণ), ১৯৬২, পৃ. ৪১২
২১. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক : প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৫
২২. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬
২৩. ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য, পৃ. ১৯৫
২৪. প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ, পৃ. ১৭৫
২৫. মৈমনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৪২
২৬. ঐ, পৃ. ১৪৫
২৭. ঐ, পৃ. ১৪৬
২৮. বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড (৩য় সংস্করণ), ১৯৬২, পৃ. ৪২৬
২৯. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ. ৩৩৭
৩০. প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ, পৃ. ১৬৫
৩১. মৈমনসিংহ গীতিকা, পৃ. ১৮৫
৩২. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, পৃ. ৪৫
৩৩. ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য, পৃ. ২২৮, ২২৯, ২৩০
৩৪. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, পৃ. ৩৩৫
৩৫. বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড (৩য় সংস্করণ), ১৯৬২, পৃ. ৩৫১, ৩৫২
৩৬. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২৯২
৩৭. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ), কলিকাতা, পৃ. ৪৭৫
৩৮. ঐ, পৃ. ৪৭৩
৩৯. ঐ, পৃ. ৪৭৩

Dhaka University Institutional Repository

৪০. ঐ, পৃ. ৪৭৪
৪১. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, ৪র্থ খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৩৩
৪২. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১২৫
৪৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, ৪র্থ খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৪৮৯-৪৯০
৪৪. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন : বৃহৎ বঙ্গ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪২, পৃ. ৯৬৯
৪৫. ঐ, পৃ. ৯৬৯
৪৬. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় : বঙ্গ সংস্কৃতি : বৈচিত্র্য ও ঐক্য, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৬
৪৭. শিব চন্দ্র লাহিড়ী : বাংলা কাব্যে উপমালোক, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৪১৯
৪৮. পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃ. ১০

ইদ্দত- অর্থ প্রতীক্ষা, স্বামীর মৃত্যু বা তালাক হওয়ার পর নূতন পতি গ্রহণের মধ্যবর্তী কালকে 'ইদ্দত' বলে। বিধবা অথবা বর্জিতা নারীর পালনীয় সময় এটা। অন্ধযুগে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বর্জ্জিত নারীর প্রতীক্ষাকাল সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলনা। এতে স্ত্রীদের প্রতি অবিচার করা হত। তাই আল্লাহতাআলা নিয়মিত তালাক প্রদানের পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইদ্দতের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৫১. মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ) পৃ. ৮
৫২. ঐ, পৃ. ১৮
৫৩. ঐ, পৃ. ১৮
৫৪. মৈমনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২৭
৫৫. প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ, কলিকাতা, পৃ. ১৭৫
৫৬. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ. ১৫৭
৫৭. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৫ম খণ্ড, ১৯৭১, পৃ. ২১
৫৮. প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, (২য় সংস্করণ) ১৯৭১, পৃ. ৩২৮
৫৯. মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৪১
৬০. বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড (৩য় সংস্করণ), কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা মৌখিক সাহিত্যই লোকসাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত। বাংলা লোকসাহিত্যের নানা শাখা, সেগুলোর মধ্যে লোকগীতিকা (Ballad) অন্যতম শাখা। লোকগীতিকা এমন একটা শিল্প মাধ্যম, যা কিছুটা অগ্রসর লোকসমাজের চিত্র তুলে ধরে। ইউরোপের মতো বাংলাদেশেও গীতিকা অন্ত্যমধ্যযুগের ফসল। গীতিকাগুলোতে আমরা যে সমাজচিত্র দেখতে পাই তা এই অন্ত্যমধ্যযুগের জাতীয় চেতনাকে ধারণ করে আছে।

সামন্তযুগের অপরিবর্তনীয় রাজনীতি, সমাজনীতি বাংলার লোকসমাজ ও লোকজীবনে যে ছাপ ফেলে গেছে তারই প্রেক্ষাপটে মূল্যায়িত হয়েছে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচার, সংস্কৃতিচর্চা এবং সমাজকেন্দ্রিক মূল্যবোধ। গীতিকাগুলোর কাহিনী ও চরিত্রে তারই রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়।

'বাংলা লোকগীতিকায় নারী' বিষয়ক গবেষণায় গীতিকাগুলোকে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ ও সমাজের সম্পদ বলে মনে হয়েছে। এতদঞ্চলের প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানুষের জীবনপদ্ধতি নারী চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সহায়তা দান করেছে। নারীর সৌন্দর্য, তার সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ সব সাহিত্যের উপজীব্য হলেও তার মধ্যেই সমাজসমস্যার কালিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিহিত থাকে। আমরা বাংলা লোকগীতিকায় নারী চরিত্রের আলোচনায় নারীর রূপ-সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাজ-মানুষ তথা সামগ্রিক প্রতিবেশের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছি।

বাংলা লোকগীতিকায় নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নারী চরিত্রগুলোর সামাজিক অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে। নায়িকা, প্রতিনায়িকা, পারিবারিক ও সামাজিক সদস্য হিসেবে নারী চরিত্রগুলোর আগমন ঘটেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রায় শতাধিক নারী চরিত্র শনাক্ত করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ভূমিকা পালন করে পরিবার ও সমাজ জীবন পরিচালনা করেছে, সমাজকে গতিময়তা দান করেছে। সমাজে ভাল চরিত্রের পাশাপাশি মন্দ বা অসামাজিক ভ্রষ্টা নারী চরিত্রও এসেছে। তবে তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। তথাপি তারা সমাজেই একত্রে অবস্থান করে সমাজদেহকে সচল রেখেছে।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাংলা লোকগীতিকায় নিহিত সমাজ ও সাহিত্যের সেই সম্পর্কের গুরুত্ব আমরা নারী চরিত্রের আলোকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। কারণ নারীই মধ্যমণির মতো উক্ত গীতিকাসমূহের সর্বস্তরে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। গীতিকাগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য থাকলেও স্বাধীন প্রেমের মহিমা কীর্তনই অধিকাংশ গীতিকার মূল লক্ষ্য। এই প্রেমকে ধারণ করে আছে নারী। প্রেমের জন্য দুঃখ, যন্ত্রণা, আত্মত্যাগ, সর্বস্বসমর্পণ করে নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করতে পারে, গীতিকাগুলোতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। নারী চরিত্রসমূহের এই সদর্প উপস্থিতি কোথাও অন্যায় অবিচারকারী হিসাবে নয়, বরং ত্যাগে, তিতিক্ষায় ও আত্মদানের গৌরবময়তায় সিক্ত এসব নারী চরিত্র বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

বাংলা লোকগীতিকায় মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্যগোচর হলেও ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তিই গীতিকাগুলোকে অধিক মহিমান্বিত করেছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য যেখানে একান্ত ভাবে ধর্মভিত্তিক, সেখানে সে যুগেই রচিত গীতিকাগুলোতে সম্পূর্ণ মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশিত হওয়ায় সেগুলো স্বতন্ত্র মাত্রা ও মর্যাদা লাভ করেছে। কিছু কিছু গীতিকায় হিন্দু-মুসলমানের বিবাহের কথা থাকলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে অনুলিপ্ত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন মঙ্গলকাব্যে নর-নারীর আকর্ষণের লক্ষ্য ছিল সম্ভোগ। এক্ষেত্রে গীতিকার প্রেমে দেহগত সম্ভোগের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে হৃদয়ের আশা-আনন্দ-বেদনাকে। গীতিকায় সর্বত্রই মুক্ত প্রেমের জয়-জয়কার। অনেক ক্ষেত্রে যেন স্বাধীনভাবে জীবনের সাথী মনোনয়নের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। প্রেমের এই মুক্তি নারী হৃদয়ের একাধিপত্যকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমাজ-সংসার সবকিছুকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার শক্তি সঞ্চয়ে গীতিকার প্রেম যেন সার্থক হয়েছে। তাইতো দেখা গেছে এখানকার নারীরা পতিপ্রেমে আকুল হয়ে কোথাও জাতিধর্ম বিসর্জন দিয়েছে, কোথাও গৃহধর্ম ত্যাগ করেছে, কোথাও মা-বাবার মতামতের তোয়াক্কা না করে পতি মনোনয়ন করেছে, কোথাও ধর্ম-মন্দির থেকে সংস্কারের বেড়াজাল ছেদ করে সমান্তরালে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার কোথাও উচ্চ রাজকার্য পরিত্যাগ করে মৃতা প্রণয়িনীর সমাধিপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রেম যাকে জন্ম দিয়েছে, প্রেম যাকে রক্ষা করেছে, তা কোন ঋষিবচনের প্রতীক্ষা করে না। তা কোন সমাজের নিজস্ব নয়, তা সমস্ত মানব জাতির আরাধনার ধন। সমাজ তাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তা রক্ষা করে।

এমনিভাবে বাংলা লোকগীতিকার কবিরা বিচিত্র নারী চরিত্রের হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নারীরাই বাংলা লোকগীতিকার মুখ্য রূপকার- নিয়ন্ত্রণী শক্তি। এর মূলে নিহিত আছে তাদের চরম ও পরম আত্মত্যাগ। আর এ আত্মত্যাগ প্রেমের জন্য- প্রিয়তমের জন্য। তাইতো প্রিয়জনের বিরহে কেউ ঝরা ফুলের মতো শুকিয়ে যায়, কেউ আপন জীবনের মূল্যে প্রিয়তমের প্রাণরক্ষা করে, আবার কেউ প্রিয়তমের প্রাণরক্ষায় অপারগ হয়ে পূর্বাহ্নেই আত্মবিসর্জন দেয়। মোটকথা, মাতৃ-প্রধান লোকসমাজের নারী স্বাধীনতা ও প্রণয়-ব্যাকুলতার সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সতীত্ববাদের স্থূল, অমসৃণ লোকায়ত আদর্শ যুক্ত হয়ে যে ভাব-বিমিশ্রতার সৃষ্টি করেছিল তারই সার্থক লোকশিল্পরূপ বাংলা লোকগীতিকা।

এই পল্লীগাথার নারীরা অনেকবার কুলধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু কখনোই নারী ধর্ম ত্যাগ করেনি। নারী ধর্মের যে জীবন্ত মূর্ত্তিগুলো এসব গীতিকায় পরিলক্ষিত হয়- তারা প্রাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে, ধৈর্য্যে, উপায়-উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুলনীয়। লীলার লীলাবসান, সোনাইয়ের নির্ব্বাক ও নির্ভীক মৃত্যু, কেনারামের ভক্তি, কাজলরেখার চরিত্রে চির সহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় প্রেমনিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি, চন্দ্রার তপোনিরত শান্তি- এই চিত্রগুলো সামনে রেখে গৌরব করার সামগ্রী। এর প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন স্মরণীয় ও পূজনীয়।

প্রকৃতিজগতের সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে যেমন তার একটি ভয়াবহ শক্তির পরিচয় ও প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, এই নারী চরিত্রগুলোর সেই সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে তাদের এক দুর্জয় শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের এই শক্তি তাদের স্বাধীন প্রেমিকা সত্তাকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করেছে। একটি সুগভীর বেদনার্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস গীতিকার কাহিনীগুলোর উপর ব্যাপ্ত হয়ে আছে। 'কেন প্রেম নাহি পায় আপনার পথ'- এই চিরন্তন জিজ্ঞাসাই গীতিকাগুলোর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মহুয়া তার অভিশপ্ত জীবনের রক্তাক্ত পরিণতির মধ্যে, মলুয়া তার স্বজন বিতাড়িত জীবনের দুর্ভাগ্যের অন্তিম মুহূর্তে, চন্দ্রাবতী তার প্রবঞ্চিত জীবনের নৈরাশ্যে, আর মদিনা ও লীলা তাদের অশ্রুপাত সজল অনন্ত প্রতীক্ষার মধ্যে এই জিজ্ঞাসাই তুলে ধরেছে।

লোকগীতিকার নারীরা মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব কাব্যের নারীদের মতো স্বর্গ কিংবা বৈকুণ্ঠ কামনা করে না- মর্ত্যজীবনের লাভ-ক্ষতির মধ্যেই তাদের জীবন-স্বপ্ন সীমায়িত। গীতিকার নায়িকারা লৌকিক প্রেমেরই জয়গান করেছে। প্রেমের জন্য তারা পাগল হয়েছে। সম্মুখ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ কিংবা নীরব সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে লৌকিক প্রেমের অপূর্ব সাধনা করেছে। প্রেমাস্পদের জন্য আত্মোৎসর্গ

Dhaka University Institutional Repository

করাতেই যেন তাদের আনন্দ। বিচ্ছেদের বিষ আকণ্ঠ পান করে তারা মৃত্যুকে নির্দ্বিধায় বরণ করেছে। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যেই তারা তাদের প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করেছে।

দৈবের কারণে হোক, আর সমাজের কারণেই হোক, সমাজে নারীকেই সব দায় বহন করতে হয়েছে। সব রকম দুঃখ-ভোগ করতে হয়েছে, মুখ বুঁজে সকল কষ্ট-অপমানের জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে নারীর 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' অবস্থায় বঙ্গীয় সমাজ নারীকে রক্ষা করতে পারেনি, বঙ্গনারীই সমাজকে রক্ষা করেছে। 'নারী প্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই, চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে।' বাংলা লোকগীতিকার নারী চরিত্র সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমাদের আলোচনায় এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূল-গ্রন্থ

ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক : প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭১
: প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭১
: প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৫ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭১
: প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৭ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৫

দীনেশচন্দ্র সেন : মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৮
: মৈমনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯৩
: পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৮
: পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩০
: পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩২

বদিউজ্জামান : সিলেট গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
: মোমেনশাহী গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১

মফিজুল ইসলাম : রংপুরের পালাগান (১ম খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

সহায়ক-গ্রন্থ

অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় : বঙ্গ সংস্কৃতি বৈচিত্র্য ও ঐক্য, কলিকাতা, ১৯৭৫

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬২
: বাংলা লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৭

আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭

ওয়াকিল আহমদ : বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮
: লোককলা প্রবন্ধাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১
: বাংলার লোকসংস্কৃতি: উৎস ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১

ক্ষেত্রগুপ্ত : প্রাচীনকাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ, কলিকাতা, ২০০০

চিত্তমণ্ডল : লৌকিক বাংলা, ফোকলোর পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৬

নির্মল কুমার বসু : হিন্দু সমাজের গড়ন, বিশ্বভারতী, কলিকাতা

নন্দগোপাল সেন গুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৮

নীহার রঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, ১ম সংস্করণ ১৩৫৯

Dhaka University Institutional Repository

বরুণ কুমার চক্রবর্তী : গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, কলিকাতা, ১৯৯৩

বিমল ভূষণ চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন, কলিকাতা

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২

মোঃ শহীদুর রহমান : ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ, ঢাকা, ১৯৯৮

রমাপ্রসাদ চন্দ : ইতিহাসের বাঙালি, কলিকাতা, ১৯৮১

রেবতী বর্মন : সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ

শিবচন্দ্র লাহিড়ী : বাংলা কাব্যে উপমালোক, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫

সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, ১৩৮০

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫

সৈয়দ আজিজুল হক : ময়মনসিংহের গীতিকা, জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য, ঢাকা, ১৯৯০

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

মৈত্রী : কবি শেখর কালিদাস রায় : জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৯১

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলাবিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৮৫

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Ashutose Vhattachargeo : The Basis of Bengali Folk Culture, Folklore, Kolikata, 1960

Maria Leach ED : A.M. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (SDFML), New York, 1949

Robert Graves : English Scottish Ballads, London, 1957

___ : Bengal District Gazetteers, Mymensingh, Bengal Secretariat Book Depo, 1917